শিক্ষা

তৃতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড ঃ শিক্ষা-পদ্ধতি
দ্বিতীয় খণ্ড ঃ বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা
তৃতীয় খণ্ড ঃ স্বাস্থ্যশিক্ষা

শ্রীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্তের

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম্.এ., বি.টি.
ও
শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু এম্. এ.
কর্তৃক পরিদৃষ্ট

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট্, কলিকাতা-৭৩

ভূমিকা

এই গ্রন্থে সাধারণ পদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয়গুলি কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড্. শিক্ষণের তৃতীয় পত্র এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এড্. শিক্ষণের দ্বিতীয় পত্রের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ছাড়া নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণের দুইটি পত্র বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার আলোচনা ইহাতে আছে। বিষয়গুলিকে যথাসম্ভব বিশদভাবে আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পুস্তকটি যদি শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পুস্তক রচনাকার্যে পূর্বসূরীদের পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহাদের ঋণ কৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিতেছি।

বিষয়-সূচী

প্রথম খণ্ড : শিক্ষা-পদ্ধতি

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় খণ্ড : স্বাস্থ্য শিক্ষা

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষায় পদ্ধতি-তত্ত্বের গুরুত্ব

(Importance of Methodology in Education)

সমগ্র শিক্ষণ প্রক্রিয়া ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে এই প্রক্রিয়ার প্রধান দিক তিনটি—শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার পদ্ধতি। কি উদ্দেশ্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে বা শিক্ষার দ্বারা তাহার কি পরিবর্তন আশা করি ইহা নির্ণয় করিবে শিক্ষার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। শিক্ষার লক্ষ্য স্থির হইলে ঠিক করিতে হইবে কোন কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হইবে, কি কৌশল আয়ত্ত করিতে হইবে। কোন কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করিলে তাহার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। এখানে আসে বিষয়। তাহার পর পথের কথা। কি উপায়ে ঐ বিষয় জানা যাইবে। ঐ উপায় বা পথ হইল শিক্ষাদান পদ্ধতি। শিক্ষাকার্য সুষ্ঠু করিতে হইলে এই তিনটির যথার্থ সমন্বয় দরকার। এই তিনটি স্তরের কোন একটি অবহেলিত হইলে বা গুরুত্ব দেওয়া না হইলে শিক্ষা ভাল হয় না। কাজেই শিক্ষণ কার্য পূর্ণাঙ্গ ও সক্রিয় করিবার জন্য প্রতিটি স্তরের সুষ্ঠু নির্বাচন ও সম্পাদন প্রয়োজন।

প্রাচীন শিক্ষা ও পদ্ধতি

শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই শিক্ষণ-কার্যে প্রাচীনকালে পদ্ধতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইত না। যখন বিদ্যালয় ছিল না তখন শিক্ষা ছিল জীবন-কেন্দ্রিক। গৃহ-পরিবেশে বালক-বালিকারা প্রাত্যহিক জীবনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তব কাজের মধ্য দিয়া অভিজ্ঞতা ও কৌশল আয়ত্ত করিত। পৃথক্ ভাবে শিক্ষাপদ্ধতির প্রয়োজনও ছিল না। প্রাচীন ভারতে আশ্রমিক শিক্ষায়ও সারাদিনের দিনচর্যার ভিতর দিয়া ছাত্র জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত হইত। কিন্তু বেদ-বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হইত না। পরবর্তীকালে শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হইল। বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি গৌণ বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে যদিও বিষয়কে সামান্য গুরুত্ব দেওয়া হইল, কিন্তু পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না।

পদ্ধতির স্বরূপ তাহার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্লেষণমুখী না হইলেও গতানুগতিক-ভাবে কিছু না কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করা হইত। প্রাচীন ভারতে কলা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেগুলি তাহার ব্যবহারিক জীবনে লাগিবে, সেগুলির নাম দেওয়া হইল অপরা-বিদ্যা আর যেগুলি তাহার মনকে মুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করে, তাহার নাম দেওয়া হইল পরা-বিদ্যা। সুতরাং লক্ষ্য ও বিষয়ের উপর যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হইত। পদ্ধতির দিকে অনুশীলন, গুরুমুখে শ্রবণ, গুরু-শিষ্যে আলোচনা এবং তর্ক এইগুলির কথা বলা যাইতে পারে।

শিখনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও বিষয়বস্তুর যেমন গুরুত্ব, তেমনই গুরুত্ব পদ্ধতির। পদ্ধতির সঙ্গে সরাসরি শিক্ষার্থীর সম্পর্ক। পূর্বে শিক্ষার্থীর রুচি বুদ্ধি প্রবণতা আগ্রহ ইত্যাদি বিচার করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত না। পদ্ধতির উপর গুরুত্ব না দেবার কারণ সে যুগে মনোবিজ্ঞান গড়িয়া উঠে নাই। এই বিষয়ে কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয় নাই। সে যুগের শিক্ষাবিদ্‌রা শিশুর মানসিক শক্তি সম্পর্কে কয়েকটি ধারণা পোষণ করিতেন। সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করিতেন এবং পদ্ধতি স্থির করিতেন।

সে যুগে মনে করা হইত শিক্ষা-ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক—যাহাতে শিক্ষার্থীর মানসিক শৃঙ্খলা বাড়ে, বুদ্ধি শাণিত হয়, স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে, মানসিক বৃত্তি বা শক্তিগুলির চর্চায় এই ফললাভ করা যাইবে। তাঁহাদের ধারণা ছিল কতকগুলি মানসিক শক্তির সমবায়ে মানব-মন গঠিত। এই মানসিক শক্তিগুলির যতবেশী চর্চা বা অনুশীলন করা হইবে এই শক্তিগুলি ততই শাণিত হইবে। তাঁহারা মনে করিতেন কয়েক বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক শৃঙ্খলা আসিবে ও বুদ্ধি শাণিত হইবে। সেই জন্য পাশ্চাত্য দেশে গণিত, ল্যাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এই তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল বলিয়া প্রাচীনকালে অনুশীলন পদ্ধতির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত।

মানসিক শিক্ষার মতই দৈহিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভুল পদ্ধতি অনুসৃত হইত। শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে দৈহিক পীড়নের উপর জোর দেওয়া হইত। ছাত্রদের সামান্য অমনোযোগ ও বিচ্যুতিকে গুরুতর ত্রুটি বলিয়া মনে করা হইত এবং শারীরিক নির্যাতন ইত্যাদি করা হইত। সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি দান একেবারে পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

যেমন বর্ধমান হইতে কলিকাতা যাইতে হইলে বর্ধমানগামী ট্রেনে উঠিতে হইবে, তেমনি লক্ষ্য ও বিষয় স্থির থাকিলেও আসানসোলগামী ট্রেনে উঠিলে যেমন কলকাতা যাওয়া যাইবে না, সেইরূপ ভুল পদ্ধতি অনুসরণ করিলে লক্ষ্যে পৌঁছান যাইবে না। অবশ্য একথা অনেকেই স্বীকার করেন, সে যুগের শিক্ষায় বিষয়ের গুরুত্ব ছিল—অনেক জ্ঞান বা তথ্য আহরণ করিত, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে সে পূর্ণ হইত না। কারণ বিষয় ও উপলব্ধির মধ্যে ফাঁক থাকিয়া যাইত না। "বিদ্যেবোঝাই বাবু মশাই"র মত অনেক বিদ্যা অর্জন করিতেন, কিন্তু সে বিদ্যা জীবনে কোন কাজে আসিত না, দেবযানীর অভিশাপের মত "শেখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ"—প্রযুক্ত হইত না।

এই শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যায় না। বিশেষ করিয়া বর্তমান জটিল সামাজিক অবস্থায় ঐ শিক্ষা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে এই অনীহার মূল কারণ বোধ হয় শিক্ষার অর্থ সম্পর্কে

পরিষ্কার ধারণার অভাব। সে যুগে কতকগুলি জ্ঞান বা তথ্য আহরণকেই শিক্ষা বলা হইত। সেই সব তথ্য শিক্ষার্থীর বোধগম্য হইল কিনা তাহা জানিবার প্রয়োজন হইত না। শিক্ষার্থীরা অনেক তথ্য বা তত্ত্ব জানিত, কিন্তু তাহা উপলব্ধি করিতে পারিত না। কারণ পদ্ধতি ছিল সেই সব তথ্য বা তত্ত্ব শিক্ষার্থীর স্মৃতির মধ্যে আনা। যে ভাবে ঐ স্মৃতিকরণ সহজ হইত তাহাই পদ্ধতিরূপে অনুসৃত হইত। এইজন্য বার বার পড়িয়া মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হইত। এইভাবে যান্ত্রিক উপায়ে তথ্য আহরণের চেষ্টার ফলে শিক্ষার স্বাভাবিক ত্রুটিগুলিও দেখা যাইত। আগ্রহ ও শক্তি নির্ভর নয় বলিয়া এবং অতিরিক্ত যান্ত্রিকতার ফলে বিষয়গুলি স্মরণে আনিতে অনেক সময় লাগিত এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠের প্রতি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার ভাব জাগিত। কিন্তু যদি ঐসব অভিজ্ঞতা বা কৌশল শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তি ও আগ্রহের ভিত্তিতে দিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে নিঃসন্দেহে অধিক ফল পাওয়া যাইত। সেইজন্য শিক্ষাবিদরা মনে করেন শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও বিষয়ের সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা সহজ হয়।

শিক্ষা-ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতির গুরুত্ব

(১) পূর্বে শিক্ষার অর্থ ছিল জ্ঞান বা কৌশল। অর্থাৎ কোন বিষয় বা অভিজ্ঞতা অর্জন। সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ছিল গতিহীন (static)। কিন্তু সাম্প্রতিক শিক্ষার ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শিক্ষা বলিতে কেবল অভিজ্ঞতা বা কৌশল অর্জনই নয়— আত্মবিকাশকে বুঝায়। অর্থাৎ শিক্ষা হইল চলমান বিরামহীন একটি ক্রিয়া। সে অর্থে শিক্ষা গতিশীল (Dynamic)। সুতরাং দেখা গেল শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অপেক্ষা পদ্ধতি বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

(২) শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক প্রক্রিয়া পাইয়া থাকে। সেগুলির সঞ্চালনের মাধ্যমে শিক্ষা আসে। শিক্ষক সেই সব প্রক্রিয়া-গুলির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া থাকেন। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের মাধ্যমে মানসিক ও অঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে শারীরিক শিক্ষা পায়। পরিবেশের সঙ্গে এই সব প্রক্রিয়াগুলির সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে জীবন সার্থক ও গতিশীল হইয়া উঠে।

যেমন আগে মুখস্থের উপর বেশী জোর দেওয়া হইত, শিক্ষার্থী বিষয়টি উপলব্ধি না করিয়া বার বার পড়িয়া মুখস্থ করিত। ফলে শক্তি ও সময় বেশী যাইত এবং বেশী দিন মনে থাকিত না। কিন্তু সবিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করিলে বেশী দিন মনে থাকে। এই পদ্ধতিও মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার ফল।

কাজেই দেখা যাইতেছে শিক্ষাকে সার্থক করিতে হইলে শিশুর সামর্থ্য, চাহিদা ইত্যাদির ভিত্তিতে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(৩) শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতির দিকেও লক্ষ্য দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিক্ষার উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি হইয়াছে কিনা এবং সেই

ইচ্ছা অনিয়ন্ত্রিত হইলে চলিবে না। শিক্ষা সুষ্ঠু করিতে হইলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মানসিক প্রগতি, বুদ্ধির উৎকর্ষতা ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ও আগ্রহ অনুযায়ী তাহার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কৌশলে সঠিকপথে পরিচালিত করিবেন।

(৪) শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রেষণার (Motivation) দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে যাহাতে শিশু সাগ্রহে শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হয়। তাহাদের বিভিন্ন চাহিদা (needs) আছে। যেমন— দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ইত্যাদি। শিশুদের এই অনুরাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষক যদি পরিকল্পনা মত পাঠে অগ্রসর হন, শিশুরা কাজে বা পাঠে উদ্দীপনা প্রেষণা (Motivation) পাইবে এবং শিক্ষা-ক্রিয়া সহজপথে অগ্রসর হইবে।

(৫) মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে শিশুদের আগ্রহ ও আচরণ (interest and attitude ভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষণ ব্যাপারে অধিকতর কার্যকর। শিশুরা যাহাতে সহজভাবে কেবল শিখে না, যে পদ্ধতিতে সে আনন্দ পায় এবং তাহার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় সেই পদ্ধতি শিক্ষার অনুকূল বলিয়া ধরিতে হইবে। শিক্ষণীয় বিষয় অপেক্ষা আগ্রহ-ভিত্তিক পদ্ধতি শিক্ষার উদ্দেশ্যকে অধিকতর সার্থক করিয়া তুলে।

(৬) প্রাচীন কাল হইতে শিক্ষাবিদ্‌রা মানসিক প্রক্রিয়ার অনুশীলনকেই উত্তম পদ্ধতি বলিয়া মনে করিতেন। সেইজন্য বিদ্যালয়ে তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞান অর্জনের দিকেই বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। আধুনিক কালের শিক্ষাবিদ্‌রা এই নীতি সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে নিষ্ক্রিয়ভাবে শিক্ষা সহজসাধ্য নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার এই সক্রিয়তাকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান কালের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। আর একটি কথা—এত দিন শ্রেণী-শিক্ষাই পদ্ধতিগত দিক দিয়া আদর্শ বলিয়া মনে করা হইত। সাম্প্রতিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যক্তি-বৈষম্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শ্রেণী-শিক্ষার অসম্পূর্ণতা ধরা পড়িয়াছে। ফলে বিভিন্ন উন্নত ধরণের ব্যক্তিগত শিক্ষা-পদ্ধতির আবিষ্কার হইয়াছে। ফলতঃ, শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করেন শিক্ষা গতিশীল এবং সেইজন্য ইহার পদ্ধতির পরিবর্তনও সমান ভাবে চলিয়াছে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা অবিরাম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রয়োজন-ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসন্ধান করিয়া চলিয়াছেন এবং স্থান-কাল-পাত্রভেদে পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া চলিয়াছেন।

(৭) এই শতকে শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল শিক্ষা-পদ্ধতিতে মনোবিজ্ঞানের স্বীকৃতি। শিশুর রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা, মানসিক শক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতা আগ্রহ, অবসাদ ইত্যাদিকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়া উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হওয়া শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য। কাজেই সুপদ্ধতি নির্ধারণ ও প্রয়োগ আধুনিক শিক্ষা-চিন্তার বৈশিষ্ট্য।

(৮) প্রাক্-আধুনিক যুগে মনে করা হইত শিশু পূর্ণ বয়স্ক মানুষেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বয়স্ক মানুষের সব মানসিক শক্তিই তাহার আছে তবে সুপ্ত অবস্থায়। কাজেই

তখনকার পদ্ধতি ছিল বয়স্ক শিক্ষা-পদ্ধতির অনুরূপ। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌রা এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে শিশু শিশুই। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মতোই তাহার মানসিক শক্তি, সক্রিয়তা সব শিশু-অবস্থায় থাকে। কাজেই তাহার শিক্ষাপদ্ধতি শিশুদের অনুরূপ হইবে, বয়স্কদের অনুরূপ নয়।

কাজেই দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতির গুরুত্বকে আধুনিক কালে স্বীকার করা হইয়াছে।

শিক্ষার সাধারণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য
(General Principles of a Good Method)

(১) **লক্ষ্যাভিমুখী হইবে**—শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে উপযোগী হইবে শিক্ষা-পদ্ধতি। পদ্ধতি স্থির করিবার পূর্বে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। পদ্ধতি এমন হইবে যাহাতে লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। নতুবা উত্তম পদ্ধতি হইলেও পাঠদান সার্থক হইবে না। যেমন, কোথাও যাইতে হইলে গন্তব্য স্থানটি নির্দিষ্ট হওয়া দরকার। তাহা না হইলে যাত্রার যতই না কেন সুবন্দোবস্ত থাকুক যাওয়া হইবে না।

(২) **সুপরিকল্পিত হইবে**—পরিকল্পনা ভিন্ন কার্য সফল হয় না। বিষয়, শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মানসিক শক্তি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া লক্ষ্য স্থির রাখিয়া পাঠ-পরিকল্পনা করিতে হইবে।

(৩) **আগ্রহকেন্দ্রিক হইবে**—উত্তম পদ্ধতি শিশুদের পাঠে উদ্বোধকের কাজ করিবে। প্রেষণার নীতি অনুসরণ করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারিত হইবে। যে পদ্ধতি দ্বারা ছাত্রদের ঔৎসুক্য জাগ্রত হয় ও পাঠে আগ্রহ আনয়ন করে, সেই পদ্ধতি অনুসরণ করা বিধেয়। যেমন, বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়ের আকার প্রকৃতি রং ও পোশাক দেখিয়া ছাত্রদের মনে ঔৎসুক্য সঞ্চার করিতে পারিলে ঐ দেশ সম্পর্কে তাহাদের আগ্রহ হইবে। শিক্ষক সেই সব দেশ সম্পর্কে ভূগোলের পাঠ সার্থক ও ফলপ্রসূ ভাবে দিতে পারিবেন।

(৪) **সহজবোধ্য হইবে**—মনে রাখিতে হইবে শিক্ষাই মুখ্য, পদ্ধতি উপায় বা পথ মাত্র। লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। পদ্ধতি বা শিক্ষার কৌশল যেন সরল হয়, তাহা হইলে শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুসরণ করা সহজ হইবে। পদ্ধতি বা প্রণালী জটিল হইলে শিক্ষা তো দূরের কথা ছাত্ররা পদ্ধতির জটিলতায় দিশাহারা হইয়া পড়িবে। সারল্য ও সহজবোধ্য হওয়া উত্তম পদ্ধতির আর একটি লক্ষণ।

(৫) **বিষয়মুখী হইবে**—উত্তম পদ্ধতির আর একটি লক্ষণ হইল তাহার বিষয়মুখীতা ও নৈর্ব্যক্তিকতা। পদ্ধতি-বিষয়কে বোধগম্য করিবার সহজ পথ বা কৌশল মাত্র। কাজেই পদ্ধতি এমন হইবে যাহাতে বিষয়টি স্বরূপে আয়ত্তে আসে। অনেক সময় পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective) হওয়ার ফলে পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রভাব পড়ে। ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। পদ্ধতি এমন হইবে যাহাতে ইহার উপর ব্যক্তির

কোন প্রভাব না পড়ে ও উদ্দেশ্য অভিমুখী হয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে সহজবোধ্য করিবার উপযুক্ত হয়।

(৬) **কর্মকেন্দ্রিক হইবে**—শিশু স্বভাবতঃই কর্মচঞ্চল, কাজ করিতে ভালবাসে। সে খেলা করিতে, নির্মাণ করিতে, বিবিধ কাজ করিতে ভালবাসে। শিশুর এই আগ্রহ ও চাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারণ করা উচিত। মনোবিজ্ঞানীরা আরও বলিয়াছেন কেবল আগ্রহই শেষ কথা নয়, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাই অধিকতর কার্যকর। শিশু কানে শোনে, চোখে দেখে, হাতে কাজ করিয়া ধারণা করে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ভিতর দিয়া সে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হইবে, সেগুলির স্বরূপ বুঝিবে। দলবদ্ধ হইয়া কাজ করিবার ফলে তাহার সামাজিক অভিজ্ঞতা হইবে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়া তাহার অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইবে, সে নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করিবে। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানও লাভ করিবে।

সাম্প্রতিক কালের উন্নত পদ্ধতিগুলিতে কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি অনুসৃত হইয়াছে। শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক ও সামাজিক এককথায় সামাজিক পরিবেশে তাহার ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যপুর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকর।

(৭) **জীবন-কেন্দ্রিক হইবে**—রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়াছেন, আমাদের দেশে শিক্ষার হেরফের হইতে মুক্তি ঘটিল না—শিক্ষার সঙ্গে জীবনের কোন মেলবন্ধন ঘটিল না। শিক্ষা ও জীবন দুইটি আলাদাই রহিল। তিনি একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এক ভিক্ষুক শীতকালে ভিক্ষা করিয়া যখন শীতের পোশাক জোগাড় করে তখন গ্রীষ্ম আসিয়া যায়, আবার কষ্টেসৃষ্টে গ্রীষ্মের পোশাক জোগাড় করে যখন, তখন গ্রীষ্ম চলিয়া গিয়াছে। এই যে হের-ফের আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও সুপ্রকট। আধুনিক শিক্ষা-নীতির একটি বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য বিধান। জীবনের জন্য জীবনব্যাপী জীবনের শিক্ষা। জীবনের সঙ্গে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া চলিবে। বিদ্যালয়ে এমন পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে শিশুরা শিক্ষা বা কাজকে তাহাদের জীবনের জন্য প্রয়োজন, তাহা অনুভব করিতে পারে প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে প্রকৃতি বিজ্ঞান শিখিবে, বিভিন্ন সমস্যা পড়িয়া তাহাও সমাধানের জন্য চাহিদা অনুভব করিবে। তখন সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া সামাজিক পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিক ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ও কাজ করিতে গিয়া নানা নৈপুণ্য অর্জন করিবে। বিদ্যালয়ে এমন ভাবে সমস্যা নির্বাচন ও উত্থাপন করিতে হইবে যাহাতে ছাত্ররা মনে করে ইহা তাহাদের নিজেদের সমস্যা, ইহার সমাধান করার উপর তাহার অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। সুতরাং এক কথায় বলা চলে জীবন-কেন্দ্রিকতা উত্তম শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম লক্ষণ।

(৮) **পরিবর্তনশীল হইবে**—পদ্ধতি শিক্ষা সহায়ক, পদ্ধতি লক্ষ্য নয়। কাজেই পদ্ধতি কখনও অপরিবর্তনীয় বা অনমনীয় হইবে না। মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারে ফলে জানা গিয়াছে রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা অনুযায়ী প্রত্যেকটি শিশু পৃথক্‌। এব

বিষয় ও পরিবেশ অনুযায়ী এমন পরিস্থিতি হইতে পারে যাহাতে পদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পদ্ধতির পরিবর্তনের নীতি উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির একটি বৈশিষ্ট্য।

(৯) **শিক্ষার্থীর যোগ্যতা বা মান অনুযায়ী হইবে**—পদ্ধতি একটি ছাঁচ নয় যে, সেই ছাঁচে সব শিক্ষার্থীকে গড়িয়া লওয়া যাইবে। শিক্ষার্থীর বয়স ও মানসিক স্তর অনুযায়ী পদ্ধতিও ভিন্নতর হইবে। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর যখন শৈশবাবস্থা সেই সময়কার পদ্ধতি একরকম হইবে। সেই সময় খেলা, গান, ছড়া ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এবং আর একটু বড় হইলে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন হইবে।

(১০) **ব্যয়বহুল হইবে না**—শিক্ষা সকলের জন্য, ব্যষ্টির জন্য নয়। কাজেই শিক্ষা-পদ্ধতি এমন ব্যয়বহুল হইবে না যাহাতে সকলে ইহার সুযোগ না লয়। সর্বসাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা হয় যে পদ্ধতিতে, তাহাকেই উত্তম পদ্ধতি বলা চলে।

(১১) **আনন্দময় হইবে**—শিক্ষা-পদ্ধতি এমন হইবে না যাহাতে শিশুরা ইহার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠে। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের মতে মানুষ সুখের স্মৃতিকে সঞ্চয় করিতে ভালবাসে এবং দুঃখময় স্মৃতিকে তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাইতে চায়। এই নীতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা শিশুর আনন্দদায়ক ও তৃপ্তিকর হইলে সে যেমন তাড়াতাড়ি শিখিবে তেমনি মনে রাখিতে চেষ্টা করিবে।

উত্তম শিক্ষাপদ্ধতির সাধারণ নীতি—আধুনিক যুগে শিক্ষাবিদরা নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া উত্তম পদ্ধতির কয়েকটি নীতির উল্লেখ করিয়াছেন। সেইগুলি হইল—

(১) **মূর্ত হইতে অমূর্ত** (Concrete to Abstract)। শিশুর মনে প্রথম দিকে কোন ধারণা দানা বাঁধে না। সে অমূর্ত জিনিস বুঝিতে পারে না। তাহাকে বাস্তব জিনিসের দৃষ্টান্ত দিয়া শিক্ষা শুরু করিতে হইবে। তাহার কাছে ২+২=৪ ইহার কোন অর্থ নাই। কিন্তু যখন ২টি মার্বেল ও ২টি মার্বেল একত্র করিয়া ৪টি মার্বেল দেখে তখন সে বুঝিতে পারে। তাহাকে এইভাবে বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করিয়া তাহার পর বিমূর্ত সংখ্যা দিলেও বুঝিতে পারিবে।

(২) **জানা হইতে অজানায়** (Known to Unknown)। সাধারণতঃ মানুষের এক অভিজ্ঞতা হইতে অন্য অভিজ্ঞতা আসে, যা জানে তাহার ভিত্তিতে অজ্ঞাত বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে জানিতে চেষ্টা করে। শিশুর পক্ষে একই নীতি প্রযোজ্য। জানা জিনিস ও অজানা জিনিসের পার্থক্য বুঝিতে চেষ্টা করে এবং এই মানসিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া অজানা জিনিসের উপলব্ধি আয়ত্ত করে। যেমন, শিশু বাল্যকাল হইতে গৃহে, মাঠে গরু দেখিয়া গরুকে চিনে। হাতি তাহার অজানা বস্তু। প্রথমে হাতি দেখিয়া জানা বস্তু গরুর সহিত মিলাইতে চেষ্টা করে। দুইটি বস্তুর পার্থক্য দেখে এবং মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাতি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করে। সেইরূপ শিক্ষণীয় বিষয়েও শিক্ষার্থীর জানা বিষয় বা বস্তুর অনুসন্ধান করিয়া

শিক্ষক কৌশলে সেই জ্ঞান বিষয় বা বস্তুর ভিত্তিতে অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তুর ধারণা দিতে চেষ্টা করিবেন।

(৩) **সহজ হইতে জটিল**। শিক্ষার্থী প্রথমেই জটিল বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারে না। সেইজন্য সেই বিষয় বা প্রক্রিয়ার প্রথমে সহজটি শিক্ষা দিতে হইবে। সহজ তাহার আয়ত্তে আসিলে ক্রমে জটিলতর বিষয়ের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। শিশুর মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়ের সহজতর অংশটি আগে শিখাইতে হইবে। জটিল বিষয় হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে পূর্ববর্তী সহজ তথ্য বা প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর জানা আছে কিনা। যদি জানা থাকে তবে তাহার ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে জটিলতর বিষয়টি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নতুবা শিক্ষার্থী যান্ত্রিকভাবে শিখিবে—এ শিক্ষা তাহার কোন কাজে আসিবে না এবং তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাইবে।

(৪) **অনির্দিষ্ট হইতে নির্দিষ্ট** (Definite to Indefinite)। শিশু প্রথমেই অনির্দিষ্ট কোন বিষয়ের ধারণা করিতে পারে না। সেইজন্য নির্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুর ধারণা দিতে হইবে। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে যাইতে হইবে। এখানে অনির্দিষ্ট কথাটির অর্থ যাহা শিক্ষক স্পষ্টভাবে বুঝাইতে পারিবেন না, যাহার কোন রূপ নাই। যেমন, 'গতি' কথাটি একটি অস্পষ্ট ক্রিয়া। দৃষ্টান্তের মাধ্যমে গতি বুঝাইতে হইবে।

(৫) **সমগ্র হইতে অংশ** (Whole to Parts)। শিশুরা প্রথমে কোন বিষয়ের অংশ বুঝিতে পারে না বা অংশ সম্পর্কে ধারণা করিতে পারে না। সেইজন্য প্রথমে বিষয়টি সামগ্রিক ভাবেই তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে। বিষয়টির সামগ্রিক ধারণা হইলে তাহার অংশের বিশেষ ধারণা দেওয়া চলিবে। শিশুরা প্রথমে হাতির কানের ধারণা, দাঁতের ধারণা পায় না। সে সামগ্রিক ভাবে হাতির ধারণা লাভ করে। তাহার পর প্রতিটি প্রত্যঙ্গের খুঁটিনাটি সম্পর্কে বিশেষ ধারণা পায়। সেইজন্য পদ্ধতিগত ভাবে সমগ্র হইতে অংশে যাওয়াই কার্যকর নীতি।

(৬) **বিশেষ হইতে সাধারণ** (Particular to General)। শিশুরা একটি বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করে। সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে একটি সাধারণ নীতি তাহার পক্ষে বিভ্রান্তিকর। তর্ক-শাস্ত্রে যেমন দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সামান্যীকরণ (gneralisation) করা হয় সেইরূপে প্রথমে বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষ অভিজ্ঞতা দিতে হইবে। এইভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিমূর্ত সত্য গঠন করিলে তখন তাহার বুঝিতে কষ্ট হইবে না। যেমন, সন্ধির সূত্র 'অ বা আকারের পর অ বা আ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হইবে।' এই সূত্র ছাত্রদের কাছে অর্থহীন ও অবোধ্য। কিন্তু দৃষ্টান্ত দ্বারা সূত্র গঠন করিলে ছাত্রদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

মনে রাখিতে হইবে শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণে এইগুলি সহায়ক-মাত্র। এ উত্তম পদ্ধতি ঠিক করিবার সময় ক্ষেত্র অনুযায়ী এইগুলির এক বা একাধিক নীতি গ্রহণ করিলে সুফল পাইবেন। শিশুদের বয়স, মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ অনুযায়ী তিনি নীতি নির্বাচন করিয়া পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

পদ্ধতি ও পাঠ্য বিষয়

সুপদ্ধতির সঙ্গে পাঠ্য-বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকা শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। যে বিষয়টি পড়াইবেন, সে বিষয় সম্পর্কে তাঁহার গভীর জ্ঞান থাকিবে। সেই বিষয়ের বিভিন্ন স্তর এবং তাহার মর্মার্থ তাঁহার জানা থাকিবে; তিনি যাহাতে বিষয়টি যথার্থ স্বরূপে ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করিতে পারেন। যদি বিষয়টি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে যত সুপদ্ধতিই প্রযুক্ত হউক না কেন তিনি পাঠে সাফল্য লাভ করিবেন না, ফলে ছাত্ররা উপকৃত হইবে না। উত্তম পদ্ধতির গুণে পাঠটি সরস, জীবন্ত ও মনোগ্রাহী হইল, কিন্তু বিষয়ের ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকার জন্য শিক্ষক গভীরভাবে বিষয়টি বুঝাইতে পারিলেন না। ফলে শিক্ষার বাইরের আবরণটি চাকচিক্য-মণ্ডিত হইল, ভিতরে সেই দারিদ্র্য রহিয়া গেল।

আবার উত্তম বিষয়ের জ্ঞান থাকিলেই হইবে না, পদ্ধতি প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষকের দক্ষতা থাকিতে হইবে। গভীর বিষয়ের জ্ঞানের ফলে শিক্ষকের বর্ণনা বিশ্লেষণ সুন্দর ও মনোগ্রাহী হইতে পারে, কিন্তু সেই পাঠ সুপদ্ধতি-প্রযুক্ত হইলে আরও লক্ষ্যাভিমুখী হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন বিষয়ের উপর ভাল দখল থাকিলেই উত্তম শিক্ষক হওয়া যায়, পদ্ধতির জ্ঞান না থাকিলেও চলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহারা কয়েক জন প্রতিভাধর শিক্ষকের উল্লেখ করেন। ব্যতিক্রম সর্বক্ষেত্রেই আছে। আবার একথা সত্য, প্রতিভাধর ব্যক্তিরা পদ্ধতির নীতি নিয়ম না জানিয়াও নিজস্ব প্রজ্ঞার আলোকে পদ্ধতির সৃষ্টি করেন। কাজেই ঐ সব দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই—প্রতিভাধর শিক্ষকের সংখ্যাও বেশী নয়।

সুতরাং দেখা গেল, শিক্ষকের পক্ষে একদিকে যেমন বিষয়ের উপর দখল থাকিবে, অন্য দিকে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ ও প্রয়োগে দক্ষতা অর্জন করিবে। এই দুই শক্তির সমন্বয়ে শিক্ষাদানকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইবে। একটির অবর্তমানে অন্যটি অচল—মূল্য কমিয়া যাইবে। শিক্ষার সার্থকতার পক্ষে বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত জ্ঞান ও পদ্ধতি-প্রকরণের সুপ্রয়োগ দক্ষতা বিশেষভাবে কার্যকর।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার পক্ষে জ্ঞানের ব্যাপকতা গ্রহণে অনেক সময় অসুবিধা হয়। তাঁহারা বিভিন্ন পদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, যাই না কেন প্রয়োজন-ভিত্তিক হউক তাহাদের কোথাও না কোথাও সীমাবদ্ধতা আছে। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সর্বক্ষেত্রে ইহার বিচরণ-ক্ষমতা নাই—পদ্ধতির মাধ্যমে অনেকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করা যায় না। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা অনুবন্ধ প্রণালী এবং প্রজেক্ট-মেথডের উল্লেখ করিয়াছেন। কাজ, পরিবেশ বা বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধীভাবে সব বিষয় এবং বিষয়ের সবদিক পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া যায় না। এই দিক দিয়া এই পদ্ধতির কিছুটা ত্রুটি আছে। যে-সব বিষয় বা বিষয়ের অংশ অনুবন্ধ বা অনুরূপ পদ্ধতিতে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা দেওয়া যাইবে না, সেই বিষয় বা বিষয়ের অংশ অন্য যে কোন পদ্ধতিতে পাঠ দিবার স্বাধীনতা শিক্ষকের সব সময় থাকিবে। আমরা

পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি, পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। স্থান-কাল-পাত্র অর্থাৎ শিক্ষার্থী শিক্ষক ও বিষয়ভেদে পদ্ধতির পরিবর্তন করা যাইতে পারে। মনে রাখা দরকার—জ্ঞানার্জন মূল লক্ষ্য, পদ্ধতি উপায় মাত্র।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of Methodology in teaching.
2. Write in details the general principles of teaching.
3. Discuss the relation between knowledge of content and Methodology.

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষণ-পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তন

(Evolution of Teaching Method)

শিক্ষণ-পদ্ধতির অর্থ

শিক্ষাদান বা পাঠদান কার্যে সফলতা লাভের জন্য যে পূর্বনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকেই শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে। শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে সফল হইয়াছেন বলা চলে। সুতরাং শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সুচিন্তিত উপায় বা কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকেই শিক্ষাদান পদ্ধতি বলে। শিক্ষাদানের বা পাঠদানের সম্যক্ কার্যপ্রণালীই শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের উপায়। যেমন—কিভাবে পাঠদান কার্য আরম্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ বিষয় ছাত্রের সম্মুখে স্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য বা চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কি কি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে বা কি শিক্ষাসরঞ্জাম ব্যবহার করিবে, পাঠদান-কার্যে শিক্ষক ও ছাত্র কিভাবে সহযোগিতা করিবে ইত্যাদি সমস্ত বিষয় শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের উপায়।

শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্রম-বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষাদান পদ্ধতির সমালোচনা করিয়া একজন লেখক বলিয়াছেন, "পূর্বে শিশুই শিক্ষা করিত এবং শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত, বর্তমান সময়ে শিক্ষকই পাঠ শিক্ষা করে এবং ছাত্রদের নিকট পাঠ বলে।" এই মন্তব্য করার কারণ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে শিক্ষকরা কেবল পাঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন এবং ছাত্রগণ তাহা গৃহে শিক্ষা করিয়া আসিয়া শিক্ষকের নিকট পাঠ বলিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পদ্ধতির এই পরিবর্তন একদিনে আসে নাই। পদ্ধতির ক্রম-বিবর্তনের

ধারাগুলি আলোচনা করিলে আমরা বিভিন্ন যুগের শিক্ষা-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য এবং ক্রমবিকাশের সূত্রগুলি দেখিতে পাইব।

(ক) প্রাচীনকালের শিক্ষা-পদ্ধতি অনুকরণ

প্রাচীন যুগে, বরং বলা চলে আদিম সমাজে বিদ্যালয় ছিল না এবং শিশুকে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দিবার মত কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। শিশু জীবনের পথে বড়দের কাজ অনুকরণ করিত এই এই ভাবে হস্ত-পদের ব্যবহার, পশু শিকার, আহার সংগ্রহ, যৌথ জীবন যাপন, অস্ত্র-নির্মাণ ইত্যাদি কৌশল ও আচরণ শিখিত। এইভাবে বড়দের অনুকরণ করিয়া ক্রমে তাহারা চাষ, গৃহ-নির্মাণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সমাজ-জীবনের নানাবিধ সম্বন্ধ শিখিত ও অভ্যাস করিত। এই সময় শিক্ষা চলিত সম্পূর্ণরূপে পরোক্ষ প্রণালীতে।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি—মৌখিক

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ছিল মূলতঃ মৌখিক। বেদ এবং বিপুল ধর্মগ্রন্থ শিশুকে মৌখিক প্রণালীতেই শিক্ষা দিতেন। ছাত্ররা একত্রে বেদ গুরুর নিকট শুনিয়া বার বার আবৃত্তি করিয়া মুখস্থ করিত। সে যুগে মুখস্থ করার উপরেই সর্বাধিক জোর দেওয়া হইত। যদিও গুরু আলোচনার দ্বারা বিষয়টির মর্মার্থলাভে সাহায্য করিতেন, কিন্তু সে পরবর্তী পর্যায়ে। প্রথম পর্যায়ে শিক্ষার্থীকে সমগ্র বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিতে হইত। শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিতে হইত বলিয়া বেদের অপর নাম শ্রুতি। সে যুগে ভারতে কঠোর শৃঙ্খলার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল।

প্রাচীন চীনের শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রাচীন চীন দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল ভারতের অনুরূপ। বিষয়বস্তু মুখস্থ করার নীতিই গ্রহণ করা হইয়াছিল। যদিও তখন লিপির উদ্ভব হইয়াছিল, তথাপি পুস্তক পাঠকে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় নাই। শাস্ত্রবিধি কণ্ঠস্থ করাই ছিল রীতি। বিখ্যাত চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস অবশ্য এই নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বিষয়টি মুখস্থ করার সঙ্গে উপলব্ধি করার কথাও বলিয়াছেন।

প্রাচীন ইহুদীদের শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রাচ্যদেশের শিক্ষা-পদ্ধতির মতই প্রাচীন ইহুদীদের শিক্ষায়ও মুখস্থ করার উপর জোর দেওয়া হইত। ইহুদীদের ধর্মের অনুশাসন মুসার নীতিগুলি ছাত্রদের আবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ করিতে হইত। বাইবেলের অনুশাসন অনুযায়ী শৃঙ্খলার নীতিও ছিল অত্যন্ত কঠোর। বেত্রাঘাতকে তাঁহারা শিক্ষাদানের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ইহুদীদের মতে 'বেতকে অবহেলা করিলে ছেলে বাহিয়া যাইবে' নীতি কঠোরভাবে মানা হইত।

ক্রমে এই পদ্ধতির অসারতা ইহুদীদের মধ্যেও উপলব্ধ হইল। ট্যালমুড (Talmud), নামক নীতিগ্রন্থে এই পদ্ধতির ত্রুটির কথা বলা হইয়াছে। সেখানে বিষয়টির উপলব্ধির উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ট্যালমুডে বলা হইয়াছে বিষয়টি আগে উপলব্ধি হইলে সহজে মনে থাকিবে, মুখস্থ করা সহজ হইবে। তাহা ছাড়া শাস্তি

দানের কঠোরতা হ্রাসের বিষয়েও বলা হইয়াছে। ট্যালমুডের অনুশাসন মত বড় ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিলে তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিতে পারে। তাহা ছাড়া যাহাদের গ্রহণ করিবার মত মানসিক শক্তি আছে তাহাদেরই কেবল শিক্ষার সময় শাস্তি দেওয়া চলিতে পারে। নির্বোধ বা জড়বুদ্ধিদের কঠোর শাস্তি দিলেও কোন ফল পাওয়া যাইবে না।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষা-পদ্ধতি

প্রাচীন গ্রীসে মুখস্থ ও অনুকরণের উপর জোর দেওয়া হইত। মহাকবি হোমারের সময় ও পরবর্তীকালে বিশিষ্ট ও মহৎ ব্যক্তিদের অনুকরণ করাই ছিল প্রকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি। বড়দের তত্ত্বাবধানে মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শে শিশুদের জীবন গঠনের চেষ্টা করা হইত। শৃঙ্খলার নীতিও ছিল অত্যন্ত কঠোর। শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কঠোর শারীরিক শাস্তিদানেরও বিধান ছিল। প্রাচীন স্পার্টায় এই নীতি কঠোর ভাবে অনুসৃত হইত। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে শিশুদের দেহ ও মনের বিশেষ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইত। সেইজন্য শৃঙ্খলার নীতিও ছিল অত্যন্ত কঠোর।

সক্রেটিসের শিক্ষা-পদ্ধতি (Diatectic Method of Socrates)

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও শিক্ষক সক্রেটিস প্রাচীন গ্রীক শিক্ষা-পদ্ধতিতে নূতন ধারার প্রবর্তক। অনুকরণ ও মুখস্থ করণের পরিবর্তে তিনি আলোচনা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। সক্রেটিসের পূর্বে এই ধরণের পদ্ধতির কথা শোনা যায় নাই। সক্রেটিসের শিক্ষা-নীতির মূলকথা হইল শিক্ষক ও ছাত্রের আলোচনার মাধ্যমে মূল সত্যের অনুসন্ধান করা। সক্রেটিস এইজন্য মূল সত্যকে ভাঙ্গিয়া ছোট ছোট সত্য বা সমস্যা সৃষ্টি করিতেন এবং প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সেইগুলির সমাধান করিতেন। এইভাবে সম্পূর্ণ সত্যটি শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হইত। এই পদ্ধতিতে সক্রেটিস এমন পরিবেশ রচনা করিতেন যে, আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজেই সত্যের পথে চলিত। শিক্ষক শিক্ষার্থীর ভূমিকা লইত। আলোচনার সময় মনে হইত শিক্ষক নিজেই সত্যের স্বরূপ জানেন না। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া ছাত্রের জানা বিষয় হইতে অজানার দিকে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করাইতেন। এইভাবে শিক্ষার্থীকে নূতন জ্ঞান অনুসন্ধান ও উপলব্ধিতে সাহায্য করিতেন।

সক্রেটিস এই পদ্ধতিকে জ্ঞানার্জনের পথ বলিয়াছেন। তিনি এই পদ্ধতিতে নিজের জ্ঞানকে সবিনয়ে গুপ্ত রাখিয়া প্রত্যেকের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্য রহিয়াছে তাহার বিকাশের চেষ্টা করিতেন। তাহার পদ্ধতিকে এইজন্য বিতর্কমূলক পদ্ধতি (Diatectic Method) বলা হয়।

প্লেটোর শিক্ষা-পদ্ধতি

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গুরুর অনুকরণে আলোচনাকেই শিক্ষার পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহাকে আরও প্রণালীবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর শৃঙ্খলার নীতিকেও গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্লেটো সক্রেটিসের মত সর্বসাধারণকে শিক্ষা দিতেন না বা হাটেবাজারে যত্র তত্র শিক্ষা দিতেন না।

শিক্ষার জন্য তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে গুণ বিচার করিয়া তিনি বিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি করিতেন। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি ছিল সক্রেটিসের অনুরূপ। তবে শিক্ষণীয় বিষয় অনুসারে ক্রমভিত্তিক আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করিতেন। ফলে শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ও প্রণালীবদ্ধ।

অ্যারিস্টটলের শিক্ষাপদ্ধতি

প্লেটোর ছাত্র অ্যারিস্টটল শিক্ষা-পদ্ধতিতে সক্রেটিস ও প্লেটোর পদ্ধতিকে সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রভাব বিস্তারের নীতির বিরোধিতা করেন। সফিস্টরা শিক্ষা-পদ্ধতিরূপে শিক্ষকের গুণবত্তার প্রাধান্য দিয়াছিল। শিক্ষকের অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করাই ছিল সফিস্টদের নীতি। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু ছিল নিষ্ক্রিয়—তাহার ভূমিকা ছিল কেবল গ্রহিতার।

অ্যারিস্টটল বিতর্কমূলক পদ্ধতির পরিবর্তে বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পদ্ধতির কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রতিটি বাস্তব ঘটনার মধ্যে সত্য আছে—এই সব বিশেষ সত্য এক সাধারণ সত্যের অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ সত্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাধারণ সত্যের অনুসন্ধানই প্রকৃষ্ট শিক্ষা পদ্ধতি। আরোহী-পদ্ধতি লইয়া তাঁহার নিজের প্রতিষ্ঠানে অনেক গবেষণা করেন। তিনি আলোচনার মধ্যে বক্তৃতা বা বর্ণনার প্রবর্তন করেন।

কিন্তু অ্যারিস্টটলের অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বা আরোহী প্রণালীর শিক্ষা-পদ্ধতি তৎকালে গ্রীসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই। সফিস্টদের শিক্ষা-পদ্ধতিই দীর্ঘদিন গ্রীসে চালু ছিল।

প্রাচীন রোমান শিক্ষাপদ্ধতি

প্রাচীন রোমে কোন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গড়িয়া উঠে নাই। সেখানে সক্রেটিস, প্লেটো বা অ্যারিস্টটলের শিক্ষানীতির প্রয়োজন অনুভব করিত না। প্রাচীন রোমের শিক্ষা-পদ্ধতিতে অনুকরণ ও মুখস্থের উপর জোর দেওয়া হইত। অনুকরণ অর্থে হোমারের মতানুসারে মহৎ ব্যক্তিদের জীবন অনুসরণ নয়, রোমান যুবকদের আদর্শ ছিল তাহাদের পিতা। রোমান শিশুরা সর্বতোভাবে তাহার পিতাকে অনুকরণ করিত। অবশ্য গল্প গাথা কাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাচীন সংস্কৃতি ও কৃষ্টিরও পরিচয় লাভ করিত। রোমান-মতে পরিবারই হইল প্রকৃষ্ট শিক্ষাক্ষেত্র।

কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষা-পদ্ধতি

রোমান শিক্ষকদের মধ্যে সর্বপ্রথম চিন্তাশীল স্রষ্টা হইলেন কুইন্টিলিয়ান। পদ্ধতির ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট হইয়া আছেন। তাঁহার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ছিল বাগ্মী তৈরী করা। ছাত্ররা বাগ্মী হইতে পারিলে কি রাজনীতি কি সমাজনীতি সর্বত্র সাফল্য লাভ করিতে পারিবে। সেইজন্য প্রথম হইতেই তাহাদের বাগ্মীতার দিকে অগ্রসর করিতে হইবে। এই জন্য তিনি অনুকরণ ও মুখস্থ করণের দিকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে আদর্শ বাগ্মীর অনুকরণ ও মুখস্থ করণের ক্ষমতা যাহার যত বেশী সে জীবনে ততই সাফল্য অর্জন করিবে।

এত দিন শিক্ষাক্ষেত্রে কঠোর শাসন নীতি প্রচলিত ছিল। তাঁহার মতে

বেত্রাঘাত কেবলমাত্র ক্রীতদাসদের জন্ত, বয়স্ক ছাত্রদেব বেত্রাঘাতে কোন ফল পাওয়া যায় না।

কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ব্যক্তিগত বৈষম্যের স্বীকৃতি। জন্মগত দিক দিয়া প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিটি শিশুর গ্রহণ-ক্ষমতা আলাদা। একই নীতির শিক্ষাদান সকলের পক্ষে কার্যকর হইতে পারে না। শিশুর প্রকৃতি ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে। এইদিক দিযা তিনি আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের সমগোত্রীয়।

শিক্ষকদের সম্পর্কে তাঁহার নীতি বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। তিনি বলিয়াছেন, শিক্ষক শিশুর প্রশংসা প্রাপ্য হইলে প্রশংসা করিবেন। আবার অযথা প্রশংসা করিবেন না। আবার যেহেতু অনুকরণ শিক্ষা-পদ্ধতিব একটি অঙ্গ, সেইজন্ত বিদ্যালয়ে এমন পরিবেশ রচনা কবিবেন বা এমন ব্যবস্থা রাখিবেন যাহাতে শিশুরা অনুকরণে আগ্রহী হয়।

যীশুখ্রীস্টের শিক্ষা-পদ্ধতি

মহাত্মা যীশুখ্রীস্ট একটি নূতন ধর্মেব প্রবক্তা। তিনি নিজের ধর্মমত প্রচার করিবার সঙ্গে সঙ্গে লোককে সদুপদেশ দিতেন। ইহাকেই তাঁহার শিক্ষা বলা হয়। প্রচলিত অর্থে শিক্ষক ছিলেন না, কিন্তু আসলে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম লোক-শিক্ষক। ধর্ম ও লোক-শিক্ষায় তিনি শিক্ষকের ভূমিকা লইতেন।

তাঁহাব শিষ্যরা তাঁহার সাহচর্যে তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা পাইত এবং তিনি উপদেশ দিয়া তাহাদের শিক্ষা দিতেন। অনেক লোকও তাঁহাদের উপদেশ শুনিতে আসিত এবং তিনি ধর্মপ্রচাব করিবার জন্ত বাহিরে যাইতেন। ধর্মপ্রচার এবং লোক-শিক্ষার জন্য যীশু প্রধানতঃ চারিটি পদ্ধতি অবলম্বন কবিতেন।

(১) **বক্তৃতা**—তিনি সুললিত ভাষায় মনোগ্রাহী করিয়া বলিতে পারিতেন। তিনি যখন বলিতেন, সমবেত জনতা মন্ত্রমুগ্ধেব মত শুনিত। প্রতিটি কথা তাহাদের মর্মস্পর্শ কবিত।

(২) যীশু কোন জ্ঞানমূলক কথা বলিয়া কিছুক্ষণ নীরব থাকিতেন। চিন্তন, সমীকরণ ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শ্রোতারা এই কথাটির মর্ম উদ্ঘাটন করিত।

(৩) গল্পচ্ছলে নীতি উপদেশ দেওয়া। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে এটিও অন্যতম। তিনি কথার মধ্যে প্রায়ই ছোট ছোট নীতিমূলক গল্প বলিতেন। গল্পের মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্য নীতিগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিত। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে এই ধরণের অনেক গল্পের উল্লেখ আছে।

(৪) **প্রচার**—নিজের মতামত সরল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার ভাষার মাধুর্য ও আন্তরিকতায় সবাই মুগ্ধ হইয়া শুনিত।

(খ) মধ্যযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি

যীশুখ্রীস্টের মৃত্যুব পর তাঁহার শিষ্যরা মূলতঃ তাঁহার প্রবর্তিত পদ্ধতিতেই প্রচার-কার্য চালু রাখিলেন। পরবর্তীকালে সমগ্র ইয়োরোপখণ্ডে খ্রীস্টধর্ম দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত

ইবার পর শিক্ষা-পদ্ধতিও গতানুগতিক হইয়া পড়িল। রোমান রাজত্বের শেষের দিকে শিক্ষা-পদ্ধতি আরও গতানুগতিক ও প্রাণহীন হইয়া উঠিল। তখন শিক্ষা লিতে অনুষ্ঠানকেই বলা হইত।

এই প্রাণহীন আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার প্রথম সমালোচক হইলেন সেণ্ট অগাস্টাইন St. Augustine, 354-430 A.D.)। তিনি এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ রিলেন। তিনি অনুষ্ঠান অপেক্ষা শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে বেশী গুরুত্ব দিযাছেন। ইদিক দিয়া তিনি ভারতীয় ঋষিদের অনুরূপ। তাঁহার প্রার্থনার নীতি হইল গাড়ম্বর বর্জিত সহজ সরল অভিব্যক্তি। বাহ্যিক রীতি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন কম। ক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য হইল শিশু কেবল শিক্ষকের কথা শুনিয়া শিক্ষা াইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তার উপর জোর দিয়াছেন। শিশুরা আলাপ-ালোচনা ও আগ্রহের ভিত্তিতে সক্রিয় ভাবে শিক্ষালাভ করিবে।

যাজকদের শিক্ষা-পদ্ধতি

গ্রীক ও রোমান সভ্যতার পতনের পর ইয়োরোপের শিক্ষাজগতেও অন্ধকার মিয়া আসিল। গ্রীক, রোমান ও অগাস্টাইনের শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে কেহ দৃষ্টি ল না। সব শিক্ষা-ব্যবস্থা খ্রীস্টের অনুশাসন অনুযায়ী চলিতে লাগিল। মুখস্থ অনুকরণ পদ্ধতি চালু হইল। ধর্মের গোঁড়ামির বেড়াজালে শিক্ষা আবদ্ধ হইয়া ত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া উঠিল।

কালক্রমে অ্যারিস্টটলের দর্শন ক্যাথলিক চার্চের অনুমোদিত পাঠ্য তালিকাভুক্ত ওয়ায় আবার গ্রীক দর্শন ও পদ্ধতির অনুপ্রবেশ ঘটিল। গ্রীকদর্শন ও খ্রীস্টধর্মের স্মিলিত রূপকে শিক্ষার বিষয়বস্তু করিবার প্রচেষ্টা দেখা দিল। যাঁহারা এই সমন্বয়ে শ্বাসী তাঁহাদের স্কুলমেন বলা হইত। এঁদের মধ্যে সন্ন্যাসী পিটার এ্যাবেলাড Peter Abelard, 1079-1142 A. D.) এই বিষয়ে বিশেষ উল্লেখের দাবী খেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা বিষয় লইয়া তিনি গভীর আলোচনা করিয়াছেন। চলিত রীতি অনুযায়ী তিনি গতানুগতিকতার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রশ্নোত্তরকে তিনি শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল প্রশ্ন দিয়া তিনি কটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার শিক্ষানীতি অনেক শিক্ষক ও ন্তাশীলকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

এ্যাবেলার্ডের নীতির অনুগামীদের মধ্যে সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাসের (St. Thomas Aquinas, 1225-1274 A.D.) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ত শিশুরা সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখিবে। শিশুরা প্রধানতঃ দুই ভাবে শিক্ষালাভ র। নিজস্ব সক্রিয়তার দ্বারা সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে একদল শিক্ষা পায়, অদল অন্যের সাহায্যে শিক্ষা লাভ করে। দ্বিতীয় দলের শিক্ষার ব্যাপারেও ক্ষক প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না। শিশুর সক্রিয়তাই শিক্ষার মূল কথা।

মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতি

মধ্যযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধানতঃ দুই রকমের শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বক্তৃতা ও আলোচনা। তখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই, পুস্তক বলিতে হাতের লেখা পুথিকেই বুঝাইত। ঐ সব পুথি ছিল অত্যন্ত মূল্যবান এবং শিক্ষার্থীর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ছিল না। পুথি সাধারণতঃ শিক্ষকরাই ব্যবহার করিতেন। শিক্ষকরা বক্তৃত দিতেন এবং ছাত্ররা নিজেদের খাতায় লিখিয়া লইত। তাহার পর আলোচনা। শিক্ষক প্রশ্ন করিতেন ছাত্ররা উত্তর দিত। এই ভাবে শিক্ষাকার্য চলিত।

সে যুগে একদিকে যেমন পুস্তক সহজলভ্য ছিল না, অন্যদিকে পুস্তকাশ্রয়ী-পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা মনে করিতেন পুস্তকের ভাষায় বলিলে ছাত্রদের বুঝিতে অসুবিধা হইবে। তাহাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে পুস্তকে একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী লিখিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন পড়ে। সুতরাং পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষা স্বাধীন চিন্তা, মুখস্থ করণ ও বুঝিবার পক্ষে উপযুক্ত নয়।

ক্রমে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুস্তকের আগমন ঘটিল। ফলে পদ্ধতিরও পরিবর্তন দেখা গেল। প্রামাণ্য গ্রন্থকে ভিত্তি করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট মান অনুযায়ী হইতে লাগিল। বক্তৃতা পদ্ধতির স্থলে আলোচনা শিক্ষার মূল পদ্ধতি রূপে স্বীকৃত হইল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পুস্তকের স্বীকৃতি

শিক্ষাক্ষেত্রে পুস্তকের ব্যবহার সঙ্গত কিনা এ বিষয়ে সে যুগে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ বিভিন্ন কথা বলিযাছেন। প্লেটো ও অ্যারিস্টটল মৌখিক শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। প্লেটোর মতে পুস্তক স্মরণশক্তি হ্রাস করে, কারণ প্রয়োজন হইলেই সহজেই পুস্তকের সাহায্য লওয়া যায়। ইসোক্রেটিসের মতে সর্বোত্তম পদ্ধতি হইল বক্তৃতা। পুস্তকের ভাষায় বক্তৃতা করিলে বক্তার স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বকীয়তা থাকে না। তাহা ছাড়া বিভিন্ন স্তরের ছাত্রদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পুস্তকের বাঁধাধরা নীতি অনুসরণ করায় অসুবিধা ঘটে।

কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রমে পুস্তকের ব্যবহার বাড়িয়া চলিল। ক্রমে শিক্ষাপুস্তক নির্ভর হইয়া উঠিল। বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকটি পুস্তককে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইল।

ক্রমে মধ্যযুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা ও বিতর্কমূলক শিক্ষা-পদ্ধতির অসারতা সম্পর্কে অনেকে সচেতন হইলেন। শিশুদের জন্য নূতন শিক্ষা-পদ্ধতির বিষয় অনেকে ভাবিতে লাগিলেন। শিশু ও বয়স্কদের শিক্ষা একই পদ্ধতিতে হওয়া উচিত নয়—এই সত্যের উপলব্ধি ঘটিল। আবার প্রাচীন সাহিত্য, ল্যাটিন, গ্রীক প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ পাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইল। শিক্ষা-পদ্ধতি আবার গতানুগতিক পর্যায়ে নামিয়া আসিল।

নবজাগরণের যুগ

শিক্ষা চিন্তার ক্ষেত্রে মধ্যযুগেও নূতন চিন্তার সূত্রপাত দেখা যায়। কয়েকজন

শিক্ষাবিদ্ গতানুগতিকতার ধারা অতিক্রম করিয়া নূতন ধারায় চিন্তা শুরু করিলেন। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে শিক্ষা-পদ্ধতি এই যুগে অগ্রগতির দিকে মোড় নিল।

ইরাসমাসের শিক্ষা-পদ্ধতি

নবযুগের শিক্ষা-সংস্কারের প্রধান পথিকৃৎ হইলেন ইরাসমাস (Erasmus 1466—1536)। প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনা করিয়া তাঁহার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মতে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের পাঠ আবশ্যক হইলেও পৃথক্‌ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন নাই। শিশু ব্যাকরণ শিখিয়া ভাষা শিখে না। সাহিত্য পাঠের সঙ্গে ব্যাকরণের নিয়মাবলী শিক্ষা দিতে হইবে। সাহিত্য পাঠের সময় লেখক-পরিচিতি তাঁহার রচনা-শৈলী প্রভৃতির সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় প্রয়োজন। পাঠটির সাহিত্যিক মূল্যায়ন সাহিত্য পাঠের অঙ্গ হওয়া উচিত।

শিক্ষা-পদ্ধতির দিক দিয়া তিনি নূতন কথা বলিয়াছেন। শিক্ষণের ক্ষেত্রে তিনি তিনটি প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথমে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও গ্রহণ-ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। আগ্রহের সূত্রে এবং গ্রহণ-ক্ষমতার উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করিতে হইবে। ইরাসমাসের মতে যদি সঠিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে শিক্ষার্থী সবরকম শিক্ষাই গ্রহণ করিতে পারিবে।

ইরাসমাস শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে শাস্তির প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে যে শিক্ষক প্রতিশোধ লইবার জন্য শিশুকে শাস্তি দেন তিনি শিক্ষক হইবার অনুপযুক্ত। তবে, তাঁহার মতে যদি একান্তই শাস্তি দিতেই হয় তাহা যেন সংশোধন-মূলক হয়। শিক্ষার্থী যেন বুঝিতে পারে তাহার অন্যায়ের জন্য শাস্তি পাইয়াছে। তাহার জন্য তাহার মনে যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি না হয়।

মাইকেল দ্য মণ্টেন (Michoel de Montaigne 1533—1592) শিক্ষা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে ইরাসমাসের চিন্তাধারা নূতন দিগন্তের সন্ধান দিল। তাঁহার পূর্বে কেউ অনুকরণ ও মুখস্থ করণের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেন নাই। ফরাসী সাহিত্যিক মণ্টেন ইরাসমাসের চিন্তাধারাকে আর একটু অগ্রসর করিয়া দিলেন। তিনিও অনুকরণ ও মুখস্থ করার নীতির ব্যর্থতার কথা বলিলেন। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার ফলে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত পক্ষে কিছুই শিখে না। তিনি বার বার অনুশীলনের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্ধতির দিক দিয়ে তিনি বিষয়বস্তুটি উপলব্ধি করার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। তাঁহার মতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানসিক শক্তি ও আগ্রহের ভিত্তিতে বৈষম্য থাকে। কাজেই একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়া চলে না। শিক্ষার্থীভেদে পদ্ধতি ভিন্নতর হইতে পারে। ইরাসমাসের মত মণ্টেনও শিক্ষাক্ষেত্রে দৈহিক শাস্তি দিবার বিরোধী। তাঁহার মতে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হইল এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে যেন শিক্ষার্থী নিজের জ্ঞান, বুদ্ধি, যুক্তি, বিবেচনা মত নিজেই শিক্ষা লাভ করে। শিক্ষক জোর করিয়া কোন কিছু শিক্ষা দিবেন না—তিনি শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করিবেন।

রজার্স অ্যাসকাম (Roger Ascham, 1515—1568)। ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ রজার্স অ্যাসকাম মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত। শিক্ষার্থী যাহা কিছু অসুবিধা বোধ করিবে বা সংশয় বোধ করিবে সবকিছু অসংশয়ে শিক্ষককে বলিবে। তাঁহার মতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও স্থায়ী করে। অ্যাসকাম বিদ্যালয়ে সর্বপ্রকার শাস্তির বিরোধী। এমন কি শিক্ষার্থীকে মৃদু তিরস্কার পর্যন্ত করা উচিত নয়। শাস্তিদানের ফলে ছাত্রের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ও শিক্ষা ব্যাহত হয়।

ভাষা শিক্ষায় অ্যাসকাম নূতন পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে অন্য ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদ ও পুনরায় অন্য ভাষায় অনুবাদের দ্বারা সেই ভাষা শিক্ষা সহজ হইবে।

মধ্যযুগের শেষ পাদে ইরাসমাস, মন্টেন অ্যাসকামের মত চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্দের নীতি ও পদ্ধতি সে যুগের শিক্ষা ধারাকে বিশেষ প্রভাবিত করে নাই। অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষে এইসব উন্নত পদ্ধতি গ্রহণ করা সাধ্যাতীত ছিল। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা পূর্বে যে অবস্থায় ছিল সেইখানেই রহিল। উন্নত পদ্ধতি মাঝে আলোড়ন তুলিলেও অচিরে সেই ঢেউ থামিয়া গেল।

খ্রীস্টান যাজকদের শিক্ষাপদ্ধতি (Prelection Method of the Monks

খ্রীস্টীয় প্রচারকগণ এক নূতন ধরণের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন করিলেন। তাঁহারা সাহিত্যধর্মী শিক্ষা ও অন্যান্য পদ্ধতির সংমিশ্রণে এক নূতন উন্নত ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষকদের এক ধরণের বক্তৃতার মাধ্যমে শিশু শিক্ষায় অগ্রসর হওয়া। শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের সাহিত্য পাঠ। ছাত্রদের পড়িতে দিবার আগে শিক্ষক নিজে পড়িয়া দিতেন এবং সেই পাঠ সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। প্রয়োজন বোধে ছাত্ররা শিক্ষকের বক্তৃতা লিখিয়া লইত।

খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকদের শিক্ষাচিন্তায় জেসুইটরা (Jesuits) উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ছয় জন যাজক শিক্ষাবিদ্ ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টদের শিক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া একটি উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতির পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এই পরিকল্পনার নাম রেসিও স্টাডিওরাম (Ratio studiorum, 1599 A.D.) এই পরিকল্পনায় পদ্ধতির একটি ক্রম দেওয়া হইয়াছে। এই পরিকল্পনা মত যে পাঠ দেওয়া হইবে প্রথমে শিক্ষক সেটির আদর্শ পাঠ দিবেন, দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষক পাঠ সহজভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যাহাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশগুলি সহজভাবে বুঝাইবেন। তৃতীয় স্তরে বিভিন্ন অনুচ্ছেদগুলি যোগসূত্র বা ধারাবাহিকতা অবলম্বন করিয়া আলোচনা করিবেন। চতুর্থ স্তরে শিক্ষক একই বা অন্য লেখকের অনুরূপ রচনার বিষয়বস্তু, রচনাশৈলী সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা করিবেন। সর্বশেষে শিক্ষক নিজের মন্তব্য রাখিবেন। খ্রীস্টীয় যাজকদের শিক্ষা-পদ্ধতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল :—

(১) শিক্ষার্থীর পুরোপুরিভাবে পাঠ আয়ত্তে না আসা পর্যন্ত প্রতিটি পাঠের পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। পরের দিন পূর্ব দিনের পাঠের পুনরাবৃত্তি করিতে হইত। সপ্তাহের শেষে এবং মাসের শেষে পূর্বতন পাঠের পুনরালোচনা হইত এবং বৎসরান্তে পরীক্ষার মাধ্যমে মান নির্ণয় করিতে হইত।

(২) শ্রেণীতে পাঠদানকালে শিক্ষকের বক্তব্যের অযৌক্তিকতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণের অধিকার শিশুদের ছিল।

(৩) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করিয়া নিজে বিচারকের আসনে বসিয়া শিক্ষক শিক্ষা-পদ্ধতিতে প্রাণ সঞ্চার করিতেন।

(৪) বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। বুদ্ধির মান অনুযায়ী বিভিন্ন মানের বক্তৃতা দেওয়া হইত। ইহাদ্বারা পদ্ধতি কার্যকর হইত, কারণ বৌদ্ধিক মান একরূপ হইলে শ্রেণীর কাজ আকর্ষণীয় করা যায়।

(৫) বিদ্যালয় ও শ্রেণী পাঠনার একঘেয়েমি ও ক্লান্তি দূর করিবার জন্য এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে খেলাধূলা ও নাটক অভিনয়ের কথা বলা হইল। কঠোর শাস্তি দিবার রীতি ছিল না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার অসুবিধা হইত না।

(৬) প্রত্যেক শ্রেণীতে একজন করিয়া মনিটার ছাত্রদের মধ্য হইতে নিযুক্ত করা হইত। মনিটারের কাজ ছিল প্রতিটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতি ও ত্রুটি শিক্ষককে জানান। দোষী ছাত্রকে শাস্তি দিবার অধিকার মনিটারের ছিল না। শিক্ষক সৎ আচরণের দ্বারা সংশোধন করিতে না পারিলে দুষ্ট ছাত্রটিকে সংশোধকের (corrector) কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। সংশোধক বিদ্যালয় বহির্ভূত ব্যক্তি। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া তিনি দোষীর শাস্তি বিধান করিতেন। ইহাতেও সংশোধন না হইলে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কার করা হইত।

খ্রীস্টীয় প্রচারকদের শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা

খ্রীস্টীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা বহুদিন চালু থাকিলেও ইহা ত্রুটি-বিচ্যুতির ঊর্ধ্বে ছিল না। ইহাকেও অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। জনসেনীয় সম্প্রদায় (Jansenists) এই সম্প্রদায়ের শিক্ষানীতির প্রধান সমালোচক। খ্রীস্টীয় শিক্ষা-পদ্ধতির ধর্মীয় আলোচনা এবং প্রতিযোগিতামূলক উৎসাহের নীতিকে জনসেনীয়রা চোখে দেখেন নাই। এদের মতে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কার পাইলে শিক্ষার্থীর মনে অহমিকা জাগে ও ফলে তাহার জ্ঞানস্পৃহা বিনষ্ট হয় ও নৈতিক অধঃপতন ঘটে। এই সম্প্রদায় খ্রীস্টীয়দের কঠোর শৃঙ্খলার নীতিরও সমালোচনা করিয়াছেন। জনসেনীয় সম্প্রদায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থায় মাতৃভাষার মাধ্যমে বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও সমকালীন লেখকদের পুস্তক পাঠের ব্যবস্থা ছিল। শৃঙ্খলার দিকে ইহারা কঠোরতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহাদের মতে প্রতি ১২ জন ছাত্রের শিক্ষার ভার একজন শিক্ষকের উপর থাকিবে এবং তিনি শিশুর চরিত্র গঠনের দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিবেন।

জনসেনীয় সম্প্রদায়

জনসেনীয় সম্প্রদায় ছাড়াও আর একজন শিক্ষাবিদ্ খ্রীস্টীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন তিনি হইলেন বিখ্যাত ফরাসী যাজক ও সাহিত্যিক মথে ফেনেলোঁ (Mothe Fenelon, 1651—1715)। তাঁহার মতে খ্রীস্টীয়দের কঠোর শৃঙ্খলার নীতি উত্তম শিক্ষার পক্ষে কার্যকর নয়। ফেনোলোঁর মতে শিশুকে ভয় দেখাইয়া কাজ হইবে না, এমন ভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করিতে হইবে যাহাতে শিশুদের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হয়। ফেনেলোঁর আর একটি মতবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এতাবৎ অনালোচিত স্ত্রীশিক্ষার উপরও তিনিই প্রথম গুরুত্ব আরোপ করেন।

ফেনেলোঁর মতবাদ

ফেনোলোঁর মতে অতি শৈশব হইতে শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। শিশুদের সকল প্রশ্নের উত্তর শিক্ষক সহজভাবে দিবেন যাহাতে তাহাদের কৌতূহল বজায় থাকে।

শৃঙ্খলা রক্ষা ও শাস্তির নিয়মাবলী

বিদ্যালয়ে শিক্ষা-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থাই শৃঙ্খলা সম্পর্কে নিজস্ব মতবাদ প্রচার করিয়াছে। বস্তুতঃ এতদিন বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার কোন সাধারণ নীতি-নিয়ম ছিল না। খ্রীশ্চিয়ান ব্রাদার্স নামক একটি সংস্থা ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সংস্থাই বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন। এই-সব নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে শিশুদের শাস্তি দেওয়ার বিধান ছিল। সেণ্ট জন ব্যাপটিস্ট দ্য-লা সালে (St. John Baptist De-la Salle) ছিলেন এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার নীতিগুলি তাঁহার রচিত "কণ্ডাক্ট অব্ দা স্কুলস" পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও ছাত্র কঠোর নীতি-নিয়মের বশবর্তী হইবেন। শিক্ষক গুরুগম্ভীর হইবেন, ছাত্রদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করিবেন না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা ও পূর্ণ নীরবতা পালনই ছিল প্রথম কর্তব্য।

খ্রীশ্চিয়ান ব্রাদার্স

খ্রীস্টীয় সংঘের বিদ্যালয়ের মত খ্রীশ্চিয়ান ব্রাদার্স স্থাপিত বিদ্যালয়গুলিতেও মনিটর প্রথা চালু ছিল। মনিটরের কাজ ছিল শিক্ষকের অনুপস্থিত কালে শ্রেণীর শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং ছাত্রদের পাঠ লক্ষ্য করা। ছাত্রদের ত্রুটি-বিচ্যুতি শিক্ষকের গোচরে আনা। কোন ছাত্রকে শাস্তি দিবার অধিকার মনিটরের ছিল না। শাস্তি দিতেন শিক্ষক। কণ্ডাক্ট স্কুলস অনুযায়ী পাঁচ রকমের শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। প্রথমে কম অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি ছিল কঠোর তিরস্কার। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষার্থীর শাস্তি প্রায়শ্চিত্তমূলক। যেমন, নতজানু হইয়া থাকা বা অন্য ছাত্রদের তুলনায় বেশী কাজ দেওয়া ইত্যাদি। শাস্তির তৃতীয় স্তরে বেশী অপরাধের জন্য ছাত্রকে চামড়ার চাবুক দিয়া আঘাত করা। অবশ্য অনুপস্থিত ও অনগ্রসর ছাত্রদেরই কেবলমাত্র এই শাস্তির বিধান ছিল। চতুর্থ স্তরে ছাত্রকে বেত্রাঘাত করা হইত। অধিক অপরাধের জন্য এই শাস্তি দেওয়া হইত। যদি উপরিউক্ত চার প্রকারের শাস্তি

মনিটর

শাস্তির নীতি

দিয়াও কোন ছাত্রকে সংশোধন করা যাইত না, তখন তাহার উপর পঞ্চম শাস্তি প্রয়োগ করা হইত। পঞ্চম শাস্তি ছিল বিদ্যালয় হইতে বিতাড়ন।

কণ্ডাক্ট অব স্কুলস্ অনুযায়ী শাস্তি জনবিরল স্থানে দিতে হইবে। শিক্ষক শাস্তি দিবার সময় শিক্ষকের কোন রাগ বা উত্তেজনা থাকিবে না। ছাত্র যেন মনে না করে শিক্ষক প্রতিহিংসার বশে শাস্তি দিতেছেন। কি কারণে শাস্তি দেওয়া হবে তাহা যেন ছাত্রকে পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী তাহার অপরাধ বুঝিতে পারে এবং অনুতপ্ত হয়। শাস্তি দিবার পর ছাত্র শ্রেণীতে নতজানু হইয়া শিক্ষকের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করিবে। তবে লঘু পাপে যেন গুরু দণ্ড দেওয়া না হয় সেদিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জনব্যাপটিস্ট বিচারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। প্রথমতঃ, ছাত্র সত্যই দোষী কিনা, দোষী হইলে তাহার গুরুত্ব ও মাত্রা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। তাহার পর শাস্তি ঠিক করিতে হইবে। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি নির্ধারিত হইবে। মানসিকভাবে শান্ত ও সংযত চিত্তে শিক্ষক শাস্তি বিধান করিবেন। অন্য ছাত্রের সম্মুখে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়, ছাত্র অনুযায়ী শাস্তি বিভিন্ন হইবে। দেহের পক্ষে ক্ষতিকর কোন শাস্তি দেওয়া উচিত নয়।

শৃঙ্খলাভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতি (Disciplinary Method of Instruction)

কেবল শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই শাস্তির বিধান ছিল তাই নয়, কোন কোন শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যেও শাস্তি ব্যবহৃত হইত। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীর বিষয়টির উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত না। শিক্ষার্থীর পক্ষে শক্ত হইলেও যে কোন প্রকারে তাহাকে পাঠটি আয়ত্ত করিতে হইত। এই মতাবলম্বীদের ধারণায় এই কঠোরতার ফলে শিক্ষার্থীর মনে বাধ্যতামূলকভাবে কতকগুলি শৃঙ্খলাবোধ জন্মাইত, যেমন— নিয়মানুবর্তিতা, আত্মসংযম, পাঠে মনোযোগ ইত্যাদি।

জনলকের শিক্ষা-পদ্ধতি (John Locke, 1632—1704)

জনলক প্রচলিত গ্রামার স্কুলগুলির শিক্ষা-ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। এইসব স্কুলে কঠোর শাস্তির নীতি প্রচলিত ছিল। লক শৃঙ্খলাভিত্তিক শিক্ষানীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক শাস্তিকে সর্বশেষ নিন্দিত অস্ত্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে লক শিশুর আগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শিশুকে কোন কাজ করিতে বাধ্য করান যায় না, তাহাতে ভাল কাজ হইবে না। শিশুর আগ্রহ ও ইচ্ছার ভিত্তিতে শিক্ষা দিলে শিক্ষার অগ্রগতি অব্যাহত থাকিবে। সেইজন্য সর্বপ্রথম শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের উদ্বোধন করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয় সহজ ও সরল করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মতে পূর্বার্জিত জ্ঞানের সঙ্গে নূতন বিষয়-বস্তুর পারম্পর্য বজায় রাখিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। তিনি শিশুর কৌতূহলকে শিক্ষার

অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাহার কৌতূহল বজায় রাখিতে হইবে।

মধ্যযুগের শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা

মধ্যযুগের শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করিলে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সবই শৃঙ্খলার ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া মনে হয়। শিক্ষা ছিল মূলতঃ মুখস্থধর্মী ও জ্ঞানমুখী। উপলব্ধির কোন ব্যবস্থা ছিল না। শিক্ষায় শিশুকে মনোযোগী করিবার পদ্ধতিরূপে শাস্তি ও পুরস্কারের নীতি অব্যাহত ছিল। ইরাসমাস, কুইন্টিলিয়ান, মন্টেন প্রভৃতি শিক্ষানায়কগণ যদিও অন্য কথা বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের উদার নৈতিক নীতি সে যুগে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

তাহা ছাড়া মধ্যযুগের বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দমনমূলক নীতির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

একথা ঠিক শিক্ষা-ব্যবস্থায় সামাজিক পরিবেশের ছাপ পড়ে। মধ্যযুগের ইয়োরোপের সমাজব্যবস্থা ছিল বৈষম্যে ভরা—সেখানে ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধবিগ্রহ উত্থান-পতন লাগিয়াই থাকিত। অভিজাত জমিদার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সমাজের প্রভাবে বিদ্যালয়-সমাজও হয়তো বিমল ছিল না। সেইজন্য সেখানে দমনমূলক নীতির প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

মধ্যযুগে শিক্ষার অর্থই ছিল সংকীর্ণ। লেখা পড়া ও গণিতের সামান্য জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলা হইত। শিক্ষার সঙ্গে উন্নত জীবন গঠনের কথা বলা হইত না। বাস্তবতঃ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগও ছিল না। এই যুগের শিক্ষা পদ্ধতিও উন্নত মানের ছিল না। মনোবিজ্ঞানের নীতি অনুযায়ী পদ্ধতি নির্ধারিত হইত না। পদ্ধতি হিসাবে বক্তৃতা ও বিতর্ককে ব্যবহার করা হইত। শিক্ষা ছিল মুখস্থকরণ। এই পদ্ধতিগুলি নীরস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলিয়া সর্বস্তরের ছাত্রদের গ্রহণযোগ্য নয়। কাজেই ছাত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিগুলির ব্যর্থতা স্পষ্ট হইয়া দেখা দিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর পর শিক্ষার নবযুগের সূচনা। এই যুগে প্রথম ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতির দেখা মেলে।

কমেনিয়াসের ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতি

নবজাগরণের প্রথম যুগে জন কমেনিয়াস (Johans Amos Comenius, 1592—1670) ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষার কথা বলিয়া নূতন পদ্ধতির সূচনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, "যদি বালকদের ব্যায়াম করানো যায়, প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে, তাহার পর যথাক্রমে স্মৃতিশক্তি, বোধশক্তি ও সবশেষে বিচার-শক্তিকে, তাহা হইলেই তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায়। কারণ, জ্ঞানের আরম্ভ হয় ইন্দ্রিয় হইতে এবং তাহার পর তাহা যখন কল্পনার মাধ্যমে স্মৃতিশক্তিতে চলিয়া আসে, তখন জগৎকে বুঝা যায়। সর্বশেষে আসে বিচার-শক্তি। এই শক্তিই আমাদের জ্ঞান প্রতিষ্ঠার পথে লইয়া যায়। তাহার মতে সমস্ত পাঠ্য-বিষয় এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষা সহজ হয়। পরোক্ষ

ান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কার্যকারিতা বেশী এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সেই প্রত্যক্ষ ান লাভ সম্ভব হয়। সেইজন্য ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষার উপর জোর দিয়াছেন।

যদিও কমেনিয়াস প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই ধারণা ম্পর্কে তাঁহার ধারণা বিশিষ্ট। তাঁহার মতে যে তিনটি পথে জ্ঞান আহরণ করা :ল তাহা হইল ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও স্বর্গীয় দান। যদি এই তিনটি পথের সমন্বয় সম্ভব য়, তাহা হইলে সব ভ্রান্তির অবসান হইবে। তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতির মূল কথা ইল :—

(১) সব শিক্ষণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে। দ্রব্য বা বস্তু খান, প্রকৃতি বা প্রতীকের সাহায্যে বিষয়টি বুঝাইতে হইবে।

(২) সহজ ও সরল ভাবে শিখাইতে হইবে।

(৩) প্রাত্যহিক প্রয়োজনে বা বিশেষ প্রয়োজনে লাগিবে সেই বিষয়গুলি শখাইতে হইবে।

(৪) বিষয়টির স্বরূপ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে হইবে।

(৫) পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর পরবর্তী জ্ঞানের ভিত্তি রচিত হইবে।

(৬) এক সঙ্গে একটি বিষয় শিখাইতে হইবে। সহজ হইতে ক্রম অনুসারে ক্তের দিকে যাইতে হইবে।

(৭) বিভিন্ন বিষয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। তাহা হইলে ান পরিচ্ছন্ন ও বিশিষ্ট হইবে।

শিক্ষার কাল পরিধিকে কমেনিয়াস চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। শশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন। প্রত্যেক পর্বের কাল পরিধি ছয় বৎসর। তাঁহার তে শৈশবে মাতৃশিক্ষায় বহিরেন্দ্রিয়, বাল্যে মাতৃভাষা শিক্ষায় অন্তরেন্দ্রিয়, কল্পনা ও স্মৃতিশক্তি; কৈশোরে জিমনেসিয়ামে বোধ ও বিচারশক্তি এবং যৌবনে বশ্ববিদ্যালয়ে সকলের যোগাযোগের সূত্র ইচ্ছাশক্তির চর্চা করা উচিত।

শিক্ষাগুরু-রূপে কমেনিয়াসকে মার্টিন লুথারের শিক্ষা-বিষয়ক চিন্তার উত্তরসূরী লা যায়। সর্বপ্রথম কমেনিয়াসই শিক্ষায় সমানাধিকারের কথা বলিয়াছেন। তিনি লিয়াছেন, "শুধু ধনী বা ক্ষমতাশালীর পুত্র কন্যা নয়; ধনী, দরিদ্র, বালক, ালিকা.—সকলকেই শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত।"

শিক্ষাদর্শের জন্য তিনি কিয়ৎ পরিমাণে পূর্বসূরী দার্শনিক বেকনের কাছে ঋণী। বকনের আকর্ষণ ছিল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও সত্যের প্রতি। কিন্তু কমেনিয়াস যমন এক জ্ঞানের পূজারী সেখানে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুইই থাকিবে।

তাঁহার শিক্ষানীতিগুলি প্রকাশ্যভাবে পরিচিত না হইলেও পরবর্তী শিক্ষা-ক্ষেত্রে াঁহার শিক্ষাদর্শ বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। প্রাথমিক শিক্ষার বষয় ও ক্রম সম্পর্কে তিনিই সর্বপ্রথম সুস্পষ্ট ধারণা দেন। সেই স্তর বর্তমান শক্ষা ব্যবস্থাতেও অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা-দ্ধতি পরবর্তীকালে বিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

রুশো ও রোমান্টিক শিক্ষাপদ্ধতি (Romantic Method of Rousseau)

ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলনে রুশো নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন। তাঁহার শিক্ষানীতির মূল কথা হইল :—

(১) শিশুর শিক্ষা প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে। প্রকৃতি অর্থে শিশুর স্বভাবজাত ক্ষমতা তাহার রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা। যাহা তাহার প্রকৃতিগত, তাহাই তাহার পক্ষে মঙ্গলকর, যাহা কৃত্রিম, তাহা তাহার পক্ষে ক্ষতিকর।

(২) শিক্ষা হইল শিশুর সহজ বিকাশ। বাহির হইতে তাহার বিকাশে বাধা দেওয়া সঙ্গত নয়। তাহার উপর চাপ সৃষ্টি করাও চলিবে না।

(৩) শিক্ষার লক্ষ্য জ্ঞান অর্জন নয়—শিশুর স্বাভাবিক শক্তিগুলির পুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধন। তাহার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়, তাহার শরীর মনের সম্যক্ পুষ্টি।

(৪) পিতা মাতা বা বয়স্কদের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার প্রকৃতি নির্ধারিত হইবে না, শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষানীতি নির্ধারিত হইবে।

(৫) প্রকৃতিদত্ত শক্তির ক্ষেত্রে শিশুতে শিশুতে যে পার্থক্য থাকে, তাহা জানিয়া শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) শিশুর সক্রিয়তা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রসঙ্গ যেন শিক্ষা-ব্যবস্থায় থাকে।

(৭) শিক্ষা আসিবে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে।

(৮) ১২ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞানগত কোন শিক্ষা দিবার, প্রয়োজন নাই। তাহার পর শিশুর আগ্রহ ও শক্তি অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে।

(৯) শিশু নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী শিখিবে। শিক্ষক অন্তরালে থাকিয়া শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে ক্ষতিকর বাধা সরাইয়া তাহাকে সাহায্য করিবেন।

শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার কথা বলার জন্য রুশোকে অনেকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শিশুকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে, একই শিক্ষাধারা সব শিশুর পক্ষে প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিক্ষার পদ্ধতি ভিন্নরূপ হইবে।

রুশো নেতিবাচক শিক্ষার প্রবর্তক। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে শিশু আপন প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি হইতে শিক্ষালাভ করিবে। তাহাকে কোন কিছু নির্দেশ দেওয়া বা নিষেধ করাও চলিবে না। ঠেকিয়া বা কাজ করিয়া বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া, ইন্দ্রিয় সঞ্চালনের ভিতর দিয়া তাহার দেহমন গড়িয়া উঠিবে।

অনেক সমালোচক রুশোর শিক্ষাধারার অনেক অসঙ্গতি ও ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী নয়, সর্বযুগে রুশোর 'এমিল'-কে শিক্ষা সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ পুস্তকরূপে ধরা চলে। প্রাকৃতিক শিক্ষার কথা সহজবোধ্য না হইলেও শিক্ষা-চিন্তার বন্ধন মুক্তিতে এমিল অপরিসীম সাহায্য করিয়াছিল। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা তাঁহার বিশিষ্ট অবদান সমাজের কলুষতার ঊর্ধ্বে মানুষকে স্থান দিয়া প্রকৃতির স্নেহ-বাৎসল্যে নূতন সমাজ সৃষ্টির পরিকল্পনা এবং শিক্ষাকে শিশু-মনোবৃত্ত্যানুসারী করিবার চিন্তার জন্য সর্বদেশে সর্বকালে সকল শিক্ষাবিদ্ কর্তৃক রুশো নন্দিত হইবেন।

বেসডোর বিদ্যালয়

রুশোর শিক্ষা-পদ্ধতির বাস্তব রূপকার হইলেন জোহান হেনরিক বেসডো (Johann Heinrich Basedow, 1724—1790)। জার্মান শহর ডেমোতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটির নাম ছিল বার্ণহার্ড ফিলানথ্রপিনাম (Bernhard Philanthropinum) এই স্কুলে রুশোর শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত। হাতের কাজ, খেলাধূলা, ব্যায়াম, ইত্যাদির মাধ্যমে সক্রিয় ও ইন্দ্রিয়ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

নবযুগের শিক্ষা-পদ্ধতি

উনবিংশ শতকে শিক্ষা-জগতে নূতন প্রাণস্পন্দন লক্ষিত হইল। পুরাতন ধ্যান-ধারণা অতিক্রম করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আরও বাস্তব ও প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত হইল। রুশোর ভাবধারা পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়া বাস্তব উপযোগী ও প্রয়োগসিদ্ধ করিয়া তোলেন জোহান হেনরিক পেস্টালৎসী (Johann Heinrich Pestalozzi), জনফ্রেডারিক হার্বার্ট (John Frederick Herbart), ফ্রেডারিক ফ্রয়েবল (Frederick Froebel)। ইহাদের মধ্যে পেস্টালৎসীই প্রথম ও প্রধান শিক্ষাবিদ্ যিনি রুশোর তত্ত্বকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য মনস্তত্ত্বসম্মত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন।

পেস্টালৎসীর শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষা বলিতে যে কেবল মুখস্থ নয়, বিষয়টির উপলব্ধি, ইহার আগে অনেক শিক্ষাবিদ্ এই তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু কি ভাবে সেই উপলব্ধি আসিবে তাহার পদ্ধতি নির্দেশ করেন নাই। এ বিষয়ে প্রথম প্রয়োগসিদ্ধ পদ্ধতির কথা পেস্টালৎসীর কাছেই শোনা গেল।

দর্শন অপেক্ষা পেস্টালৎসী শিক্ষা-পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়াছেন। শিক্ষাদর্শের দিক দিয়া তাঁহাকে রুশোর শিষ্য বলা চলে। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করিতেন প্রতিটি শিশুকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষার কথা চিন্তা করিতে হইবে। শিক্ষার ভিত্তি হইল মানসিক ক্রমবিকাশের নীতি। শিক্ষকের দায়িত্ব শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে চালনা করা ও তাহাকে সমাজের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

পেস্টালৎসীর মতে শিশুসংক্রান্ত ব্যাপারে আসল সূত্র হইল 'আনসাঙ' (Anschaung)। ইহাকে সহজ বোধশক্তি (intution) বলা চলে বা ঘটনা-সম্বন্ধীয় শিশুর নিজস্ব অভিজ্ঞতা। যে শিক্ষায় পর্যবেক্ষণ বা কর্মের মাধ্যমে কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে শিশুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে, তাহাকে আনসাঙ্ শিক্ষা বলে।

অর্থাৎ, হয় শিক্ষাকে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই ধারণাগুলিকে মূর্ত করার প্রণালী বলিতে হইবে, নয়তো ধারণার সাহায্যে ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলিকে গুরুত্ব দিবার প্রণালী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পেস্টালৎসীর শিক্ষার সমস্ত পরিকল্পনাই এই দুই অনুপূরক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর স্থাপিত।

পেস্টালৎসী তাঁহার শিক্ষা-প্রণালী হইতে অনুকরণ এবং মুখস্থকে সম্পূর্ণরূপে বাতিল করিয়াছেন। শিক্ষা হইবে বাস্তব অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার

মাধ্যমে আসিবে। শিশু নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী প্রথমে বিষয়টি অনুভব করিতে শিখিবে, চিন্তা করিবে তাহার পর সক্রিয়ভাবে শিক্ষায় অংশগ্রহণ করিবে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন ছিল তাঁহার শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য।

শিশুকেন্দ্রিক-পদ্ধতি বলিয়া তাঁহার শিক্ষা-পদ্ধতিতে বহির্জাত শৃঙ্খলার স্থান ছিল না। শাস্তি ও পুরস্কারের স্থান ছিল না। এমন পরিবেশ রচনা করিতে হইবে যাহাতে শিশু আগ্রহের সঙ্গে সচেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

পেস্টালৎসীর মতে জ্ঞানের শিক্ষা আসিবে দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে যাহার ফলে সুনির্দিষ্ট ধারণাগুলি কাজের মধ্যে উপযুক্তভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। দৈহিক ক্ষমতার অতিসরল প্রকাশের মধ্যেই মানুষের অতি জটিল বাস্তব ক্ষমতাগুলির মূলসূত্র থাকে। আসলে, এইসব কাজে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দিতে হইলে শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষা দিতে হইবে।

পেস্টালৎসীর শিক্ষানীতির মূল কথা

(১) শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল আদর্শ সামাজিক সৃষ্টি। সমাজের প্রতিটি মানুষ শিক্ষার অধিকারী।

(২) শিক্ষার লক্ষ্য, শিশুর দৈহিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক—এক কথায় তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করা।

(৩) উত্তম গৃহই শিক্ষার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান। গৃহ-পরিবেশের আদর্শে বিদ্যালয় পরিবেশ রচনা করা উচিত।

(৪) পর্যবেক্ষণ ও কর্মপ্রসূত অভিজ্ঞতাই হইবে সর্বপ্রকার শিক্ষার ভিত্তি।

(৫) ভাষা এই সব অভিজ্ঞতার (intution) সঙ্গে যুক্ত।

(৬) শিক্ষা সহজ হইতে ক্রমে শিশুর মানসিক বৃদ্ধির ধারা অনুযায়ী শক্তের দিকে অগ্রসর হইবে। অর্থাৎ মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষার স্তর নির্দিষ্ট হইবে।

(৭) প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষায় যথেষ্ট সময় দিতে হইবে যাহাতে শিশু বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে।

(৮) মানব মনের বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার ও শ্রদ্ধা করিবেন।

(১০) প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুকে কতকগুলি জ্ঞান দেওয়াই শিক্ষা নয়—তাহার সহজাত বৃত্তিগুলির পর্যাপ্ত বিকাশ সাধন করিতে হইবে।

(১১) জ্ঞান ও নৈপুণ্যের সঙ্গে শিক্ষা-শক্তির সংযোগ ঘটাইতে হইবে।

(১২) ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ হইবে।

পেস্টালৎসীর শিক্ষানীতি সমকালে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশে আদৃত হইয়াছিল। জার্মানীতে তাঁহার আদর্শ সবচেয়ে বেশী অনুসৃত হয়। ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী দার্শনিক ফিক্টে (Fichte)। ফিক্টে ছাড়াও কয়েকজন দার্শনিক ও শিক্ষক পেস্টালৎসীর দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে পরবর্তীকালে শিক্ষা সংস্কারক ও দার্শনিক রূপে খ্যাতিমান দুই জন হইলেন ফ্রয়েবল ও হার্বার্ট। পরবর্তী শিক্ষা-চিন্তায়ও পেস্টালৎসীর প্রভাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অদৃষ্ট নয়।

হার্বার্টীয় শিক্ষা-পদ্ধতি (Herbartiun Method of Teaching)

হার্বার্টের শিক্ষানীতি সম্পর্কে জানিতে হইলে সর্বাগ্রে শিশুর মন ও মনের 'ভাবজট' ম্পর্কে জানা প্রয়োজন। মনের প্রধান ধর্ম হইল গ্রহণ ও আয়ত্তীকরণ ssimilation)। এই গ্রহণধর্মী মন নিয়তই পারিপার্শ্বিক হইতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হণ করিতেছে। একটি অভিজ্ঞতা অনুরূপ অভিজ্ঞতা গ্রহণে সমর্থ। এইরূপে নানা অভিজ্ঞতা আসিয়া আমাদের মনে জট পাকাইয়া যায়। ইহাকে তিনি 'ভাবজট' বলিয়াছেন। এইগুলিই াশু-মনের প্রাথমিক সঞ্চয়। মনের ধর্ম হইল পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বয় সাধন রিয়া নূতন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করা। হার্বার্ট ইহাকে 'অন্বয়ীকরণ' বলিয়াছেন। তকগুলি সমধর্মী অভিজ্ঞতা মিলিয়া মনে ভাবজট সৃষ্টি করে এবং এই ভাবজট তন অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে, ব্যাখ্যা করে ও আয়ত্ত করে। ক্রমে নূতন ভিজ্ঞতা পুরাতন ভাবজটের অঙ্গীভূত হয়। এইভাবে অভিজ্ঞতার ধারা-হিকতায় জ্ঞানের উন্মেষ হয়। হার্বার্টের মতে পুরাতন অভিজ্ঞতাই নূতন জ্ঞানের ভত্তি।

বজট

হার্বার্টের শিক্ষানীতির আর একটি বড় কথা হইল তাঁহার আগ্রহ-তত্ত্ব। হার্বার্টের তে শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল নীতিজ্ঞান সৃষ্টি ও চরিত্র গঠন। ছাত্রের মনে সুস্থ ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইবে। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া এই আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। াাগ্রহ সৃষ্টি না হইলে পাঠদান ফলপ্রসূ হইবে না। আগ্রহ হইতে মনোযোগ াাসিবে। আগ্রহ হইল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। পাঠের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়ার ব্বোধন ঘটাইতে হইবে। আগ্রহ এবং বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে একটি সম্বন্ধ বর্তমান। াাগ্রহ হইতে ইচ্ছা আসে। ইচ্ছার সন্তুষ্টির জন্য কিছু কাজ করার প্রয়োজন হয়। াজেই দেখা গেল আগ্রহ, ইচ্ছা ও সক্রিয়তা মিলে একটি বৃত্ত।

াগ্রহ-তত্ত্ব

হার্বার্টের মতে পাঠে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ংস হিসাবে হার্বার্ট আগ্রহকে দুইভাবে ভাগ করিয়াছেন:—বিষয়বস্তু বা জ্ঞানের ঙ্গে যুক্ত আগ্রহ এবং সামাজিক জীবন সম্পর্কিত আগ্রহ।

ছাত্রের নীতিজ্ঞান ও চরিত্রের বিকাশের পদ্ধতি সম্পর্কে হার্বার্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। শিশুর মনের আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া বিষয়বস্তু গ্রহণের উপযুক্ত করিতে হইবে, তাহার ধারণা ও ইচ্ছাকে নীতির অভিমুখী করিতে হইবে। শিশুকে নূতন কিছু শেখাইতে হইলে তাহার মনের পূর্বসঞ্চিত ভাবজটের সন্ধান লইতে হইবে। এইজন্য াঠনক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যেমন—

(১) স্বচ্ছতা (clearness) পাঠ্য-বিষয়গুলিকে এমন ভাবে ভাগ করিতে হইবে াহাতে প্রত্যেকটির উপর অন্যনিরপেক্ষ মনোনিবেশ করা যায়।

(২) সংযোগ (association), কোন নূতন পাঠ্য-বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য আগের জানা অন্য বিষয়গুলিকে নূতনটির সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কিত হইতে হইবে। হার্বার্টের মতে স্বাধীনভাবে ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাহা জানা যায়।

মন এই সময় কেবল একটি বিষয়কে কেন্দ্র না করিয়া সেই বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত বা সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে ভাবিতে আরম্ভ করে।

(৩) ধারাবাহিকতা বা শৃঙ্খলা (system)-সংগৃহীত অভিজ্ঞতাগুলি পরস্পর যুক্তিনিষ্ঠভাবে শ্রেণীবদ্ধ হয়।

(৪) পদ্ধতি (application) নবলব্ধ জ্ঞান শিশু প্রয়োগ করিবে। এই নীতির উপর তাঁহার বিখ্যাত পঞ্চসোপান পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। পঞ্চসোপান বা শিক্ষাদানের পাঁচটি স্তর হইল : প্রস্তুতি (preparation), উপস্থাপন (presentation), তুলনাকরণ ও সংযোগ (comparison and association), সামান্যকরণ (generalisation) এবং অভিযোজন (application)।

হার্বাটের পঞ্চসোপান-পদ্ধতি এককালে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ্ এই পদ্ধতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্য হইল :—

(১) শিক্ষা একটি সাবলীল নিরবচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া, ইহাকে নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা উচিত নয়।

(২) শ্রেণী-পাঠনার নির্দিষ্ট সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে সোপান অনুযায়ী পৃথক্ ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না।

ফ্রয়েবল স্বয়ংক্রিয়-পদ্ধতি (Froebel's Method of Self-Activity)

আধুনিক শিক্ষা আন্দোলনে ফ্রয়েবলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিশুর মানসমুক্তির ক্ষেত্রে তাঁহাকে রুশো ও পেস্টালৎসীর উত্তর সাধক বলা চলে। কমেনিয়াসের পর হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর প্রাধান্য বিস্তার শুরু হয়। রুশো শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়াছেন আর পেস্টালৎসী দিয়াছেন মনস্তত্ত্বের উপর। ফ্রয়েবল শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। শিশুতরুকে যেমন সহৃদয় পরিচর্যায় পুষ্পপল্লবভারাবনত মহীরুহে পরিণত করা যায় তেমনই ছোট শিশুকে সুপরিচালনায় বিকশিত ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। যে কিণ্ডারগার্টেন বা নার্শারী স্কুলের নাম সকলের সুপরিচিত তাহার আবিষ্কর্তা হইলেন ফ্রেডারিক উইলহেলম অগস্ট ফ্রয়েবল।

মানব-জীবনের বিকাশের একটি ক্রম আছে। ফ্রয়েবল শিক্ষাকে সেই ক্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। শিক্ষা একটি ক্রিয়া যা শিশুর মানসিক শক্তি-নিচয়ের উপর নির্ভরশীল। অভ্যাসের ফলে শক্তি বৃদ্ধি ঘটে ও ক্রমে স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উন্মেষ হয়। ফ্রয়েবল সেই স্বাভাবিক বৃত্তির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতির কথা অজানা নয়। ফ্রয়েবল বিশেষ ভাবে ইহার উপর গুরুত্ব দিয়াছেন। শিশু-প্রকৃতির উপযোগী এবং বিশেষ করিয়া প্রত্যেকটি শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষা দিতে হইবে।

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতি

ডারউইনের পূর্ববর্তী হইলেও লামার্কের চিন্তাধারার সঙ্গে ফ্রয়েবলের পরিচয় ছিল এবং তিনি ক্রমবিকাশবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মতে শিশুর মানসিক-ক্রম

নুযায়ী, বিকাশের ধারা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জ্ঞান নয়, শিশু ক্রমবিকাশের পথে স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিবে।

শিশু নিজে স্রষ্টা, সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর। শিশুর এই সৃষ্টির শক্তিকে শিক্ষার কাজে ব্যবহার করিতে হইবে। শিশু স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাকার্যে অগ্রসর হইবে। শিক্ষকের কাজ হইবে তাহাকে সাহায্য করা। ফ্রয়েবলের মতে শিশুর প্রথম স্বেচ্ছামূলক কাজ হইল—(১) পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ, (২) ক্রীড়া—যাহা অন্তরের সঙ্গে বাহিরের মিলন ঘটায়। এই একক সৃষ্টিমূলক কাজ শিশুর অব্যবহিত অভিজ্ঞতাকে অন্য বস্তুর প্রতীকে প্রতীয়মান করে।

স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষা

কৈশোরে বা যৌবনে আবার শিক্ষার রূপের পরিবর্তন ঘটে। ভাবপ্রবণতার স্থলে আসে চিন্তা—খেলার বদলে শিক্ষা। এখন জীবনের সত্যকে উপলব্ধি করিয়া বাহিরকে অন্তঃস্থ করিতে হইবে। সেজন্য পাঠ্য-বিষয়ের সুষ্ঠু নির্বাচন আবশ্যক। প্রথম ধর্ম শিক্ষা, দ্বিতীয় প্রাকৃতিক জ্ঞান, তৃতীয় ভাষা শিক্ষা। ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সমন্বয় সাধিত । এই তিনটি ভাগের সঙ্গে কলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্ক ইত্যাদিকে পাঠ্য-তালিকা-ভুক্ত করিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকে সামগ্রিক ঐক্য, ব্যক্তিগত বিশেষত্ব ও বিভিন্নতাকে ন দিতে হইবে।

বিষয়বস্তুর ঐক্য

ফ্রয়েবলের শিক্ষানীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষায় প্রতীকের ব্যবহার। এই বিশ্বের কোন জিনিসই নিরর্থক নয়—প্রত্যেকটির ভিতরে দৃঢ় তাৎপর্য আছে। শিশুর প্রতিটি কাজ, গান, খেলা শিক্ষার বিবিধ উপকরণের ভিতর দিয়া সেই মৌলিক উপাদানের প্রতি চেতনাকে লিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীকের হার

তাঁহার পরিকল্পনার মূল অঙ্গ কাজ, যাহা শিশুর কাছে খেলার রূপ ধরিয়াছে। শিশু তাহার বৃদ্ধির সহায়ক যে কোন ভাবেই নিজেকে বিকাশ করিতে পারে। কিন্তু ধারাবাহিকতা রাখার জন্য প্রত্যেকটি কাজ ও খেলার দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই খেলা ও কাজগুলিই ন কিণ্ডারগার্টেনের মূল বস্তু। ইহাদের সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয় :—

খেলার মাধ্যমে শিক্ষা

(১) গিফ্‌ট ও কাজ—যাহা শিশুকে পার্থিব বস্তুনিচয়ের সঙ্গে পরিচিত করে। উদ্যান রচনা, পশুপক্ষীর পরিচর্যা ইত্যাদি। (৩) বিভিন্ন খেলা ও গান।

ফ্রয়েবল শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী জগতের মৌলিক প্রকাশের প্রতীক হাবে ছয়টি গিফ্‌ট বা উপহার ও বহু সংখ্যক কাজকে শিক্ষার উপাদান রূপে প্রয়োগের সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম গিফ্‌ট হইল একটি উলের বল। সব খেলার সামগ্রীর মধ্যে বলকেই তিনি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান মনে করেন। গোল 'বল'গুলি শিশুর স্বভাবের ল বস্তু ও ঐক্যের প্রতীক। ইহা ছাড়াও শরীর ও মনের বৃদ্ধির সহায়ক হিসাবে

গিফ্‌টস (Gifts)

বল খেলার প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন। দ্বিতীয় উপহার হইল একটি কাঠে
গোলক, চৌকোন বস্তু ও একটি সিলিণ্ডার। তৃতীয় একটি কাঠের কিউব, আট
ছোট ছোট কিউবে বিভক্ত। এইগুলি দিয়া বিভিন্ন কাজ ও খেলা চলে। ইহা
পর আসে চৌকোন ও ত্রিভুজযুক্ত প্রশস্ত ফলক, লাঠি ও আংটা।

একদিকে যেমন উপহার, অন্যদিকে হাতের কাজ। উপহারের মাধ্যমে জ্ঞানে
উন্মেষ ও সমন্বয়—হাতের কাজের মাধ্যমে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগ। উপহা
ও কাজ পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। সহজ কাজের মাধ্যমে
শিক্ষা পাইবে। সাধারণ সহজলভ্য উপাদান লইয়
খেলার পরিবেশ রচনা করিতে হইবে। যেমন—বালি, কাঠের গুঁড়া, কাঠ, কাদ
মাদুর কাঠি, পাতা, কাগজ ইত্যাদি। বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া শিশুদের বিভি
কাজে দক্ষতা বাড়ে, কল্পনা-শক্তির বিকাশ হয়, আত্মশক্তির উপর আস্থা জন্মায় এ
আচরণগত ও বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়ক হয়।

হাতের কাজ

শিক্ষাকে শিশু-মনোবৃত্তানুসারী করিবার আর একটি উপায় হইল শিক্ষাকে
তাহার স্বভাবানুসারী করা। শিশু সাধারণতঃ খেলিতে ভালবাসে। স্বতঃস্ফূর্ত গা
কাজ ও খেলা ভালবাসে। ফ্রয়েবল্ শিশুর স্বতঃস্ফূর্ত গা
খেলাকে শিক্ষার কাজে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিলেন
খেলার জন্য তিনি কতকগুলি গান রচনা করিয়াছেন। ছবি ও গান, খেলার স
গান। তাঁহার ছড়া ও গানের সংখ্যা মোট সাতান্ন। পঞ্চাশটি খেলার ও সাত
মায়ের গান। খেলার গানগুলি বিভিন্ন বিষয় লইয়া রচিত।

খেলা ও গান

ফ্রয়েবল শিশুর বিকাশের পক্ষে তাহার কল্পনার বিস্তৃতির উপর জোর দিয়াছেন
একদিকে যেমন খেলা, গান ও কাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন তেমনই চিত্রাঙ্কনকে
শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থান দিয়াছেন। নৃত্য ও চিত্রাঙ্কন শি
সৃজনমূলক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাইবে ও সুন্দরের উদ্বো
হইবে। তাহার পর গল্প বলা। এইভাবে শিশুর কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে, আনন্দে
সঙ্গে ক্রমে ক্রমে বিমূর্ত চিন্তার শক্তি অর্জন করে।

কল্পনাশক্তির বিকাশ

রুশোর মত ফ্রয়েবলও বিশ্বাস করিতেন শিশু আসলে সৎ, পরিবেশ তাহা
অসৎ করে। কাজেই উপযুক্ত পরিবেশ রচনা কর
শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধির সুযোগ দিতে হইবে
বাহির হইতে কোন নিয়মকানুন আরোপ করিবার প্রয়োজন নাই। শিশুর অন্তর্জা
শৃঙ্খলার উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে।

শৃঙ্খলা

ফ্রয়েবল শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রকে কিণ্ডারগার্টেন নামে অভিহিত করিয়াছে
কিণ্ডারগার্টেনে তিন হইতে সাত বছরের শিশুদের নে
হয়। এখানে তাঁহার উদ্ভাবিত গিফ্‌ট্‌স্, কাজ, ছড়া, গ
ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহাকে অনে
নার্সারী স্কুল বলেন। অর্থাৎ বিদ্যালয় হইল উদ্যান, এখানে শিশু-তরুর মত মানব
স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠিবে মালীর মত শিক্ষকদের সযত্ন পরিচর্যায়।

কিণ্ডারগার্টেন বা শিশু-উদ্যান

শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রয়েবেলের প্রভাব

পরবর্তী শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষা-পদ্ধতিতে ফ্রয়েবেলের প্রভাব অপরিসীম। সাম্প্রতিক কালের শিক্ষাধারা অধিকাংশে তাঁহার কাছে ঋণী। তাঁহার প্রবর্তিত নার্শারী স্কুল পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা যাহা বর্তমান কালের শিক্ষাদর্শ, ফ্রয়েবেল তাহারও প্রথম সূত্রকার। তাঁহার খেলার মাধ্যমে শিক্ষানীতি বা Play way in education অধুনাতন কালে বিশেষ পরিচিত। শিশুর স্তর অনুযায়ী শিক্ষাও বর্তমানকালের অনুসৃত নীতি।

সমালোচনা: ফ্রয়েবেলকেও বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহার দার্শনিক মতবাদের জন্যই তাঁহার মাতৃভূমি জার্মানীতেই কিণ্ডারগার্টেন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতীক ব্যবহারের বিরুদ্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। অনেকে ইহাকে ম্যাজিক বলিয়াছেন। তিনি খেলা, গান ও কাজের উপর জোর দিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে লেখাপড়ার গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে।

বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য

বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষাজগতে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব ঘটায় শিক্ষার ও শিক্ষণ পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ ও থর্নডাইকের আবিষ্কারের ফলে শিক্ষা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। বর্তমান যুগে জীবনের ও জীবিকার জন্য প্রস্তুতিকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক অনুন্নত দেশগুলি কারিগরী ও অর্থকরী শিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দিল।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য শিক্ষা শোভা না হইয়া জীবনের জন্য বা জীবন-কেন্দ্রিক হওয়ার উপর জোর দিয়াছে।

বর্তমান যুগে শিক্ষার যে সব পরিবর্তন হইয়াছে তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র কেবল রাজনৈতিক ধারণা মাত্র ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষের জীবনের সকল দিকে, বিশেষতঃ শিক্ষায় এই ধারণার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের শিক্ষাক্ষেত্রের বিশিষ্ট প্রতিনিধি হইলেন আমেরিকার জন ডিউই। নিত্য নব নব পরীক্ষার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠার নীতি দর্শনে ও শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি বাস্তবতঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জীবনধর্মী শিক্ষাদার্শনিকের মতবাদ কেবল মাত্র আমেরিকায় নয়, আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র গৃহীত হইয়াছে।

ডিউইর শিক্ষাপদ্ধতি

ডিউইর দার্শনিক মতবাদকে বলা হইয়া থাকে ফলবাদী বা প্রাগমাটিক মতবাদ। শিশু সমাজের জীব। এখানে কাজ করিতে গিয়া অন্যান্য শিশুর সংস্পর্শে আসিয়া সে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়, অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। সেই অভিজ্ঞতাগুলি তাহার কাছে সত্য। পূর্ণ মানবের অনেক গুণ যেমন—দয়া, মায়া, ক্ষমা, মমতা ইত্যাদি। কিন্তু আচার আচরণ ও বাস্তব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার

মাধ্যমে এইগুলির উদ্রেক ও উপলব্ধি না হইলে এই সব গুণের কোন মূল্যই শিশু-মনে থাকে না। সমাজে ব্যবহারের মাধ্যমে, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে নিজ জীবনে এই সব গুণের উপলব্ধি ঘটিবে এবং ফলে এই সব গুণগত আদর্শকে যথার্থ মূল্য দিতে শিখিবে।

প্রাচীন রীতির বিপরীত হইলেও ডিউর শিক্ষা-চিন্তা সমাজ-বিবিক্ত নয়, সমাজের প্রয়োজন ও কল্যাণের দিকেই তাঁহার শিক্ষাদর্শ অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছে। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক নিবিড়। একক ব্যক্তি অর্থহীন, গোষ্ঠী জীবনের মধ্যেই তাহার বিকাশ সম্ভব। তাই তাঁহার শিক্ষাদর্শ ব্যক্তিগত উদ্যম ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক হইলেও তাহা সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও নীতি নির্ধারণের সময় কয়েকটি প্রশ্নের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। (১) গৃহ ও তাহার পারিপার্শ্বিক জীবনের সঙ্গে স্কুলের নিবিড় সম্পর্ক করিবার জন্য কি কর্তব্য, (২) শিশুর জীবনের সত্যকার মূল্যবান ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা শিক্ষার বিষয়গুলির সঙ্গে কিভাবে শিশুর পরিচয় করান যায়, (৩) লিখন, পঠন ও গণিতের মত বিষয়গুলি কি ভাবে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা ও কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিয়া ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির উদাহরণ দিয়া শিশুর চিত্তাকর্ষক করা যায়, (৪) ব্যক্তিগত প্রতিভা ও প্রয়োজনের প্রতি কি করিয়া উপযুক্ত মনোযোগ দেওয়া যায়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে শিক্ষার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিবার ফলে, কাজে কাজেই পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত হইতে হইবে। শিক্ষা ব্যক্তির আগ্রহ ও প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইবে। আগ্রহ উপস্থিত হইলে শিশু স্বভাবতঃই নূতন নূতন জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইবে; প্রয়োগ ও পরীক্ষার মাধ্যমে জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিবে। এই নীতির ফলে প্রজেক্ট মেথডের জন্ম।

পদ্ধতি সম্পর্কে ডিউইর বক্তব্য, অনুবন্ধ-প্রণালী ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। পাঠ্য-বিষয়গুলিকেও পরস্পর সম্পর্কিত করিয়া পাঠ দিতে হইবে।

ডিউইর মতে শিক্ষা হইবে উদ্দেশ্যমূলক। বর্তমান জীবনের প্রয়োজনেই শিক্ষা। "Education therefore is a process of living, not a preparation for future living."

শিক্ষার জন্য শিশুর চাই একটি সুন্দর, শান্ত গৃহ-পরিবেশ। গৃহের স্নেহ ও নিরপত্তা যেন তাহাতে থাকে আর সমাজের অশিষ্ট নীতিহীনতা হইতে মুক্ত হয়। সেজন্য গৃহ এবং সমাজের অনুরূপ অথচ একটি কৃত্রিম পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে যেখানে সুস্থ সমাজ-জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিবে। এইরূপ সুস্থ স্বাভাবিক বিদ্যালয় পরিবেশে দৈনন্দিন অভ্যাস আচরণের মধ্য দিয়া শিশুর মনে স্বাভাবিক নীতিবোধ গড়িয়া উঠিবে।

ডিউইর শিক্ষা-চিন্তার আর একটি বৈপ্লবিক সংযোজন হইল তাঁহার গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। বৃহত্তর গণতান্ত্রিক সমাজের সুনাগরিক হওয়ার জন্য ছাত্ররা বিদ্যালয়েও গণতন্ত্রের অভ্যাস করিবে। ছাত্র ও শিক্ষক লইয়া যে বিদ্যালয়-সমাজ তাহার

প্রাত্যহিক কাজকর্ম পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছাত্র-শিক্ষকের যুক্ত চিন্তার অবকাশ থাকিবে।

তাঁহার মতে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি বিদ্যালয়-সমাজের একজন সক্রিয় সদস্য। বিদ্যালয়-সমাজ হইতেই শক্তি আহরণ করিয়া বিদ্যালয়ের কাজে লাগাইবেন। শিশুদের রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা নির্ধারণ করিয়া উপযুক্ত পরিবেশ রচনার দ্বারা ছাত্রদের কাজে আগ্রহী করিয়া তুলিবেন, সহৃদয় মন লইয়া তাহাদের কাজে সক্রিয় ভাবে যোগ দিবেন ও সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবেন।

ডিউই শিক্ষাকর্মে শিশুকে মুখ্য স্থান দিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশুর বাস্তব-জীবনে সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়া শিক্ষা শুরু হইবে। নিম্নলিখিত স্তর অনুযায়ী তাঁহার মতে শিক্ষাক্রিয়া সম্পাদিত হইবে।

(১) **সক্রিয়তা** (Activity), শিশু কাজ করিতে গিয়া সমস্যার সম্মুখীন হইবে।

(২) **সমস্যা** (Problem)—শিশু সমস্যার প্রকৃতি অনুসন্ধান করিবে।

(৩) তথ্য (Data)—সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়া উহার সমাধানের পথ অনুসন্ধান ও তাহার উপযোগী তথ্য সংগ্রহ করিবে।

(৪) প্রকল্প (Hypothesis)—প্রাপ্ত তথ্য হইতে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে।

(৫) সত্যতা নিরূপণ (Verification)—শেষে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা হইতে একটি সত্যে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে এবং সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়া তাহার সত্যতা যাচাই করিবে।

জন ডিউইর শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রজেক্ট-পদ্ধতি (Project Method) এবং প্রবলেম মেথড (Problem Me·hod) প্রধান।

প্রজেক্ট পদ্ধতি (Project Method): প্রজেক্ট-পদ্ধতিকে অনেকে কার্য-সমস্যা হিসাবে নামকরণ করিয়াছেন। কোনও বিষয়বস্তু যখন শিশুদের কাছে সমস্যার রূপ লইয়া আসে, তখন শিশুরা সেই কাজ করিতে প্রেরণা বোধ করিয়া থাকে। এই মনস্তত্ত্বের উপর প্রজেক্ট-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। স্টিভেনসন প্রজেক্ট-পদ্ধতির সংজ্ঞা দিবার সময় বলিয়াছেন, "A project is a problematic act carried to completion to its natural setting". প্রজেক্ট-পদ্ধতির সার্থক রূপকার কিলপ্যাট্রিকের মতে, "A project is a wh·le hearted purposeful activity, proceeding in a social environment". এই পদ্ধতি অনুসারে শিশুদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা বলা হইয়া থাকে। প্রণালীতে কোন বাস্তব সমস্যা ছাত্রদের সম্মুখে ধরা হয়। ছাত্ররা সেইটির সমাধানের জন্য কৌতূহলী হয়। সমস্যাটি লইয়া আলোচনার পর সেটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হইয়া থাকে। যেমন—

(ক) সমস্যার উত্থাপন।

(খ) সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা।

(গ) সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সাফল্য।

(ঘ) সমস্যা সমাধানের পর সাধারণ সূত্র গঠন।

(ঙ) সূত্র পরীক্ষা।

(ক) সমস্যার উত্থাপন—প্রথমে বিষয়টি সমস্যার আকারে ছাত্রদের কাছে রাখা হইবে। কাজটির সঙ্গে যেন বাস্তব-জীবন সমস্যার মিল থাকে। ছাত্ররা যখন ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবে তখন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে এইটি সমাধান করিতে চাহিবে।

(খ) সমস্যার সমাধানের জন্য চিন্তন ও বিশ্লেষণ—সমস্যাটি শ্রেণীতে গৃহীত হইলে সমস্যাটি লইয়া বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইবে। মূল সমস্যাটিকে কয়েকটি ছোট ছোট সমস্যায় ভাঙিতে হইবে। এক একটি অংশ এক একটি ইউনিট। এই ইউনিটগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ছাত্ররা অবহিত হইবে। ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে দলভাগ করিবে। এক একটি ইউনিটে কাজ করিবে।

(গ) সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সাফল্য—প্রত্যেক দল নিজেদের কাজের পরিকল্পনা করিবে। নিজেরা আলোচনা করিয়া তাহাদের ইউনিটের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে। শ্রমমূলক প্রজেক্ট বাস্তব কাজ করিবে। নিজের নিজের দলের পরিকল্পনামত কাজ শেষ করিবে। প্রত্যেক দলের কাজ শেষ হইলে বাস্তবতঃ সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। প্রতিটি দল নিজেদের কাজের খুঁটিনাটি হিসাব রাখিবে ও কাজ শেষ হইবার পর দলীয় রিপোর্ট তৈরী করিবে।

(ঘ) সাধারণ সূত্রগঠন—প্রতিটি দল শ্রেণীকক্ষে সমবেত হইয়া দলীয় রিপোর্ট শুনিবে। ফলে সামগ্রিক ভাবে কাজের সামগ্রিক তথ্য ও জ্ঞান সকলের অধিগত হইবে।

(ঙ) সূত্র পরীক্ষা বা মূল্যায়ন—প্রজেক্ট শিক্ষার মাধ্যম। কাজেই প্রজেক্টের শেষে দেখিতে হইবে ছাত্ররা ইহার দ্বারা কতদূর উপকৃত হইয়াছে। সেজন্য কাজের শেষে পরীক্ষা।

প্রজেক্ট দুই রকমের হইতে পারে—বুদ্ধিমূলক ও শ্রমমূলক।

শিশু সাধারণতঃ কর্মপ্রিয়, তাই কাজের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক শিক্ষাকে তাহারা সহজভাবে গ্রহণ করে। সক্রিয় ভাবে শিখে বলিয়া শিক্ষা সহজ ও স্থায়ী হয়। বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া শিশুদের আগ্রহ পূর্বাপর বজায় থাকে। এই পদ্ধতিকে স্বয়ং শিক্ষা বলা যাইতে পারে। অনুবন্ধ প্রণালীতে একটি কাজের ভিতর দিয়া সহজে অনেকগুলি বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। এই সম্বন্ধে শিক্ষার ফলে শিক্ষা যেমন সহজ হয় তেমনই বাস্তব হয়। শিক্ষার অর্থ ছাত্রদের কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

ইউনিট প্লান (Unit plan) **:** প্রজেক্ট মেথড জনপ্রিয় হইলেও কোন কোন শিক্ষাবিদ্ ইহার বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে যোগ্য শিক্ষক

ছাড়া এই পদ্ধতি কার্যকর হইতে পারে না। সেইজন্য নূতন পদ্ধতি ইউনিট প্লান পরিকল্পিত হইয়াছে।

ইউনিটপ্লান নিছক একটি শিক্ষাপদ্ধতি। ইহা প্রজেক্ট মেথড ও হার্বার্টের পঞ্চসোপান-পদ্ধতির মাঝামাঝি। অর্থাৎ শিশুকেন্দ্রিক ও শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষার সমন্বয়ে ইহা সৃষ্টি হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এই পদ্ধতির উদ্ভাবক হইলেন হেনরি মরিসন (Henry Morrison)। মরিসনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া নূতন জ্ঞান দিতে হইবে। নূতন জ্ঞান ভালভাবে আয়ত্ত না করা পর্যন্ত নূতন পাঠ দেওয়া হইবে না।

এইজন্য পাঠদানের পাঁচটি সোপান নির্দেশ করা হইয়াছে। (১) ভূমিকা—এই সোপানে ছাত্রের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে মৌখিকভাবে নূতন পাঠের সূচনা করিবেন। (২) উপস্থাপন—এই অংশে পাঠ্য-বিষয়টি ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করিবেন। (৩) উপলব্ধি—যাহাতে শিশুরা বিষয়টি উপলব্ধি করে শিক্ষক সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। (৪) সংগঠন—উপস্থাপন ও উপলব্ধির আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাইবে। (৫) পুনরাবৃত্তি—এই সোপানে ছাত্রদের প্রাপ্তজ্ঞানের পরীক্ষা হইবে।

সমাজান্বিত আবৃত্তি-পদ্ধতি (Socialised Recitation Techniques): গতানুগতিক শিক্ষাধারায় ছিল শিক্ষকের প্রাধান্য। প্রজেক্ট-পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতার কথা বলা হইয়াছিল। আধুনিক শিক্ষাধারায় গণতান্ত্রিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ইহার ফলে শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। শিশুর আগ্রহ, অভিব্যক্তি, কর্মপ্রচেষ্টা শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করে, সার্থক করে একথা স্বীকার করা হয়েছে। এমন কি আবৃত্তির সময় যাহাতে শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ততা ব্যাহত না হয় শিক্ষক সেদিকে দৃষ্টি দেন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে আলোচনার দ্বারা সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাইল। শিক্ষক হইলেন শিশুর সুহৃদয় অভিভাবক ও বন্ধু।

সহজান্বিত আবৃত্তি-পদ্ধতি বিভিন্ন রূপে হইতে পারে। যেমন—সেমিনার (Seminar), প্যানেল আলোচনা (Panel discussion), বিতর্ক (Debate), সিম্পোসিয়াম (Simposium), কর্মশালা-পদ্ধতি (Workshop Method) ইত্যাদি। সবরকম সহজান্বিত আবৃত্তি পদ্ধতিগুলির মধ্যে আলোচনাচক্র বা সেমিনার অপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা ইত্যাদি আলোচনাচক্রে ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে যোগ দিল। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে জানার আগ্রহ যেমন বাড়িতে লাগিল, জ্ঞানের পরিধিও তেমনি বিস্তৃততর হইল।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি (Individualised Instruction): বিংশ শতাব্দীর প্রথমে অনেক শিক্ষাবিদের মনে শ্রেণীপাঠনের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক শক্তি ও আগ্রহ একরকমের নয়—কাজেই একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে সকলেই সমান ভাবে পাঠগ্রহণ করিতে পারে না এবং উপকৃত হয় না। অল্পবুদ্ধি বালক-বালিকাদের পক্ষে একথা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। এইসব

পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বৈষম্য অনুযায়ী পাঠনের কোনরূপ ব্যবস্থা ছিল না। সর্বপ্রথম ডঃ মন্তেসরী এ দিকে দৃষ্টি দিলেন। তিনি ছোট শিশুদের ব্যক্তিগত শিক্ষার পদ্ধতি ঠিক করিলেন। বাল্য-উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য হেলেন পার্কহার্স্ট (Helen Parkhurst) আমেরিকার ডাল্টন শহরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করিলেন। শ্রীমতী পার্কহার্স্ট-উদ্ভাবিত পদ্ধতির নাম ডাল্টন প্ল্যান (Dalton Plan)।

এই পরিকল্পনায় শিক্ষক পাঠ্য-বিষয়টি সারাবৎসরে কতটুকু পড়িতে হইবে বা কাজ করিতে হইবে ছাত্রকে বুঝাইয়া দেন। প্রতি বিষয়ের সমগ্র পাঠ বা কাজ কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ছাত্রকে প্রতিটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ বা কাজ এক মাসে করিয়া দিবার চুক্তি হয়। ছাত্রদের নিজেদের চেষ্টায় কাজ বা পাঠ সম্পন্ন করিতে হয়। তাহারা তাহাদের প্রয়োজন মত শিক্ষকের সাহায্য নেয়, পাঠাগার বা ল্যাবরেটরির ব্যবহার করে, পারস্পরিক আলোচনা করে। মাসান্তে শিক্ষক কাজ বা পাঠটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিয়া নেন। ছাত্র সফল হইলে পরের মাসে কাজ (assignment) পায়, নতুবা পুরাতন কাজটি আবার করিতে হয়। এই পদ্ধতিতে ছাত্ররা নিজেদের শক্তি, সামর্থ্য ও প্রচেষ্টা দ্বারা স্বাধীন ভাবে শিক্ষা করে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতির আর একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হইল উইনেটকা প্ল্যান (Winnetka Plan)। এই পদ্ধতিটির উদ্ভাবক হইলেন কার্ল ওয়াসবার্ন (Carl Washburne)। তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে উইনেটকা শহরের এক বিদ্যালয়ে তাঁহার পদ্ধতির প্রয়োগ সাফল্য পরীক্ষা করেন। ডাল্টন প্ল্যানের মত এই পদ্ধতিও ব্যক্তিগত বৈষম্য-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য হইল অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সব ছাত্র সমানভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্য শ্রেণী-পাঠনে সবাই সমান ভাবে উপকৃত হয় না। এ পদ্ধতিতে প্রতিটি বিষয়ের এক একটি নির্দিষ্ট অংশ ছাত্রকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পড়িতে দেওয়া হইত। ছাত্র স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভ করিত। শিক্ষার্থীরা যাহাতে নিজেদের পাঠে অগ্রসর হইতে পারে, এ-ধরণের স্বয়ং শোধনক্ষম নির্দেশ ও সূত্র ছাত্রদের দেওয়া হইত। ছাত্ররা নিজেরাই নিজেদের অগ্রগতির পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলে শিক্ষকের কাছে পরীক্ষা দিতে যায়। একটি পাঠ শেষ হলে তবে পরের পাঠটি দেওয়া হয়।

এই পদ্ধতিতে যৌথ কাজেরও ব্যবস্থা আছে। যেমন—খেলাধূলা, নাচগান, আলোচনা, ছাত্রসমিতি গঠন ইত্যাদি।

পরিচালনাভিত্তিক নিয়ন্ত্রিত-শিক্ষা (Supervised study)**:** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর স্বাতন্ত্র্য, স্বয়ং পাঠ ইত্যাদি স্বীকার করা হইয়াছে। শিক্ষার্থী যাহাতে স্বচেষ্টায় পরিপূর্ণ শিক্ষা লইতে পারে, বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। শ্রেণী-কক্ষের সাধারণ শিক্ষায় সকলের সমান উন্নতি হয় না। প্রয়োজন হয় গৃহ পাঠের। বাড়িতে ভালভাবে পড়াশুনা না করিলে কেবল শ্রেণীকক্ষের পাঠে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বর্তমান সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থায় অধিকাংশ ছাত্রের গৃহ পরিবেশ পাঠের উপযুক্ত নয়। হয় বাড়ি

এবং পৃথক্ পাঠ-কক্ষের অভাব, বইয়ের অভাব, অভাব সাহায্যকারী শিক্ষকের। সেই জন্য সাম্প্রতিক কালে এই সমস্যা সমাধানে নূতন চিন্তা আসিয়াছে। শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে এই অতিরিক্ত স্বয়ং পাঠের সুযোগ করিয়া দিবার কথা অনেক শিক্ষাবিদ্ বলিতেছেন। শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণী-কক্ষে বা পাঠাগারে স্বয়ংপাঠ করিতে পারে। প্রয়োজনবোধে শিক্ষকের সাহায্য লইবে। এইজন্য বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরও কিছুক্ষণ বিদ্যালয় খোলা রাখা চলে। ইহাতে সামগ্রিক ভাবে সমস্যার সমাধান হইবে না সত্য, কিন্তু অনেকাংশে হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Write notes on :—

Monitorial Method, Herbartian Method, Project Method, Individualised Education, Froebel's Selectivity, Unit Plan, Supervised Study.

2. Discuss the contribution Christian monks in the development of Educational Methods.

3. Discuss in brief the evolution of Teaching Method from the ancient time to the modern period.

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা-পদ্ধতি

শিক্ষাদান-পদ্ধতির অর্থ

শিক্ষাদান বা পাঠদান কার্যে সফলতা লাভের জন্য যে পূর্ব নির্দিষ্ট কার্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকে শিক্ষা-পদ্ধতি বলে। শিক্ষা বা পাঠের লক্ষ্য কাজে পরিণত করিতে পারিলেই শিক্ষক শিক্ষাদান কার্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন ধরিতে হইবে। কাজেই শিক্ষা-পদ্ধতির অর্থ হইল পাঠের লক্ষ্য সাধনের জন্য যে সুচিন্তিত উপায় বা কার্য-পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হয়, তাহাকে শিক্ষা-পদ্ধতি বলে। শিক্ষাদান বা পাঠদানের সম্যক্ কার্যপ্রণালীই শিক্ষার বা পাঠের লক্ষ্য সাধনের উপায়। যেমন— কি ভাবে পাঠদান-কার্য আরম্ভ করিবে, কি আকারে ও পর্যায়ে পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের সম্মুখে উপস্থাপন করিবে, পাঠে ছাত্রের মনোযোগ লাভের জন্য এবং পাঠ চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য কি কি শিক্ষাকৌশল অবলম্বন করিতে হইবে বা কি কি শিক্ষা-সরঞ্জাম ব্যবহার করিবে, পাঠদান কার্যে শিক্ষক ও ছাত্র কি ভাবে সহযোগিতা করিবে ইত্যাদি সামগ্রিক বিষয়ই শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়।

শিক্ষা-পদ্ধতির নীতি

(১) শিশুর সহযোগিতা শিক্ষাকে সাফল্যমণ্ডিত করে। কারণ, শিক্ষা প্রধানতঃ শিশুর কাজ, শিক্ষক এই কাজে সাহায্য করিতে পারেন এইমাত্র। শিশু যেন একজন ভ্রমণকারী, শিক্ষক যেন তাহার পরিচালক বা পথপ্রদর্শক। শিক্ষক পথ দেখাইয়া শিশুকে গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি ভ্রমণ করিলেই শিশুর ভ্রমণ করা হইবে না, বা তাহার ফলে শিশু গন্তব্যস্থলে পৌছিবে না। সুতরাং যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিলে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আগ্রহ হয় এবং শিক্ষকের নেতৃত্বে প্রয়োজনীয় চেষ্টা করিয়া শিশু তাহার শক্তিমত শিক্ষালাভ করিতে পারে, তাহাই যথার্থ শিক্ষা-পদ্ধতি। অতএব, দেখিতে হইবে যে, তাহার ফলে শিক্ষালাভের জন্য শিশুর আন্তরিক আগ্রহ জাগে এবং সে মানসিক প্রচেষ্টা করে।

(২) **লক্ষ্য স্থির করা :** শিক্ষাদান কার্যে সাফল্য লাভ করিতে হইলে শিক্ষার বা পাঠের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য শিক্ষকের সম্মুখে থাকিতে হইবে। লক্ষ্য স্থির না রাখিলে শিক্ষক শিশুকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারিবেন না এবং গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইতে পারিবেন না। পাঠের লক্ষ্য শিশুরও জানা প্রয়োজন। তাহা না হইলে শিশু শিক্ষকের নেতৃত্বে গন্তব্যস্থলে যাইবার চেষ্টা করিবে না। অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুসরণ করিলে তাহার সক্রিয়তার উদ্বোধন ঘটিবে না ও শিক্ষা যথার্থ হইবে না। পাঠের দুই প্রকার লক্ষ্য থাকে, (১) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ। পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞান-লাভকে প্রত্যক্ষ এবং সেই বিষয়ে শিশুর অনুরাগ সৃষ্টি ও তাহার মানসিক বিকাশকে পরোক্ষ লক্ষ্য বলে। শিশু প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের জন্য কাজ করিবে। শিক্ষককে প্রত্যক্ষ লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গে চরম বা পরোক্ষ লক্ষ্যও স্মরণ রাখিতে হয় এবং তাহাও সাধনের চেষ্টা করিতে হয়। ইহার জন্য দেখিতে হইবে যে, শিশু চিন্তা করিয়া বুদ্ধি, বিচার ও কল্পনার সাহায্য লইয়া পাঠ অনুসরণ করিতেছে কিনা।

(৩) **পাঠের বিষয় নির্বাচন :** পাঠের বিষয় নির্বাচন না করিয়া তাহার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা যায় না। সুতরাং প্রকৃষ্ট পাঠদানের জন্য শিক্ষককে যত্নের সহিত শিশুর বিকাশের উপযোগী পাঠের বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয় অতি সহজ হইলে তাহা শিক্ষার জন্য শিশুর আগ্রহ হইবে না, অতি কঠিন হইলে শিশু তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে না। এক সময়ে কি পরিমাণ বিষয় শিক্ষা দিবেন তাহাও ঠিক করিতে হইবে। পরিমাণ খুব কম হইলে মেধাবী ছাত্র নিরুৎসাহ হইবে এবং বেশী হইলে সাধারণ ছাত্র অসুবিধায় পড়িবে। সুতরাং মাঝামাঝি ছাত্রদের উপযোগী বিষয়ের পরিমাপ স্থির করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয় ছাত্রদের উপযোগী আকারে গুছাইয়া লইতে হইবে।

(৪) **পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানলাভে সাহায্য করা :** পাঠ্য পদ্ধতির ইহাই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুকে ঠিকভাবে জ্ঞানলাভে সাহায্য করার জন্য (১) প্রথমে তাহার পূর্ব অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং তাহার সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা দিতে হইবে। (২) সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর বিষয় সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে

হইবে। (৩) পাঠ অনুসরণে শিশুকে প্রয়োজন মত সাহায্য করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যেই নানা প্রদীপনের ও শিক্ষা-কৌশলের ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে শিশুকে অতিরিক্ত সাহায্য করা বা তাহার পথের সমস্ত বাধা দূর করাও উচিত নয়। কারণ, পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করিবার জন্য শিশুরও কিছু মানসিক চেষ্টা করা প্রয়োজন। শিশুকে সক্রিয়ভাবে চিন্তা করিতে সাহায্য করিলেই সে স্বচেষ্টায় নূতন বিষয় আয়ত্ত করিতে পারিবে। (৪) নূতন জ্ঞান এভাবে ছাত্রদের সম্মুখে স্থাপন করিতে হইবে যে, ছাত্রও পাঠে সহযোগিতা করিতে পারে এবং সেই বিষয়ে অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের জন্য তাহার আগ্রহ ও শক্তিলাভ হয়।

(৫) **নূতন জ্ঞান আত্মস্থ করা:** কোন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেই শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। তাহার মনে গাঁথিয়া দিবার জন্য পুনরাবৃত্তি, সারাংশ গঠন প্রয়োগমূলক কাজ ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে না পারিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কাজেই অভিজ্ঞতা লাভের পর তাহার ব্যবহার করিতে হইবে। বার বার ব্যবহারের দ্বারাই নূতন জ্ঞান শিশুর সম্পূর্ণ নিজস্ব হইতে পারে এবং স্বাধীনভাবে স্মরণ থাকিতে পারে।

যুক্তিসম্মত এবং মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি (Logical and Psychological Method): শিক্ষাপদ্ধতির ক্রম বিকাশের পথে শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষণের দুইটি পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন। একটি যুক্তিসম্মত পদ্ধতি অর্থাৎ তর্কবিদ্যার মধ্যে পড়ে। আর একদল মনে করেন শিশুর মনের শক্তি সংহত প্রণালীবদ্ধ ও সুসংহত। ইহাদের মতে কোন বিষয় সম্পর্কে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানও প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসে। এই মানসিক শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যে শিক্ষা-পদ্ধতি, তাহাকে মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতি বলা হয়।

যুক্তিসম্মত পদ্ধতি মূলত: বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল। বিষয়বস্তুর পারম্পর্য অনুযায়ী শিশু-মনে পরিবেশিত হয়। মনস্তত্ত্ব-পদ্ধতি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়—শিশুর গ্রহণ-ক্ষমতা ও আগ্রহের ভিত্তিতে শিক্ষা দিতে হইবে।

যুক্তিনির্ভর পদ্ধতিতে তর্কবিদ্যার অবরোহণ ও আরোহণ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়। অবরোহণ পদ্ধতিতে কোন সাধারণ সিদ্ধান্ত হইতে খণ্ড খণ্ড সিদ্ধান্তে আসা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

আরোহণ পদ্ধতি ঠিক ইহার বিপরীত। খণ্ড খণ্ড সত্য বা ধারণার ভিত্তিতে একটি সাধারণ সত্যে বা ধারণায় পৌছান যায়। এক কথায় একই ধরণের ছোট ছোট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়। যেমন, এই হিমসাগর আমটি মিষ্ট, দ্বিতীয় হিমসাগর আমটি মিষ্ট, তৃতীয়টিও মিষ্ট। অতএব বলা যায় হিমসাগর আমই মিষ্ট। খণ্ড খণ্ড সত্য হইতে একটি সাধারণ সূত্র গঠন। এই পদ্ধতি যুক্তি এবং তর্কবিদ্যা-সম্মত হইলেও শিশু মনের গঠন-প্রকৃতির সঙ্গে বরং সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু অবরোহণ পদ্ধতির সাধারণ সূত্র হইতে খণ্ড দৃষ্টান্তে আসা শিশু-মানস গঠনের সঙ্গে মিলে না। শিশু-মন ইহা গ্রহণ করিতে পারে না।

তর্কবিদ্যা-সম্মত পদ্ধতি যুক্তিনির্ভর এবং বিষয়ের পারম্পর্য অনুযায়ী গ্রথিত। কাজেই এই পদ্ধতিতে কোথাও ফাঁক থাকে না। কিন্তু শিশু-মন সব সময় যুক্তিনিষ্ঠ নয়। তাহাদের আগ্রহ ও গ্রহণ-ক্ষমতার সঙ্গে পদ্ধতির পার্থক্য রহিয়া যায়।

যুক্তিসম্মত ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও একেবারে বিরোধ নাই। আরোহণ পদ্ধতি শিশুর জানা ছোট ছোট দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সাধারণ সূত্রগঠন শিশুর আগ্রহ ও ক্ষমতা অনুযায়ী হইতে পারে। শিশুরা নিজের গ্রামের, থানার, জেলার আবহাওয়া, ভূ-প্রকৃতি জানিতে জানিতে দেশের, বহাদেশের ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া জানিতে পারিবে। ইহাতে তাহার আগ্রহ বজায় থাকিবে এবং গ্রহণ করিতেও পারিবে। এখানে যুক্তি-সম্মত পদ্ধতি আর মনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতির বিরোধ নাই।

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতি অপরিহার্য। শিশুর রুচি বুদ্ধি প্রবণতা এবং মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষাপদ্ধতি এই পর্যায়ে কার্যকর হয়। যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি শিশু-মনের পক্ষে খুব বেশী ফলপ্রদ নয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিশোরের মন যুক্তিনিষ্ঠ ও বিচার-প্রবণ হইয়া উঠে। সেই অবস্থায় যুক্তিসম্মত পদ্ধতি অপরিহার্য।

মনস্তত্ত্ব-সম্মত পদ্ধতিতে বিষয়-বিভাজন প্রাসঙ্গিক নয়। জ্ঞান শিশুর কাছে অবিভাজ্যরূপেই আসে—এবং সে আগ্রহ ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী গ্রহণ করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়ের ব্যাপ্তিও গভীরতার জন্য বিষয়-বিভাজন আবশ্যিক হইয়া পড়ে। বিষয়-বিভাজন সব সময় যুক্তিনির্ভর। প্রথমতঃ সামগ্রিক জ্ঞানকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিভক্ত করা, যেমন—ভূগোলের জ্ঞান, ইতিহাসের জ্ঞান, সাহিত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞানের জ্ঞান, গণিতের জ্ঞান ইত্যাদি। তাহার পর প্রত্যেকটি বিষয়ই শিশুর বয়সের মান অনুযায়ী বিভিন্ন উপবিষয়ের ক্রম অনুযায়ী সাজান হয়। কোন একটি বিষয়ের ক্রম ও যুক্তির মাধ্যমে সাজান হয়। এইভাবে সাজান থাকার ফলে শিক্ষকের পক্ষে সহজে সামগ্রিক বিষয়টি শেখান সম্ভব হয়। যদিও এই বিভাজন মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়, কারণ, শিশুর কাছে অভিজ্ঞতা বিচ্ছিন্নভাবে আসে না— আসে সামগ্রিকভাবে। তথাপি শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর হইতেই কিছুটা যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি অনুসরণ বিধেয়।

বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধতি (Analytic and Synthetic Method): শিশু প্রথমে কোন বস্তু বা বিষয়ের অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট ধারণা করে। তাহার ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সঠিক করিবার জন্য বিষয়টিকে বা বস্তুটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার বিভিন্ন অংশ ও তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু ইহাতে অংশগুলির ভাল জ্ঞান হইলেও সম্পূর্ণ জিনিস বা বিষয়টির জ্ঞান নাও হইতে পারে। তাই ইহার পর বিভিন্ন অংশগুলির সহিত সম্পূর্ণ জিনিসটির কি সম্পর্ক আছে তাহার জ্ঞান দেওয়া এবং বিভিন্ন অংশগুলির সমষ্টি হিসাবে সম্পূর্ণ জিনিস বা বিষয়টির জ্ঞান দেওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে জিনিস বা বিষয়টি সম্বন্ধে শিশুর সুস্পষ্ট ও সঠিক জ্ঞান হইবে। যেমন—একটি গাছের সঠিক ধারণা দিবার জন্য প্রথমে গাছটিকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহার মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ইত্যাদির ধারণা দিতে হইবে ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক দেখাইতে হইবে। তাহার পর তাহাদের সহিত সমস্ত বৃক্ষটির সম্পর্ক স্থাপন করিয়া বৃক্ষটির বর্ণনা দিয়া তাহার জ্ঞান সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রেণী শিক্ষণ

(Class Teaching)

মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের অপরিহার্য অঙ্গ হইল শিক্ষা। যে দিন হইতে সে সভ্য হইতে শুরু করিয়াছে সেই দিন হইতে শিক্ষাকার্য শুরু হইয়াছে। প্রথম দিকে পরোক্ষ শিক্ষাই ছিল প্রধান। প্রত্যক্ষ শিক্ষা আসিয়াছে অনেক পরে। তখন শিক্ষা ছিল ব্যক্তি-কেন্দ্রিক। ছাত্র পিতামাতা, দাদা, পুরোহিত বা গুরুর কাছ হইতে শিক্ষা পাইত। সে জ্ঞানার্জন বা নৈপুণ্য লাভ যাহাই হউক। প্রাচীন ভারতে বিদ্যার্থী গুরুগৃহে আসিত। গুরু ব্যবহারিক কাজকর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত পাঠনা বা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে একই চিত্র মিলে। তখন শ্রেণী-শিক্ষা অপরিচিত ছিল। সে যুগে বিদ্যার্থী ছাত্রের সংখ্যা বেশী ছিল না—সকলের পাঠেরও অধিকার ছিল না। সে জন্ম ব্যক্তিগত পাঠনার অসুবিধা ছিল না।

কিন্তু সমাজব্যবস্থা ক্রমশঃ জটিল হওয়ায় এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ব্যক্তিগত শিক্ষণে অসুবিধা দেখা দেয়। তাহা ছাড়া সভ্যতার অগ্রগতির জন্ম শিক্ষণীয় বিষয়ের পরিধিও বাড়িতে থাকে। ভারতে বৈদিক যুগে শূদ্র ও স্ত্রী-লোকের শিক্ষার অধিকার ছিল না। উচ্চারণের মধ্যে মেধাগত উৎকর্ষতা অনুযায়ী ছাত্র বাছাই করিয়া লওয়া হইত। সকলের জন্ম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তীকালে বিদ্যার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্ম শিক্ষা-ব্যবস্থায় নূতন চিন্তা শুরু হইল। এইভাবেই শ্রেণীগত পাঠনার আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

ঠিক কোন সময় ইহতে শ্রেণী-পাঠনা শুরু হইয়াছে, জানা যায় না। তবে ভারতে বৌদ্ধ যুগে যখন জাতি-ভেদ প্রথা ছিল না সে, সময় অত্যধিক ছাত্রবৃদ্ধির জন্ম শ্রেণী-পাঠনার খবর মিলে। বৌদ্ধ-বিহারে শ্রেণীগঠন করিয়া পাঠ দেওয়া হইত। বস্তুতঃ কেবল শ্রেণীগঠনই নয়, প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষালয় স্থাপন বৌদ্ধদের দান।

শ্রেণী-গঠনের ভিত্তি

কতকগুলি ছাত্র-ছাত্রীকে একই পাঠে একই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিবার জন্ম একত্র করা হয়। এই দল-গঠনকে শ্রেণী বলে। এই সব ছাত্রদের বয়স, মানসিক শক্তি গ্রহণ-ক্ষমতা একই রকমের থাকে বলিয়া ধরিয়া লইতে হয় ; কারণ, শ্রেণীতে শিক্ষক ছাত্রদের একই বিষয় একরকম পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করিয়া থাকেন। এই নীতির ভিত্তিতেই পাঠ্যক্রমের স্তরভেদ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। এক বছর ধরিয়া একটি নির্দিষ্ট ফলাফলের পাঠ্যক্রম একটি শ্রেণীতে অনুসৃত হইয়া থাকে। বৎসরান্তে পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণীতে তোলা হয়। মূলতঃ এই নীতি থাকিলেও শ্রেণীগঠনের সময় কয়েকটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন—

(১) **শিশুদের বয়স**—যথাসম্ভব সমবয়স্কদের লইয়া এক-একটি শ্রেণী গঠন করা উচিত। ব্যতিক্রম থাকিলেও সাধারণ পক্ষে এক এক বয়সের মানসিক প্রতিক্রিয়া

এক-এক রকম হয়। সেই জন্য শ্রেণীগঠন করিবার সময় বয়সের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

(২) **বুদ্ধি**—সমবুদ্ধি-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া এক একটি শ্রেণী গঠন করা উচিত। একই বয়সের ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় অতিরিক্ত মেধাসম্পন্ন কিছু ছাত্র থাকে। সাধারণ মেধা ও ক্ষীণ মেধার ছাত্র থাকে। একই পদ্ধতির পাঠ তখন দলের কাজে আসে না। সেই জন্য শ্রেণীগঠন করার সময় শিশুদের মেধার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৩) **মানসিক বিকাশ**—শ্রেণীগঠন করিবার সময় শিশুদের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন শিশুর কোন শ্রেণীর উপযুক্ত মানের বেশী জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে পরবর্তী শ্রেণীতে দিতে হইবে। অনুরূপভাবে যদি কোন শিশুর সেই স্তরের উপযোগী জ্ঞান না থাকে, তাহাকে নীচের শ্রেণীতে দিতে হইবে।

ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতি অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী একে অন্যের চেয়ে পৃথক্। বুদ্ধি সকলের সমান থাকে না। কিন্তু বুদ্ধির দিকে নজর দিলেও বুদ্ধির তারতম্য অনুযায়ী শ্রেণীগঠন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মানসিক বিকাশের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তবে শ্রেণী-পাঠনার সময় ব্যক্তি-বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ দেওয়া বিধেয়—যাহাতে সকলে উপকৃত হয়। অনেক সময় একই শ্রেণীতে ছাত্রদের মেধা অনুযায়ী তিনটি ভাগ করিয়া ক, খ, ও গ শাখা ভুক্ত করা হয়। ইহাতে পঠন-পাঠনের সুবিধা হয়। শ্রেণীতে পর্যাপ্ত ছাত্র থাকিলে এইভাবে ভাগ করা চলে।

শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা

প্রতি শ্রেণীতে ছাত্র-সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে :

(১) শিক্ষকের পাঠ সকলে শুনিতে পায় ও বুঝিতে পারে।

(২) শিক্ষক প্রতিটি ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতে পারেন।

(৩) ছাত্রদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার সুযোগ গড়িয়া উঠিতে পারে।

(৪) দল গঠনের উপযুক্ত।

প্রাথমিক স্তরে বেশী ব্যক্তিগত মনোযোগের প্রয়োজন হয়। সেইজন্য ঐ স্তরে প্রতি শ্রেণীতে বেশী ছাত্র থাকা উচিত নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০ জনের কম ও ৩০ জনের বেশী ছাত্র দিয়া শ্রেণীগঠন যুক্তিযুক্ত নয়। উপরের শ্রেণীতে অবশ্য উর্ধ্বসংখ্যা ৪০ জন করা যাইতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের শ্রেণীগঠন

শ্রেণীগঠনে বিভিন্ন দেশে কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে। যেমন—

(ক) **দৃঢ় প্রথা** (Rigid System). আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের শ্রেণীগঠনের ন্যায়। এই পদ্ধতিতে এক শ্রেণীর সব ছাত্রই শ্রেণীতে সাধারণ পাঠ নেয়। সকল বিষয়ে সকলেই পাঠ নেয়। পাঠ্য-তালিকা পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। বৎসরের শেষে পরীক্ষা দিয়া সকল বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করিলে পরবর্তী উচ্চ শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়।

এই প্রথা সর্বাপেক্ষা সহজ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। এই প্রথার বিরুদ্ধে বলা হয় যে, শ্রেণীতে ক্ষীণ মেধা ও অতিরিক্ত মেধার ছাত্রদের একত্রে পাঠ লইতে হয়। কোন ছাত্র কোন বিশেষ বিষয়ে পারদর্শী হইলেও তাহাকে সকলের সঙ্গে ধীরে ধীরে পাঠ লইতে হয়।

(খ) স্বাধীন প্রথা (Free System)**:** এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হইল যে, বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ে শিক্ষার্থীর উন্নতির মান অনুযায়ী তাহাকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা হয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী থাকে। কোন ছাত্র হয়ত ইতিহাসে পারদর্শী। অন্য সব বিষয়ে তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ নেয়, কিন্তু ইতিহাসে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ নেয়। কিম্বা ইতিহাসে পঞ্চম শ্রেণীর, অঙ্কে তৃতীয় শ্রেণীর এবং অন্য সব বিষয়ে চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ নেয়। এই প্রথায় মানসিক শক্তি ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু সাধারণ জ্ঞান অর্জনের জন্য সব বিষয়ে যে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা দরকার, অনেকের তা থাকে না। আবার যে বিষয়ে ছাত্র দুর্বল সেই বিষয় অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত হয়। এই প্রথা অত্যন্ত জটিল। কেবলমাত্র ডাল্টন প্লানে এই প্রথা অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(গ) মিশ্র প্রথা (Mixed System)**:** এই পদ্ধতি আধুনিক কলেজগুলির শ্রেণী-গঠনের ন্যায়। সাধারণ বিষয়গুলি একত্রে শ্রেণী-পাঠনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় ও শক্ত শক্ত বিষয়গুলির জন্য ছাত্রদের বুদ্ধি অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে মেধাবী ও ক্ষীণ মেধা উভয় দলের ছাত্রদের সুবিধা হয়।

শ্রেণী-পাঠনার সুবিধা

বিদ্যালয়ের পক্ষে শ্রেণী-পাঠনার অনেক সুবিধা আছে। যেমন—

(১) শ্রেণী-শিক্ষণে অল্প শিক্ষকে বিদ্যালয়ের কাজ পরিচালনা করা যায়। এক-একটি শ্রেণীতে একজন শিক্ষক একসঙ্গে অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে একই সময়ে পাঠ দিতে পারেন। ব্যক্তিগত শিক্ষা দিতে হইলে বিদ্যালয়ে যতগুলি শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, শ্রেণী-পাঠনায় তাহা অপেক্ষা অনেক কম লাগে।

(২) শ্রেণী-পাঠনায় শিক্ষা-সরঞ্জাম, সাজ-সজ্জা ও শিক্ষোপকরণ কম লাগে।

(৩) সময়, শক্তি ও অর্থের অপচয় হয় না। একই সঙ্গে অনেকের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায় সময়, অর্থ ও শক্তির অপচয় নিবারিত হয়।

(৪) শ্রেণী-গঠনের ফলে শিক্ষকদের বিষয়-পাঠনার সুবিধা হয়। যিনি যে বিষয়ে পারদর্শী তিনি সেই বিষয়ে শ্রেণীতে পাঠদান করিতে পারেন।

(৫) এক সঙ্গে একই বয়সের ছেলে-মেয়েরা একত্রিত হইয়া পড়ে বলিয়া তাহাদের মধ্যে দলপ্রীতির উদ্ভব হয়। আনন্দের সঙ্গে পাঠগ্রহণ করে।

(৬) শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে কাজ করে। ফলে তাহাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক হয়। একক শিক্ষায় শিশুর সামাজিক ও প্রক্ষোভমূলক বিকাশ সম্ভব হয় না। শ্রেণী-শিক্ষায় পারস্পরিক সহযোগিতা ও সংঘর্ষে তাহার সামাজিক বিকাশ ঘটে।

(৭) ছাত্রদের পারস্পরিক সহযোগিতায় ও মাঝে মাঝে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তাহারা তাড়াতাড়ি পাঠে অগ্রসর হয়। শ্রেণীতে অনেক বিষয় ছাত্ররা পরস্পরকে সাহায্য করে বা প্রতিযোগিতার ফলে পাঠে অনুরাগ বৃদ্ধি পায়।

(৮) বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, ধর্ম এবং আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের ছেলেরা একসঙ্গে পড়ে। ফলে তাহাদের মনের সংকীর্ণতা দূর হয়।

(৯) শ্রেণী-শিক্ষণে অনেক ছাত্র একসঙ্গে পড়ে বলিয়া তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা বোধ জাগ্রত হয়।

(১০) শ্রেণী-পাঠনে প্রজেক্ট ইত্যাদি যৌথ কার্যাবলী গ্রহণের সুবিধা হয়।

(১১) শ্রেণী-পাঠনায় শিশুকে সুনাগরিকরূপে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে। বিদ্যালয়ে নানা কাজকর্মে ও শ্রেণীতে নানা দায়িত্ব পালনের ফলে শিশু আদর্শ নাগরিক রূপে গড়িয়া উঠে।

শ্রেণী-পাঠনার অসুবিধা

শ্রেণী পাঠনার সুবিধাও যেমন আছে, তেমনই অনেক অসুবিধার কথাও বলা হইয়া থাকে। যেমন—

(১) একই বয়স ও বৌদ্ধিক মানসম্পন্ন ছাত্রদের লইয়া শ্রেণী গঠিত হয় এবং শ্রেণীতে সব ছাত্রদের একই রকমের পাঠ দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যক্তি-বৈষম্য নীতি অনুযায়ী একজন ছাত্র অন্যের চেয়ে আলাদা। শ্রেণী-পাঠনায় প্রত্যেকটি শিশুর রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয় না। ফলে এই ব্যবস্থায় সব শিশু যথার্থ শিক্ষা পায় না।

(২) শ্রেণী-পাঠনার সময় যথোপযুক্ত ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। শ্রেণী-পাঠনায় সকল ছাত্র সমভাবে উপকৃত হয় না।

(৩) শ্রেণী-পাঠনার সময় সাধারণতঃ শ্রেণীতে তিন ধরণের ছাত্র থাকে—উন্নত বুদ্ধি, সাধারণ বুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধি-সম্পন্নদের মত করিয়াই পাঠ দেওয়া হইয়া থাকে। ফলে, উন্নত বুদ্ধি ও অল্পবুদ্ধিরা শ্রেণী-পাঠনে বিশেষ উপকৃত হয় না।

(৪) শ্রেণী-পাঠনা ছাত্রদের স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। একটি ঘরে অনেক ছাত্রকে এক সঙ্গে অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। শিশুদের পক্ষে এতক্ষণ বসিয়া মানসিক কাজ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ দিয়া থাকেন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মানসিক সামর্থ্য ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

(৬) শ্রেণীতে প্রভাবশালী মন্দ ছাত্র থাকিলে তাহার প্রভাবে অনেক ভাল ছাত্রেরও মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(৭) শ্রেণী-পাঠনায় শৃঙ্খলা রাখা কষ্টকর। বিভিন্ন চরিত্রের অনেকগুলি ছাত্র শ্রেণীতে সমবেত হয়। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই তাহারা গোলমাল করিতে চায়। শিক্ষককে সব সময় শ্রেণী-শৃঙ্খলার দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাতে পাঠদানের ক্ষতি হয়।

(৮) ছাত্রদের মধ্যে পড়াশুনায়, দলগঠনে বা কাজে অনেক সময় অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

(৯) যে সব ছাত্র শ্রমবিমুখ, পাঠে ফাঁকি দিতে চায়, শ্রেণী-পাঠনায় তাহারা সে সুযোগ মেলে।

(১০) শ্রেণী-শিক্ষায় শিক্ষক ব্যক্তিগত মনোযোগ দিবার সুযোগ পান না, ফলে কোন ছাত্রের অসুবিধা ও ত্রুটির দিকে লক্ষ্য দেওয়া সম্ভব হয় না। ছাত্রদের কাহারও কোন বিষয়ে বিশেষ গুণ থাকিলেও সেগুলি বিকশিত হইবার সুযোগ ঘটে না।

(১১) শ্রেণী-শিক্ষায় ছাত্রদের উপর শিক্ষকের প্রভাব বিশেষ পড়ে না। ফলে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক সুদৃঢ় হইবার সুযোগ পায় না।

(১২) ছাত্রদের স্বাতন্ত্র্য থাকে না—সব একছাঁচে তৈরী হয়।

অসুবিধা নিরসনের উপায়

শ্রেণী পাঠনায় সুবিধা অসুবিধা দুই ই আছে। শিক্ষক চেষ্টা করিলে ইহার মধ্যেও কার্যকর পন্থা অবলম্বন করিয়া সুফল আনিতে পারেন। নিম্নলিখিত উপায়ে ইহার ত্রুটিগুলি সংশোধন করিতে পারেন।

(১) মানসিক শক্তি অনুযায়ী ছাত্রদের উত্তম, মধ্যম ও অধম—তিন দলে ভাগ করিয়া পাঠ দেওয়া যাইতে পারে। সাধারণভাবে পাঠ দিবার পর তিন দলকে পৃথক্‌ভাবে পাঠ দেওয়া যাইতে পারে।

(২) শ্রেণী-পাঠনার সময় শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করা।

(৩) ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া। ইহার জন্য বেশী প্রশ্ন করা, কাজ দেওয়া, বোর্ডে কাজ দেওয়া, প্রত্যেকের কাছে গিয়া কাজ দেখা ও প্রয়োজন মত সাহায্য করা ইত্যাদি।

(৪) প্রজেক্ট, শিল্পকাজ ইত্যাদির ভিতর দিয়া স্বাবলম্বিতা ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ঘটিতে পারে। ইহাতে ছাত্ররা স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ পাইবে। তাহাদের যতদূর সম্ভব স্বাধীন ভাবে কাজের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে।

(৫) খারাপ ছেলেদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৬) স্বাস্থ্যবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ এবং শ্রেণীর মাঝে বিশ্রাম ও খেলাধূলার সুযোগ দিলে ছাত্রদের বিরক্তিভাব দূর হইবে ও স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি হইবে না।

(৭) ডবল প্রমোশন দেওয়া বা ভাল ছেলেদের বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া বন্ধ করিতে হইবে।

শ্রেণী শৃঙ্খলা ও শিক্ষকের দায়িত্ব

শ্রেণীতে সুষ্ঠু শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ থাকা চাই। পরিবেশ ভাল না হইলে কোন কাজ হয় না। শ্রেণীতে উপযুক্ত শৃঙ্খলা না থাকিলে শ্রেণী-পাঠনা ব্যাহত হইবে, শিক্ষার্থীরা উপকৃত হইবে না। শৃঙ্খলার অর্থ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একের

আচার-আচরণকে নিয়মানুগ করা। শিক্ষার্থী এক বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া বিদ্যালয়ে আসে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগুলি বিধি-নিষেধ পালন করিতে হয়। শিক্ষার্থী যদি এই নীতি-নিয়মগুলি না মানে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই যে উদ্দেশ্য সাধানের জন্য তাহারা বিদ্যালয়ে আসিয়াছে তাহা কতকটা ব্যাহত হইবে। কাজেই শিক্ষার সঙ্গে শৃঙ্খলার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

শৃঙ্খলারক্ষার জন্য শিক্ষার্থীই একমাত্র দায়ী নয়। শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিবেশ, বিদ্যালয় পরিচালনা, পাঠদান-পদ্ধতি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগী হওয়া প্রয়োজন।

শৃঙ্খলারক্ষায় শিক্ষকের দায়িত্ব

শ্রেণীতে শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব শিক্ষকের। বিশৃঙ্খল পরিবেশে তাঁহার পাঠদানের সব পরিকল্পনা ও উদ্যম ব্যর্থ হইবে। কাজেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশে রচনার মূল দায়িত্ব শিক্ষকের।

(১) শিক্ষক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হইবেন। তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্জনে সক্ষম হইবেন। তিনি সুবিচারক, পক্ষপাতশূন্য হইবেন। তাঁহার আচরণ মার্জিত ও সৌজন্যপূর্ণ হইবে। তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাবে ছাত্ররা নম্র, বিনয়ী হইবে এবং তাহাদের পাঠে একাগ্রতা আসিবে।

(২) শ্রেণীতে স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। শিক্ষকের প্রভাবে গণতান্ত্রিক অভ্যাসের মাধ্যমে ছাত্রদের মধ্যে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হইবে।

(৩) শিক্ষকের পাঠ্য-বিষয়ের উপর দখল থাকিবে। তিনি নিজে একজন অধ্যবসায়ী ছাত্র হইবেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে ছাত্ররা নূতন নূতন বিষয় পাঠে আগ্রহী হইবে।

(৪) পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁহার দক্ষতা থাকিবে। বিষয়কে সহজ ও সরসভাবে ছাত্রদের কাছে উপস্থিত করিবেন। তাহাদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিবেন।

(৫) শ্রেণী-পাঠনার সময় প্রয়োজন মত ছাত্র-সহযোগিতা লইবেন। প্রশ্নের মাধ্যমে বা শ্রেণীতে কাজ দিয়া এই সহযোগিতা লওয়া যাইতে পারে।

(৬) শিশুরা কর্মপ্রবণ। তাহাদের এই প্রবণতাকে শ্রেণী-পাঠানার ক্ষেত্রে সঞ্চারিত করিতে হইবে।

(৭) শ্রেণী শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত সময় তালিকার ভূমিকার গুরুত্ব রহিয়াছে। এমন ভাবে সময়-তালিকা রচনা করিতে হইবে যে, যাহাকে কোন বিষয় ছাত্রদের কাছে বিরক্তিকর ও একঘেয়ে না হইয়া উঠে। ইহার জন্য সময়-তালিকায় সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়সমূহের (co-curricular activities) অন্তর্ভুক্তি বাঞ্ছনীয়।

(৮) কেবল সাধারণ ছাত্রদের পঠনের উপযুক্ত পাঠনা দিয়া অগ্রসর ও পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের উপযুক্ত পাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষক উপযুক্ত পরিবেশ রচনা, আপন ব্যক্তিত্ব ও আচরণ ও কর্মের মাধ্যমে ছাত্রদের অন্তর্জাত শৃঙ্খলাবোধের উদ্বোধন ঘটাইবেন।

শ্রেণী-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিবেশ, বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কার্য-পরিচালনা ও শিক্ষা-সরঞ্জামের প্রভাবও কম নয়।

(১) শ্রেণীকক্ষের অবস্থান স্বাস্থ্যকর ও আনন্দময় হইতে হইবে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকিবে। ছাত্র ও শিক্ষকের বসার আসনের সুব্যবস্থা থাকিবে।

(২) বই, বোর্ড, চক, ম্যাপ, চার্ট এবং অন্যান্য শিক্ষা-উপকরণ থাকিবে এবং সেইগুলি যথার্থভাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৩) বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিচালনা উত্তম হইবে। সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা ও পরীক্ষা-পদ্ধতি সুপরিচালিত হইবে।

প্রশ্নাবলী

1 What is class-teaching ? Describe the origin and development of class-teaching.

2. What are the merits and defects of class-teaching.

3. Describe the different practices followed in forming classes ?

4. Describe the responsibility of the teacher in maintaining the class discipline.

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা-পদ্ধতি

(Individualised Teaching)

গতানুগতিক শিক্ষাপদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতিকে স্বীকার না করা। অনাধুনিক যুগে শিক্ষার ক্ষেত্রে বিষয়কেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইত। কি শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাই বড় কথা—কি উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহা বড় কথা নয়। সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছে শিশুর মস্তিষ্ক শূন্যভাণ্ড নয় এবং রুচি বুদ্ধি ও প্রবণতার দিক দিয়া প্রতিটি শিশুর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় এই ব্যক্তিগত পার্থক্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। এমন কি বিশেষ কারণবশতঃ সাময়িকভাবে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রেরও নিজের ত্রুটি সংশোধনের বিশেষ সুযোগ আমাদের বর্তমান শ্রেণী-শিক্ষণের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্তমান শ্রেণী-শিক্ষণে একটি শ্রেণীতে রুচি বুদ্ধি প্রবণতা নির্বিশেষে সব শিক্ষার্থীকেই একই পাঠ এক রকমের পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়। ফলে সকলে সমভাবে উপকৃত হয় না।

বুদ্ধিগত পার্থক্য : পাঠ এবং কাজের দিক দিয়া বোধ ও নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে শিশুতে শিশুতে পার্থক্য বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়। মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা এই বৈষম্য আরও প্রকট হইয়া পড়ে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণের মতে প্রতিটি শিশুর মানসিক ক্ষমতা অন্যের অপেক্ষা আলাদা। এই মানসিক ক্ষমতাই বুদ্ধি নামে অভিহিত। যাহার মানসিক ক্ষমতা বেশী স্বভাবতঃই সে তাড়াতাড়ি বেশী বিষয় শিখে এবং যাহার বুদ্ধি কম, সে বেশী শিখিতে পারে না। গাণিতিক নিয়মে বুদ্ধির পরিমাপ বা বুদ্ধ্যঙ্ক হিসাব করিলে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ হইতে ১৪০ বা তাহারও বেশী, সাধারণ ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ হইতে ১১০ এবং অল্প মেধার ছেলে-মেয়েদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০-এর নীচে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্নদের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য অনেক বেশী। কাজেই একই শ্রেণীতে একই পদ্ধতিতে পাঠদান সকলের পক্ষে ফলদায়ক হইবে না।

বিশেষ শক্তিগত পার্থক্য : বুদ্ধিগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন শিশু যন্ত্রপাতির কাজ ভালবাসে, কেহ বা সাহিত্য সৃষ্টি ও আলোচনায় উৎসাহী, কেহ বা শিল্পকর্মে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ শক্তিরও দক্ষতা এবং নৈপুণ্যের দিক্ দিয়াও শিশুদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রবণতাজনিত পার্থক্য : বুদ্ধি এবং বিশেষ শক্তিগত পার্থক্য ছাড়াও আগ্রহও সকল শিশুর সমান নয়। কিন্তু এই আগ্রহই শিক্ষার চাবিকাঠি। যাহার যে বিষয়ে আগ্রহ, সেই বিষয়ে সে আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা করে এবং জীবনের ক্ষেত্রেও যে কাজ সে ভালবাসে সেই কাজ পাইলে জীবনেও সাফল্য আসে। কিন্তু সকল শিশুর এক বিষয়ে বা কাজে সমান অনুরাগ থাকে না।

ইউনিট-ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা : উপরিউক্ত আলোচনায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, মানসিক শক্তি, বিশেষ শক্তি ও প্রবণতার দিক্ দিয়া শিশুতে শিশুতে পার্থক্য রহিয়াছে। শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি-বৈষম্যকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয় না। আধুনিক যুগে কিছু শিক্ষাবিদ্ শ্রেণী-শিক্ষণের এই অসুবিধা নিরসনের চেষ্টা করিয়াছেন। এই চিন্তা হইতে ইউনিট-ভিত্তিক শিক্ষা-পদ্ধতির উৎপত্তি।

ইউনিট হইল সমগ্র পাঠ্য-বিষয়ের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। সমগ্র পাঠ্য-বিষয়ের ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও এক একটি পাঠ-ইউনিট স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই ইউনিটগুলি কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়—সমগ্র পাঠ্য-বিষয়ের অংশ হইলেও নিজেরা স্বতন্ত্র। যেমন—'স্বরসন্ধি'। সমগ্র বাংলা ব্যাকরণ পাঠ্য-বিষয়ের ক্ষুদ্র অংশ হইলেও পাঠ একক হিসাবে স্বরসন্ধি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতি হিসাবে আধুনিক কালে কয়েকটি শিক্ষা-পদ্ধতিকে ধরা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে ডল্টন প্ল্যান, উইনেট্কা পরিকল্পনা ও মরিসন পরিকল্পনা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) ডল্টন পরিকল্পনা (Dalton Laboratory Plan)

ডল্টন পরিকল্পনার প্রবর্তক হইলেন মিস্ হেলেন পার্খার্ষ্ট (Miss Helen Parkhurst): আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ডল্টন-নামক শহরে ইহা প্রথমে প্রবর্তিত হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রেণীগুলি ল্যাবরেটরীরূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্যই ইহার নাম ডল্টন ল্যাবরেটরী প্লান।

জন অ্যাডামস (John Adams) এই পদ্ধতিকে শ্রেণী-পাঠনার মৃত্যুঘণ্টা (death knell of class-teaching) বলিয়াছেন। এই পদ্ধতিতে শ্রেণী-পাঠনার কোন ব্যবস্থা নাই। এই পরিকল্পনায় ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে এক মাসের কাজ (assignment) নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় তাহা শিক্ষা করিতে বলা হয়। শ্রেণী-কামরাগুলিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য পরীক্ষাগারের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। এক-একটি বিষয় শিক্ষার জন্য এক-একটি কামরা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। সেই কামরায় নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষার উপযোগী পুস্তক, চিত্র, শিক্ষাসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সাজাইয়া রাখা হয়। বিদ্যালয়ে কোন সময় পত্রিকা থাকে না। ছাত্রগণ যখন যে বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে বা প্রয়োজন বোধ করে তখন সেই বিষয় শিক্ষার কামরায় গিয়া যতক্ষণ ইচ্ছা তাহা শিক্ষা করিতে পারে। কাজেই প্রত্যেক শিশু আপন আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায়। শিক্ষকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয়-শিক্ষার কামরায় উপস্থিত থাকেন; কিন্তু ছাত্রগণ কোন পরামর্শ বা সাহায্য না চাহিলে তাহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করেন না। ছাত্রগণকে বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিয়া তাহাদের সারমর্ম লিখিতে হয়। শিক্ষকগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রতিটি ছাত্রের প্রত্যেক বিষয়ের পাঠোন্নতির রেখাচিত্র (graph) প্রস্তুত করেন। এই পদ্ধতির অন্য কোনরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে না।

ডল্টন প্লান সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত কর্মসম্পাদন-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষার্থী নিজের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করিবে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শ্রেণী-পঠনের নিষ্ক্রিয় শ্রোতা নয়, সে সক্রিয়ভাবে সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে, চেষ্টায় ও মানসিক শক্তি অনুযায়ী শিক্ষালাভ করিবে। একমাত্র চুক্তি ছাড়া বিদ্যালয়ের কোনও রূপ চাপ থাকে না। কোন ছাত্র যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহাকে কোন নূতন কাজ দেওয়া হয় না। কিন্তু সে যদি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেও সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করিতে পারে তখনই তাহাকে নূতন কাজ দেওয়া হয়।

একক বিভাজন ও কার্যভার প্রথা (Unit division and Assignment System): ডল্টন প্লানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল একক বিভাজন ও কার্যভার বণ্টন। সমগ্র পাঠ্য-বিষয়টিকে প্রত্যেক মাসের পাঠ্য হিসাবে ভাগ করা হয়। এক এক মাসের পাঠ্য-বিষয়কে চার সপ্তাহের পৃথক্ ভাবে ভাগ করা হয়। এই ভাবে দৈনিক পাঠ নির্দিষ্ট করাকে পাঠের একক (unit) বলা হয়। প্রতি মাসের পাঠের এককগুলি পাঠের জন্য প্রতিটি ছাত্রের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ চুক্তি সম্পাদিত হয়।

সম্মিলন (Conference)ঃ পূর্বে বলা হইয়াছে এই পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, তথাপি অন্তভাবে ইহার কিছু বৈশিষ্ট্য রাখা হইয়াছে। শ্রেণীর ভিত্তিতে ছাত্ররা এক এক সময় একস্থানে সমবেত হয় ও আলোচনা করে। এখানে তাহাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হয়। শিক্ষকও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং উপদেশ দেন। কিন্তু শ্রেণীবদ্ধ ভাবে কোন পাঠ দেন না। কোন পাঠগত সমস্যা সমাধান নয় বলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রেও এই সম্মেলনের গুরুত্ব রহিয়াছে। ব্যক্তিগত পাঠনার জন্য ডল্টন প্লানে শিশুর সামাজিক দিক্‌গুলি বিশেষভাবে অবহেলিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতির সম্মিলনে পারস্পরিক আলোচনার সময় ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপিত হয় ও তাহাদের সামাজিক-বোধের বিকাশ সম্ভব করে।

যৌথ কর্ম (Group activities)ঃ ডল্টন প্লানে ব্যক্তিগত ভাবে স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সামাজিকতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে (assignment) প্রথা সম্পূর্ণ নয়। এইজন্য এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন রূপ যৌথ কার্যাবলীরও ব্যবস্থা আছে। যেমন—সাহিত্য-সভা, বিতর্ক, বক্তৃতা, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা, তেমনই ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিতর্ক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া খেলাধুলা, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজের সাহায্যেও তাহার সামাজিক দিকের বিকাশ সাধিত হইতে পারে।

(১) **ডল্টন প্লানের সুবিধা ও শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা**ঃ গতানুগতিক শ্রেণী-শিক্ষণে ব্যক্তিগত বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য রাখা হয় না। ফলে উচ্চ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অনগ্রসর শিশুদের শিক্ষা আশানুরূপ হয় না। ডল্টন-পদ্ধতিতে শিক্ষকেরা প্রধানতঃ ছাত্রদের কাজ দেখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের স্বচেষ্টায় শিক্ষা দিয়া থাকেন। এই পদ্ধতিতে ছাত্রকে আত্মচেষ্টার খুব বেশী সুযোগ ও উৎসাহ দেওয়া হয়। শ্রেণী-শিক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকে না। শিক্ষার্থিগণ ব্যক্তিগতভাবে পাঠ সম্পাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয় ও আপন রুচি ও বুদ্ধি প্রবণতা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে শিক্ষা লাভ করে।

(২) **ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ**ঃ ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের নিজ নিজ শক্তি ও জ্ঞানের উপযোগী পদক্ষেপে বা গতিতে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হইতে পারে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না এবং শেষো ছাত্রকে প্রথমোক্ত ছাত্রের সহিত তালে তালে পা ফেলিবার চেষ্টা করি হাঁপাইতে হয় না ও জ্ঞানার্জনে হতাশ হইতে হয় না।

(৩) **চুক্তি সম্পাদনের বৈশিষ্ট্য**ঃ ছাত্রদের নির্দিষ্ট পাঠ বা কার্য সম্পাদনে জন্য চুক্তিবদ্ধ হইতে হয়। চুক্তি সম্পাদনের দায়িত্ব পালনের জন্য তাহারা সচে হয়। তাহারা শ্রমের অর্থ ও মর্যাদা উপলব্ধি করে।

(৪) **কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে**ঃ শ্রেণী-শিক্ষায় কো ছাত্র কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে অসুবিধায় পড়িতে হয়, কিন্তু ডল্ট

প্লানে ছাত্রের সে অসুবিধা থাকে না। যে অবস্থায় থামিয়াছিল সেইখান হইতে পুনরায় শুরু করিতে পারে।

(৫) **শৃঙ্খলা:** ডল্টন প্লানে শ্রেণী-শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইতে হয় না। শিক্ষার্থী চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিজে পাঠে বা কাজে সচেষ্ট হয়। সুতরাং কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই বিশৃঙ্খল হওয়া সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক ভাবেই বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষিত হয়।

(৬) ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীলতা শিক্ষা হয় এবং দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

(৭) পাঠোন্নতির রেখাচিত্র দেখিয়া ছাত্রগণ তাহাদের আপেক্ষিক পাঠোন্নতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকে এবং প্রতিযোগিতা করিতে উৎসাহ পায়।

(৮) এক-এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক এক জন শিক্ষকের পক্ষে সকল শ্রেণীর ছাত্রগণকে সেই সেই বিষয়ে পাঠে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

ডল্টন প্লানের অসুবিধা

উক্ত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ডল্টন প্লান-সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষণ-পদ্ধতি হইতে পারে নাই। এই পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি হইল:

(১) ইহা খুব নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের উপযোগী নয়। ছোট শিশুরা শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিতে পারে না।

(২) শ্রেণী-পাঠনায় শিক্ষার্থী অনেক সময় নিষ্ক্রিয় থাকে। শিক্ষক থাকেন ক্রিয়। ডল্টন প্লানে ছাত্র সক্রিয়, শিক্ষক থাকেন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকায়। তবে াহাকে প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিটি বিষয়ের পাঠোন্নতির সঠিক রেখা-চিত্র অঙ্কিত ারিতে হয়।

(৩) এই পদ্ধতি বর্তমান প্রচলিত শ্রেণীকক্ষের পরিবর্তে সাজসরঞ্জাম সম্বলিত ্রতিটি বিষয়ের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘরের দরকার হয়। ইহার প্রারম্ভিক ব্যয় এত বশী যে, সাধারণ স্কুলের পক্ষে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণীকক্ষ বিসর্জন দিয়া এই পদ্ধতি ্রহণের উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা সম্ভব হয় না।

(৪) এই পদ্ধতিটির একটি বিশেষ ত্রুটি অপ্রিয় বিষয় শিক্ষায় শিশুর অনীহা। শিশুর স্বচেষ্টায় পাঠে স্বাধীনতা দেওয়া হয় বলিয়া দেখা গিয়াছে, ছাত্র যে বিষয় পাঠে াগ্রহী অর্থাৎ যে বিষয়কে সে পছন্দ করে, সেই বিষয় পাঠে মনোযোগী হয় ও ময় বেশী দেয়, এবং যে বিষয় সে পছন্দ করে না, সেই বিষয় পাঠে আগ্রহই হয় না র্থাৎ পিছাইয়া থাকে।

(৫) ইহা সকল বিষয় শিক্ষার উপযোগী নয়।

(৬) ইহাতে কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিতে হয়। উপযুক্ত প্রদীপনের সাহায্যে শিক্ষকের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দ্বারা কোন বিষয় যেরূপে হজে বোধগম্য করা যায়, কেবল পুস্তক পাঠে তাহা সম্ভব হয় না।

(৭) কেবল ছাত্রের লেখা সারমর্ম দেখিয়াই তাহার পাঠোন্নতি সঠিকরূপে নির্ধারণ করা যায় না। সে অন্যের সাহায্যেও সারমর্ম লিখিতে পারে।

(৮) সময়-পত্রিকা না থাকিলে বিদ্যালয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইতে পারে।

২। উইনেটকা পরিকল্পনা (Winnetka Plan)

উইনেটকা শিক্ষা-পরিকল্পনার রচয়িতা হইলেন কার্লটন ওয়াসবার্ন। এই পরিকল্পনাও ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কার্লটন ওয়াসবার্ন ১৯১৯ সালে উইনেটকা শহরের একটি স্কুলে তাঁহার পরিকল্পনাটি প্রয়োগ করেন বলিয়াই পরিকল্পনাটির নাম 'উইনেটকা পরিকল্পনা'। ব্যক্তিগত শিক্ষাদান হইলেও এই পদ্ধতির সঙ্গে ডল্টন পরিকল্পনার অনেক পার্থক্য আছে।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠ্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

(১) সাধারণ অপরিহার্য অংশ (Common essentials)

(২) যৌথ কার্যাবলী (Group activities)

(১) সাধারণ অপরিহার্য অংশ

পাঠ্যক্রমের এই অংশ সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এই অংশের বিষয়গুলিকে কতকগুলি ইউনিটে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্য কার্যভারের তালিকা (assignment sheet), কার্যক্রম তালিকা (work sheet) ত্রুটি নির্ধারণমূলক অনুশীলন তালিকা (Diagnostic practice sheet) এবং সবশেষে পরীক্ষা তালিকা (Final test) প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাহার নিজস্ব ইউনিট অনুযায়ী কাজ করে। তাহার কাজ বা পাঠ শেষ হইলে সে শিক্ষক-প্রদত্ত উত্তরপত্রের সঙ্গে নিজের উত্তরপত্র মিলায়। যদি দেখে তাহার উত্তর ঠিক হইয়াছে তাহা হইলে সে ঐ ইউনিটের অন্য অংশের কাজ শুরু করে। কিন্তু যদি দেখে তাহার উত্তরে ভুল আছে, তাহা হইলে পুনরায় ঐ কাজ বা পাঠ অনুশীলন করে। এইভাবে একটি ইউনিটের সব খণ্ড ইউনিটগুলির কাজ শেষ হইলে শিক্ষার্থী শিক্ষককে তাহার শেষ অভীক্ষা লইতে অনুরোধ করে। এই শেষ অভীক্ষায় সে যদি উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নূতন ইউনিটের কাজ দেওয়া হয়। ইউনিটের কাজ করার সময় শিক্ষার্থী নিজ নিজ রুচি বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার স্বাধীনতা পায়।

ডল্টন পরিকল্পনার সঙ্গে এই পরিকল্পনার অন্যবিধ বিষয়ে সাধর্ম্য থাকিলেও ভারপ্রাপ্ত কাজের দিক্ দিয়া রূপগত পার্থক্য বিদ্যমান। ডল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী প্রতি মাসের জন্য নির্দিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কাজ (assignments) শেষ করিলে তবে পরবর্তী মাসের কাজ পায়। কিন্তু উইনেটকা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর পক্ষে বাঁধাধরা কিছু থাকে না। সে স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে পারে। এই পরিকল্পনায় এমনও দেখা যায় যে, একজন শিক্ষার্থী হয়ত ইতিহাসে দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়াছে কিন্তু ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে নবম শ্রেণীতে ও গণিতে সপ্তম শ্রেণীতে রহিয়াছে।

(২) যৌথ কার্যাবলী

ডল্টন প্ল্যানে মূলতঃ ব্যক্তিগত উৎকর্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে উইনেটকা পরিকল্পনায় ব্যক্তিগত উৎকর্ষতা ও সামাজিক বিকাশ, উভয় দিকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। শিক্ষার্থীরা দিনের প্রথম অংশে পাঠের অত্যাবশ্যকীয় অংশগুলি সম্পন্ন করে। অবশিষ্ট সময়ে দলগত কাজ করে। যেমন—নাচ-গান খেলা, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্যচর্চা, ভ্রমণ, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদি। এইবা

কাজের মাধ্যমে ছাত্রদের সৃজনীশক্তির ও সামাজিকতার বিকাশ সাধিত হয়। সাধারণ অত্যাবশ্যকীয় অংশ পরীক্ষার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, যৌথ কার্যাবলীতে কোনও রূপ পরীক্ষা নাই।।

৩। মরিসন পরিকল্পনা (Morrison Plan)

ডল্টন ও উইনেটকা পদ্ধতির মতই মরিসন পরিকল্পনাও ব্যক্তিগত শিখনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এইচ. সি. মরিসন (H. C. Morrison) এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। এই পদ্ধতিতেও আগের দুইটি পদ্ধতির মত একক বিভাজন ও কার্যভার বণ্টন (Unit division and assignment) নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। মরিসন মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

মরিসন পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইল—ইহাতে শ্রেণী-প্রথা বজায় রাখিয়াও ব্যক্তিগত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা। ডল্টন প্লান ও উইনেটকা পরিকল্পনায় শ্রেণী-প্রথা সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া ব্যক্তিগত স্বাধীন প্রথা অনুসৃত হইয়াছে, পক্ষান্তরে মরিসন পদ্ধতিতে গতানুগতিক শ্রেণী-প্রথার মধ্যেই ব্যক্তিমুখী পাঠনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

মরিসন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল, প্রথমে সমগ্র পাঠ্য-বিষয়টিকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করিয়া শিখনের একক তৈরি করিতে হইবে। এই ছোট ছোট অংশগুলি হইল দৈনিক পাঠের একক। পরে নিম্নরূপ স্তর অনুসরণ করিয়া পাঠে অগ্রসর হইতে হইবে।

(ক) প্রথম স্তরে প্রাক্-পাঠ পরীক্ষণ—নূতন বিষয়ে পাঠ দিবার পূর্বে সেই বিষয়ে ছাত্র কতটুকু জানে, জানিবার জন্য তাহার পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিতে হইবে।

(খ) শিক্ষণ—এই স্তরে পাঠ্য-বিষয়টির পাঠ দেওয়া হইবে।

(গ) ফল পরীক্ষণ—শিক্ষার্থী কতটা পাঠ গ্রহণ করিতে পারিয়াছে, পরবর্তী স্তরে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

(ঘ) ব্যবস্থাগ্রহণ—শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় যে ত্রুটি বা অসঙ্গতি লক্ষিত হইবে, সেইগুলির সংশোধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঙ) পুনরায় শিক্ষণ—বিষয়টি পুনরালোচনার মাধ্যমে পুনরায় শিক্ষা দিতে হইবে।

(চ) পুনরায় পরীক্ষণ—সর্বশেষে আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে তাহার শিখন সম্পূর্ণ হইয়াছে কিনা।

শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এই সোপান-কয়টি অনুসরণ করা কর্তব্য লিয়া মরিসন সাহেব মনে করেন। এই পদ্ধতিতে শ্রেণী-শিক্ষাই সমর্থন করা ইয়াছে। তবে ব্যক্তি-বৈষম্যের নীতিকেও অস্বীকার করা হয় নাই। পাঠদান াদ্ধতির মধ্যে যে বিস্তৃত স্তরগুলি রহিয়াছে, সেইগুলির পুনঃপুনঃ প্রয়োগের মাধ্যমে াকল প্রকার শিক্ষার্থীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এই পরিকল্পনায় শ্রেণীভিত্তিক ব্যবস্থা াজায় রাখা হইয়াছে এবং প্রয়োগ করা সহজ বলিয়া অনেকেই নির্দ্বিধায় এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্নাবলী

1. Explain Individualised Instruction.

2. What are the main features of Dalton Plan and discuss its merits and defects.

3. What do you know by Winnetka Plan? Discuss its merits and defects.

4. Compare Dalton Plan with Winnetka Plan and state in what way one has the advantage over the other.

5. What are the main features of Morrison Plan?

প্রজেক্ট পদ্ধতি
(Project Method)

আমেরিকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই (John Dewey) শিক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা আনয়ন করেন। তাঁহার মতে সত্যকার অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান আসে সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য সক্রিয়তার প্রয়োজন হয়। ডিউইর এই সমস্যা সমাধান সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া প্রজেক্ট পদ্ধতি বা প্রজেক্ট মেথড গড়িয়া উঠে। উইলিয়াম হার্ড্ কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতির প্রকৃত নির্মাতা। ডিউইর সূত্রের পরিমার্জন করিয়া সঠিক রূপে এর প্রতিষ্ঠা কিলপ্যাট্রিকের কৃতিত্ব।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে শিশুদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা বলা হইয়া থাকে বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া শিশুরা নিজেরা শিখিবে। আবার সেই কাজ যদি বাস্তবে প্রয়োজনীয় হয়, তাহা হইলে আরও ভাল হয়। শিক্ষক এই সমস্যার উপরে পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন ও আপন লক্ষ্যের উপযোগী পরিচালনা করিবেন।

স্বাভাবিক অবস্থায় কোন কার্যরূপ-সমস্যা সমাধানের আকারে শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে প্রজেক্ট মেথড্ বলে[১]। কিলপ্যাট্রিক বলিয়াছেন, "প্রজেক্ট হইল একটি কর্ম যাহা সামাজিক পরিবেশে মন প্রাণ দিয়া করা হয়[২]।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য কোন কার্যরূপ-সমস্যা ছাত্রের সামনে উপস্থি করা হয় এবং ছাত্রকে স্বচেষ্টায় তাহা সমাধান করিতে বা কাজটি সম্পন্ন করিতে

১ "A Project is a problematic act carried to completion in its natural setting." —Stevenson

২ "A project is a whole-hearted purposeful activity, proceeding in a social environment."—Kilpatrick

বলা হয়। অভীষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সামনে ধরা হয়, কিন্তু তাহা সমাধানের উপায় ছাত্রকে স্বচেষ্টায় আবিষ্কার করিতে হয় এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাহাকে গন্তব্য-স্থলে পৌঁছিতে হয়।

মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক হিসাবে কোন একটি সম্পূর্ণ কাজ হইল প্রজেক্ট। শ্রেণীতে কোন বাস্তব সমস্যা ছাত্রদের সম্মুখে ধরা হয়। ছাত্ররা সেইটির সমাধানের জন্য কৌতূহলী হয়। তাহারপর সমস্যাটি লইয়া আলোচনার পর তাহাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।

কেবল পদ্ধতির দিক্ দিয়া নয়, কর্মের স্বরূপ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রজেক্ট দুই প্রকারের হইতে পারে। (১) বুদ্ধিমূলক, (২) কার্যমূলক।

(১) **বুদ্ধিমূলক প্রজেক্টঃ** বুদ্ধিমূলক কার্যসমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে সকল সময় বাস্তবিক ভাবে কাজটি করিতে হয় না। কার্য-সমস্যাটি সমাধানের কল্পিত কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিলেই সমস্যাটির সমাধান হইল। যেমন, কোন ছাত্রকে দিল্লী হইতে মাদ্রাজ যাইবার যে সমস্যা, তাহার সমাধান করিতে বলা হইল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সে মানচিত্র, রেলওয়ে টাইমটেবিল ইত্যাদি দেখিয়া কখন কি উপায়ে, কোন্ পথে যাইতে হইবে, কত খরচ লাগিবে, কি কি জিনিস সঙ্গে লইতে হইবে ইত্যাদি ঠিক করিবে। তাহার পর সে দিল্লী হইতে মাদ্রাজ যাইবার কল্পিত ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনা করিতে পারিলেই কার্য-সমস্যাটির সমাধান করা হইল। দলগত ভাবেই বুদ্ধিমূলক প্রজেক্ট করা যাইতে পারে। যেমন, শ্রেণীতে একটি সমস্যা উঠিল বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকার স্বরূপ সম্পর্কে। কাজের পরিকল্পনা করিয়া ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে দল ভাগ করিবে। পাঠাগারের বইপত্র দেখিয়া কাজ শুরু করিবে। একজন বা একদল এক একটি দেশের জাতীয় পতাকা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিতে লাগিল। প্রত্যেক দলের কাজ শেষ হইলে প্রত্যেক দল তাহাদের রিপোর্ট দিল ও একটি সামগ্রিক রিপোর্ট তৈরি হইল। পাঠ্য-বিষয় লইয়াও এমনই বুদ্ধিমূলক কাজ চলিতে পারে।

(২) **কার্যমূলক প্রজেক্টঃ** কার্যমূলক সমস্যা সমাধানের জন্য ছাত্রকে বাস্তবিক কাজটি করিতে হইবে। শিক্ষক বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ছাত্রকে কতকগুলি কাজ করিতে দিবেন। ছাত্র স্বচেষ্টায় তাহা সম্পাদনের উপায় স্থির করিবে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তাহা সম্পাদন করিবে। যথা—দিক্ নির্ণয় করা, বিদ্যালয়ের ও গ্রামের নকসা তৈয়ার করা, বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি নানা রকম জিনিস প্রস্তুত করা। বড় ছাত্রদের বাগান করা, দোকান করা প্রভৃতি শক্ত কাজও দেওয়া যাইতে পারে।

বিদ্যালয়ের সীমানার মধ্যে নানারকম সমস্যা সমাধান করা যাইতে পারে।

কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাজগুলি সম্পন্ন করিতে হইলে, অনেক সময় ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের সীমানার বাহিরেও লইয়া যাইতে হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের পাঁচটি স্তরে কর্মসম্পাদন করিতে হয়। যথা—

(১) সমস্যার উত্থাপন। (২) সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা ও পরিকল্পনা।

(৩) সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সাফল্য। (৪) সমস্যা সমাধানের পর সাধারণ সূত্র গঠন। (৫) সূত্র পরীক্ষা।

(১) সমস্যার উত্থাপন: প্রথমে বিষয়টি সমস্যার আকারে শ্রেণীতে ছাত্রদের সম্মুখে রাখিতে হইবে। সমস্যাটির সঙ্গে যেন বাস্তব-জীবন সমস্যার মিল থাকে ছাত্ররা যখন সমস্যার গুরুত্ব বুঝিবে তখন নিজেদের প্রয়োজনের খাতিরে সবাই মিলিয়া ইহার সমাধান করিতে চাহিবে।

সমস্যার উত্থাপনে শিক্ষকের পরিকল্পনা ও দক্ষতার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বাস্তব সমস্যা কি আর থাকিতে পারে। শিক্ষক এই সমস্যার সৃষ্টি করিবেন এবং এমনভাবে সমস্যাটি উপস্থিত করিবেন, যাহাতে ছাত্ররা যেন না ভাবে এটি শিক্ষকের সৃষ্টি। এই সমস্যার দিকে ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টির কাজও শিক্ষক করিবেন। বাস্তবতঃ প্রথম দিকে শিক্ষকের পরিকল্পনামত কাজ হইবে।

শিক্ষক শ্রেণীর পাঠ্যক্রমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করিবেন। কোন প্রজেক্ট-মূলক কাজের পরিকল্পনা করিবেন। সেই প্রজেক্টে কোন কোন বিষয় কি পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া যাইবে, তাহার পরিকল্পনা করিবেন এবং সেইভাবে কাজটিকে পরিচালিত করিবেন। মনে রাখা দরকার, শিক্ষকের পরিকল্পনা যত নিখুঁত হইবে প্রজেক্টও তত সুন্দর ও শিক্ষণীয় হইবে। প্রজেক্ট হইল শিক্ষার মাধ্যম—একথাটিও মনে রাখা দরকার। উত্থাপনের সময় শিক্ষক আলোচনাকে লক্ষ্যাভিমুখী করিবার চেষ্টা করিবেন।

(২) সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা ও পরিকল্পনা: সমস্যাটি শ্রেণীতে গৃহীত হইলে ইহার সমাধানের জন্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিতে হইবে। এই এক-একটি অংশ এক-একটি ইউনিট। ছাত্র-ছাত্রীরাই কাজের ইউনিট কি হইবে, তাহা স্থির করিবে। কিন্তু যেহেতু ছাত্র-ছাত্রীদের অভিজ্ঞতা কম, সেইহেতু শিক্ষক বা শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া শিক্ষক তাঁহার ইঙ্গিত দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়া কাজের উইনিট স্থির করিবেন।

কাজের ইউনিট স্থির হইয়া গেলে ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকার সহযোগিতায় কিভাবে ইউনিটের কাজটি সম্পাদন করিবে তাহার একটি পরিকল্পনা করিবে কি কি কাজ হইবে তাহার কর্ম-তালিকা স্থির করিয়া কে কি কাজ করিবে, তাহা স্থির করা হইবে এবং পরে দল গঠন করা হইবে।

(৩) সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ও সাফল্য: প্রত্যেক দল নিজেদের কাজের পরিকল্পনা করিবে। তাহারা আলোচনা করিয়া তাহাদের ইউনিটের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিবে। আলোচনা করিতে গিয়া হয়ত তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠাগারে পুস্তক পাঠের প্রয়োজন হইবে, শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করিবে। শ্রমমূলক প্রজেক্টে বাস্তব কাজে নামিবে। কোন দল উপাদান সংগ্রহ করিবে, কোন দল তথ্য সংগ্রহ, কোন দল রূপায়ণের জন্য শ্রমমূলক কাজ করিবে। নিজের নিজের দলের পরিকল্পনা মত কাজ শেষ করিবে। প্রতেক দলের কাজ শেষ হইলে বাস্তবতায় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। শিক্ষক ঘুরিয়া ঘুরিয়া

দেখিবেন এবং প্রয়োজন বোধে সাহায্য করিবেন। শিক্ষক ঐ সব কাজের উপর নির্ভর করিয়া সম্বন্ধিত শিক্ষা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইবেন।

প্রতিদিন কাজের শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাদের কাজের বিবরণী লিখিবে এবং সমস্ত দলগুলি একে অপরের কাজগুলির কথা শুনিবে ও দেখিবে। কাজ দেখা ও শোনার পর ছাত্র-ছাত্রীরা কাজের মূল্যায়ন করিবে।

(৪) **সমস্যা সমাধানের পর সাধারণ সূত্র গঠন** ঃ প্রতিটি ইউনিট নিজেদের দলের কাজ শেষ করিবে ও সমস্যার সমাধান করিবে। তাহারা তাহারপর একত্র হইয়া অংশগুলির সংযোগ সাধন করিবে, তাহা হইলে সমগ্র সমস্যাটির সমাধান হইয়া যাইবে। প্রত্যেকটি দল শ্রেণীকক্ষে সমবেত হইয়া নিজের নিজের দলের রিপোর্ট দাখিল করিবে। প্রত্যেক দলের কর্ম-বিবরণী এবং তথ্য ও জ্ঞান প্রতিটি দলই শুনিবে, ফলে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি কাজকর্মই প্রত্যেকে জানিবে। ইউনিটগুলির রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রজেক্টের একটি রিপোর্ট তৈরি হইবে।

(৫) **মূল্যায়ন** ঃ প্রজেক্ট শিক্ষার মাধ্যম। সুতরাং প্রজেক্টের শেষে দেখিতে হইবে, ছাত্র ইহার দ্বারা কতটা উপকৃত হইয়াছে। সেই জন্ম কাজের শেষে পরীক্ষা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই পরীক্ষা আলোচনার মাধ্যমেও হইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা বা কাজ সম্পর্কে রচনা লিখিতে দেওয়া যাইতে পারে।

প্রজেক্টের মাধ্যমে বিষয় শিক্ষা

ট্রেনিং স্কুল ও কলেজগুলিতে অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষক শিক্ষার্থিগণ বাস্তব শিক্ষাদানের সময়—রং চং-এ সাজানো সুন্দর প্রজেক্ট করিয়া থাকেন। ইহাতে প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। প্রজেক্টের কাজের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক ভাবে শিশুরা অনেক কিছু শিক্ষা করে। পরোক্ষ শিক্ষা ছাড়াও সম্বন্ধিত ভাবে বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিশুরা বাস্তবভাবে কাজ করিতে গিয়া যাহা শিখিবে প্রতিদিন তাহা শ্রেণীকক্ষে আনিয়া বিস্তৃতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শহীদবেদী নির্মাণ করিতে গিযা ছাত্ররা একটি নির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রকে ইঁট দিয়া বাঁধাইতে কয় খানি ইঁট লাগিল অঙ্ক কষিয়া বা বাস্তব কাজের ভিতর দিয়া দেখিল। এই সমাধানকে শ্রেণীকক্ষে অনিয়া শিক্ষক ক্ষেত্রফলের বড় বড় অঙ্ক শিক্ষা দিতে পারেন। মোট কথা একটি নির্দিষ্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি পরিমাণ শিক্ষা দিবেন, শিক্ষক প্রথমেই তাহার পরিকল্পনা করিবেন।

প্রজেক্ট-পদ্ধতির সুবিধা

(১) নানা কাজের মধ্যদিয়া হাতে-কলমে শিক্ষা হয় বলিয়া, ইহাতে ছাত্রের ভাল শিক্ষা হয় এবং তাহারা অধিকতর কাজের লোক (Practical) হয়।

(২) ছাত্রগণ তাহাদের অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতেও শিক্ষা করে।

(৩) শিক্ষার সহিত বাস্তব-জীবনের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কেননা, কার্য-সমস্যাগুলি সাধারণতঃ বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্র হইতে নির্বাচন করা হয়।

(৪) ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৫) শ্রেণী-পাঠনায় একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(৬) বিভিন্ন পাঠ্য-বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক (Co-relation) স্থাপিত হয়। একটা কাজ করিবার সময় অনেক বিষয়ের জ্ঞানের ব্যবহার করিতে হয়।

(৭) সমস্যা সমাধানের আকারে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছাত্রের সম্মুখে ধরা হয় বলিয়া ছাত্রগণ শিক্ষার জন্য অধিকতর আগ্রহশীল হয়।

(৮) সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।

(৯) বাস্তব সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া শিশুদের আগ্রহ পূর্বাপর বজায় থাকে। এই পদ্ধতিকে বরং স্বয়ং শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবল কার্যসমস্যা-পদ্ধতির সাহায্যে ছাত্রের শিক্ষা সম্পূর্ণ করা কঠিন। কারণ, কেবল এই পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া যায় না, কার্যসমস্যাগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় না এবং অনেক বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তবে শ্রেণী পাঠনার অনুপূরক ভাবে কার্যসমস্যা-পদ্ধতি ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে আমাদের বিদ্যালয়-সমূহে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার অনেক উন্নতি হইতে পারে।

এই পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হইল, নীতি হিসাবে যদিও বলা হইয়াছে জীবন-সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষা, তবুও প্রকৃত পক্ষে কৃত্রিম সমস্যা সৃষ্টির দ্বারা প্রজেক্ট লওয়া হইয়া থাকে। অবশ্য শিক্ষকের উপস্থাপনার গুণে কৃত্রিম সমস্যাও জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে।

শিক্ষকের কর্তব্য: প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষা দিবার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গুলির দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন,—

(১) শ্রেণীর পঠিতব্য বিষয়সমূহ শিশুর পরিচিত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রজেক্ট নির্বাচন করা উচিত।

(২) শ্রেণীতে উপস্থাপনের পূর্বেই শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা অত্যাবশ্যক।

(৩) অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষককে পরিকল্পনা শ্রেণীতে উপস্থিত করিতে হইবে যেন ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেরাই কাজ করিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

(৪) পরিচ্ছন্ন ও পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড রাখা। ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ডাইরী ও বিবরণী রাখিবে, শিক্ষকও তেমনি প্রাত্যহিক কাজ ও প্রদত্ত শিক্ষা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণী রাখিবেন।

(৫) প্রত্যেক কাজের শেষে সমীক্ষা থাকিবে। প্রতিদিন কাজ করিবার পর যেমন ছাত্ররা, তেমনি শিক্ষকও আত্মসমীক্ষা রাখিবেন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the Project Method and comment on its basic principles.
2. Dicuss the merits and defects of Project Method.

সপ্তম অধ্যায়

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি

শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিশুর মানসিক শক্তি, তাহার আগ্রহ ও প্রবণতার উপর আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে। পূর্বে শিশু-শিক্ষায় শিশুকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হইত না। শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে শিক্ষা ও শিক্ষণের নীতি-গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুরু হইল। শিশুর আগ্রহ, বুদ্ধি ও প্রবণতা ইত্যাদি শক্তির উপর শিক্ষা নির্ভরশীল অধিকাংশ আধুনিক শিক্ষাবিদ্ একথা স্বীকার করেন। ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিশুর গুরুত্ব ক্রমশঃ স্বীকৃত হইতেছে।

শিশুর প্রকৃতি সদা চঞ্চলতা। সে কখনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। সর্বদা ছোটাছুটি, খেলাধূলা, ভাঙ্গাগড়ার কাজে ব্যস্ত। এইটিই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। শিশুদের কাছে খেলা আর কাজের মধ্যে কোন তফাৎ নাই। মনোবিজ্ঞানের মতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে শিশুর স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে, ফলে তাহার বিকাশ ব্যাহত হয়।

শিশুর দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক' দিকের বিকাশের জন্য প্রত্যেক দিকের যথোপযুক্ত অনুশীলনের প্রয়োজন। শিশুর মধ্যে বৌদ্ধিক ও নৈতিক গুণাবলীর স্ফূরণ তখনও ঘটে নাই। সেইজন্য তাহার শারীবিক বিকাশই প্রাথমিক কর্তব্য। বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশ ইহার অনুবর্তী। এই শারীরিক বিকাশের জন্য তাহাকে সর্বদা অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হয়। নিজের তাগিদেই করে—অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া আনন্দ পায়।

বড়রা শিশুদের এই অহেতুক চঞ্চলতা ভাঙ্গা-গড়া সুনজরে দেখেন না। নিজের পরিণত ও বাস্তব দৃষ্টিতে শিশু-চরিত্রের বিচার করে। ফলে শিশুর দৈহিক বিকাশের জন্য এবং মানসিক অবসাদ হইতে মুক্তির জন্য যা প্রয়োজন তাহার ভুল ব্যাখ্যা করে। শিশুর হৈ, চৈ, খেলাধূলা, ভাঙ্গাগড়ার ভয়ে আমরা ত্রস্ত থাকি। তাহার অনন্ত কৌতূহলকে আমরা জ্যাঠামো বলিয়া উপহাস করি। এইভাবে তাহার চাহিদা ও প্রয়োজনকে দূরে সরাইয়া রাখি। তাহাকে কোন কাজের ভার দেই না—সে কোন কাজের নয়—এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসি।

কিন্তু এই জগৎ পারাবারের খেলায় সকলেই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, সবাই ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছে। শিশু নিজের রাজ্যে মহিমময়। নিজের রাজ্যে সে নানা কল্পনা, ধ্বংস ও সৃষ্টির লীলায় মগ্ন। প্রত্যেক কাজের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্বন্ধের উপলব্ধি হয়ত তাহার নাই—কিন্তু নিজের মনে তাহার অর্থ ও ছাপ অবশ্যই পড়িয়া থাকে।

ক্ষুদ্র জগতের অধিবাসী হইতে সে ক্রমে এই বিশাল বিশ্বের সক্রিয় সদস্য হইতে চায়। তাহার নিজের ছোট পরিবেশের বাহিরে যে বিপুল ধরণী আর অনন্ত জ্ঞান আছে, সে তাহার কৌতূহল সম্বল করিয়া সে সকলের সঙ্গে পরিচিত হইতে চায়।

শিক্ষকের উদ্দেশ্যও তাহাই। তিনি শিশুকে এই বিপুল পৃথিবীর অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের অংশী করিতে চায়। তিনি চলেন নিজের গতিপথে। সেইখানেই বাধে সংঘাত। শিশুর প্রয়োজন ও চাহিদা পৃথক্। বড়দের প্রয়োজন ও চাহিদা হইতে আলাদা। সেইজন্য শিক্ষক. কেন্দ্রিক শিক্ষণ-পদ্ধতিতে এত গলদ।

ঝর্ণার স্রোতকে বিপরীত দিকে লইয়া যাওয়া যায় না। লইয়া গেলেও তখন আর ঝর্ণা থাকে না। শিশুর মনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। শিশু মনের গতিকে ঠিক রাখিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌দের ইহাই অভিমত।

শিশু এই সব ভাঙ্গাগড়া, খেলাধূলা—কাজকর্মের ভিতর দিয়া নিত্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া চলিয়াছে। সে অনুকরণপ্রিয়। বড়দের অনুকরণ করে। আমরা রবীন্দ্রনাথের মাস্টারীর গল্প জানি। শিশু হাতে ছড়ি লইয়া উঠানের খুঁটিগুলিকে ছাত্র মনে করিয়া পাঠ দেয়—বেত মারে। সে গাড়ীর ড্রাইভার হয়, ডাক্তার হয়। বাহিরের জগতে যা দেখে তাহার অনুকরণ করে। কৃত্রিম হইলেও এইভাবে ক্রমে ক্রমে সে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে।

শিশু এই সব কাজের ভিতর দিয়া যাহা আয়ত্ত করে প্রকৃত পক্ষে তাহাই শিক্ষা। সে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। শিশুমন একটু পরিণত হইলে বিমূর্ত জ্ঞান উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু শৈশবে সে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করে। শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতিকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির অর্থ

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি শিশু কর্মপ্রিয়, সে কাজ করিতে ভালবাসে। শিক্ষাকে যদি শিশুর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অনুকূল করা যায়, তাহা হইলে শিশু স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষা লাভ করিবে। ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনের ভিতর দিয়া সে স্বাভাবিক ভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সাধারণতঃ শিশুর কাজে আগ্রহ থাকে। এই স্বাভাবিক আগ্রহের বশে সে কাজ করে। তাহার পেশী সঞ্চালিত হয় এবং দর্শনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় ও মন একসঙ্গে কাজ করে, ফলে কাজের ভিতর দিয়া যে অভিজ্ঞতা আসে তাহা সহজে উপলব্ধ হয় ও সেই অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়। কাজের মাধ্যমে সামগ্রিক অর্থবহ কোনও জ্ঞান বা নৈপুণ্য অর্জন করে। এই জ্ঞান বা নৈপুণ্য স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু অর্জন করে যাহার ফল সে প্রত্যক্ষ করে বা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে। সেইজন্য কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে স্বভাবানুযায়ী শিক্ষানীতিকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

ইউরোপের দেশসমূহ ও আমেরিকায় কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা, হাতে-কলমে শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কাজ ও খেলার মাধ্যমে স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি যে ফললাভ করা যায়, সেগুলি হইল :

(১) শিশুরা বাস্তবতঃ কাজ করিয়া বস্তু ও তাহার গঠন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছুটা

অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিশু এই কর্মভিত্তিক অভিজ্ঞতা বহুদিন পর্যন্ত মনে সজীব রাখিতে পারে।

(২) দলীয় কাজের মাধ্যমে যখন কোন অভিজ্ঞতা লাভ করে, তখন স্বাভাবিক ভাবে লৌকিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

(৩) কাজ করার মাধ্যমে শিশুরা বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং প্রতিটি অভিজ্ঞতা বহুবিধ সমস্যার প্রেরণা আনে। শিশুদের মনে নানাবিধ কর্মের প্রতি আগ্রহ সঞ্চারিত হয় ও তাহারা এইসব কর্মের মাধ্যমে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করে।

(৪) দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে শিশুরা সাঙ্গীকৃত ভাবে ও সম্বন্ধিত আকারে বৌদ্ধিক শিক্ষাও পাইয়া থাকে। আগ্রহের সূত্র অনুযায়ী এই সব জ্ঞান স্বাভাবিক ভাবে আসে বলিয়া সহজগম্য ও স্থায়ী হয়।

কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা যথার্থ ভাবে আসে বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ্‌গণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার কথা বলিয়াছেন।

"যে কর্ম করার মাধ্যমে বস্তুসমূহ দক্ষতা সহকারে হস্তচালন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যে কর্মের মধ্যে মস্তিষ্ক ও হস্তকুশলতার বিকাশ হয় তাহাই হইল কর্মকেন্দ্রিক নীতির 'করা'। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ-বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যদি ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করিয়া অভিজ্ঞতা লাভে অগ্রসর হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে 'কর্মভিত্তিক 'শিক্ষা।"[১]

শিশু-শিক্ষায় ব্যবহৃত কাজকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে:

(১) অনির্দেশিত কাজ (২) নির্দেশিত কাজ

(১) **অনির্দেশিত কাজ:** "অনির্দেশিত কাজের অর্থ, যে কাজে শিক্ষকের কোন নির্দেশ থাকিবে না। শিশুরা স্বাভাবিক অবস্থায় নিজেরাই কাজ করিবে। নির্দেশিত কাজের ক্ষেত্রেও কাজ করিবে শিশুরা কিন্তু কাজটির সামগ্রিক পরিচালনার ভার থাকিবে শিক্ষকের উপর। শিশুরা তাঁহার নির্দেশেই কাজ করে। নির্দেশিত কাজে ষোল আনা আনন্দ থাকে না—যেমন থাকে অনির্দেশিত কাজে। যেমন, গান করা। গান যাহার পেশা—তাহাকে নিয়োগ কর্তার অভিরুচি অনুসারে গান করিতে হয়। অনেক কারুকার্যও সে প্রকাশ করে—তবে তাহাতে তাহার হৃদয়ের সুর মেলে না। নিজের আনন্দে গায়ক যখন গান করে, গান যেমনই হউক তাহাতে আনন্দের ভাগ কম পড়ে না।"

"অনির্দেশিত কাজ শিশুর স্বাধীন কাজ। শিশু নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবে—খেলিবে, গড়িবে, ভাঙিবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে—তাহা হইলে বিদ্যালয়ের কাজ চলিবে কি করিয়া? বিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষা দেওয়া। শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে চলিতে দিলে বিদ্যালয়ের প্রয়োজন পড়ে না।"

"বিদ্যালয়ের প্রয়োজন আবেষ্টনী তৈরির। নির্দিষ্ট আবেষ্টনীতে শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করিবে।"[২]

(১) অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত—পদ্ধতি, পরিচালনা ও স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গে।

(২) শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু—বিদ্যালয় সংগঠন ও পরিচালনা।

পরিবেশ সৃষ্টি : অনির্দেশিত কাজের মূলকথা হইল পরিবেশ সৃষ্টি। এমন পরিবেশ গড়িয়া তুলিতে হইবে যাহাতে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে কাজ করিতে আগ্রহী হয় ও করে। ইহার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে :

(১) শ্রেণীকক্ষ বেশ সুপরিসর হইবে, ছোট ছোট ছেলেরা যাহাতে সহজে চলাফেরা ও ছোটাছুটি করিতে পারে। কাজের জিনিসপত্র রাখিতে পারে।

(২) ঘরের দেওয়ালে জিনিসপত্র রাখিবার ব্যবস্থা থাকিবে। শেল্ফ জাতীয় কিছু থাকিলেই চলিবে। শিশুরা নিজেরা যাহাতে জিনিসপত্র রাখিতে পারে, লইতে পারে—এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) ঘরের মধ্যে কাজের উপাদান থাকিবে। যে সব উপাদান শিশুদের কাজের উপযোগী এবং যেগুলি লইয়া তাহারা আগ্রহের সঙ্গে খেলিবে। যেমন,—

(ক) মাটি। শ্রেণীকক্ষের একপাশে কিছুটা ভিজা মাটি রাখিতে হয়। শেল্ফে থাকিবে মাটির তৈরি বিবিধ ফল আর পুতুল। সেই ফল ও পুতুল দেখিয়া শিশুরা নিজেরাই মাটি দিয়া গড়িতে চাহিবে।

(খ) নানা রংয়ের কাগজ। কাগজের ফুল দেখিয়া শিশুরা কাগজ কেটে ফুল তৈয়ারী করিবে।

(গ) কাগজ রং তুলি। ছেলেরা ছবি দেখিয়া ছবি আঁকিবে।

(ঘ) ছোট ছোট খুরপি, ছোট ঝাঁঝরি, ছোট টব, গাছ। ছেলেরা খুরপি দিয়া মাটি খুঁড়িয়া টবে গাছ লাগাইবে।

(ঙ) কাঠের টুকরা ছোট হাতুড়ি ও পেরেক। ছাত্ররা এ সব দিয়া নূতন জিনিস তৈয়ার করিতে চেষ্টা করিবে।

(চ) ছবির বই, ছোট ছোট কাঁচি—কাঁচি দিয়া ছবি কাটিবে।

(ছ) পুরাতন ট্রেনের, ট্রামের টিকিট, খাম, পোস্টকার্ড, ডাক-টিকিট ইত্যাদি।

(জ) একটি টবে পরিষ্কার জল, সাবান এবং আলনায় ছোট ছোট তোয়ালে ও চিরুনি থাকিবে। ছেলেরা কাজের শেষে হাত পা ধুইবে—তোয়ালে দিয়া মুছিবে এবং চুল পরিষ্কার করিবে।

শিশুরা এই সব উপকরণ দিয়া নানারকম জিনিস তৈয়ার করিবে। তাহাদের তৈরি জিনিসগুলি যত্ন করিয়া ঘরের একদিকে গুছাইয়া রাখিতে হইবে।

অনির্দেশিত কাজে শিক্ষকের কর্তব্য

অনির্দেশিত কাজে শিক্ষকের কিছু করণীয় নাই একথা ঠিক নয়। প্রতিটি শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষকের বিশিষ্ট কাজ রহিয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে বিশেষত: অনির্দেশিত কাজে শিক্ষকের স্থান অন্তরালে। অন্তরালে থাকিয়াই তিনি সমগ্র কাজটি পরিচালনা করেন।

শিক্ষকের প্রধান কাজ হইল :

(১) পরিকল্পনা রচনা করা। কিভাবে কাজে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি করা যাইবে, কি কি কাজ দেওয়া হইবে, তাহার শিক্ষাগত মূল্য কতদূর—এই সব পরিকল্পনা করিতে হইবে।

(২) অনির্দেশিত কাজের উপযোগী পরিবেশ রচনা করা শিক্ষকের অন্যতম প্রধান কাজ।

(৩) শিক্ষক শিশুদের কাজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। যে কাজ শিশুদের প্রয়োজনীয় ও তাহাদের কল্যাণের প্রতিবন্ধক নয়, সেই কাজের বাহিরে হইলে শিক্ষক কৌশলে শিশুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন।

(৪) অনেক শিশুর কল্পনা-শক্তি কম। খেলা বা কাজ বিষয়ে কল্পনা করিতে পারে না। শিক্ষক তাহাকে সাহায্য করিবেন।

(৫) কাজ করার সময় শিশুরা যন্ত্রপাতি সঠিকরূপে ব্যবহার করিতেছে কিনা শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন ও প্রয়োজন স্থলে সাহায্য করিবেন।

অনির্দেশিত কাজে শিক্ষা

অনির্দেশিত কাজে শিশুরা দুই প্রকারের শিক্ষা পাইয়া থাকে। পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ। প্রথম দিকে শিশুদের পক্ষে পরোক্ষ শিক্ষারই প্রয়োজন বেশী। বিভিন্ন জিনিস নাড়াচাড়া করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা, বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি বাড়ে, তাহার পেশী শক্ত হয়। তাহার বাচন-শক্তি সুসমঞ্জস হয়, সে আচরণ শিখে।

অনির্দেশিত কাজের মাধ্যমে শিশু প্রত্যক্ষ ভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিখিতে পারে :

খবর বলার মাধ্যমে কথা বলা, ছবি আঁকা, ভাষা ও সামান্য গণিত শিখা। সে যে সব জিনিস তৈয়ার করিবে তাহার নীচে জিনিসের নাম লিখিবে। রেল বা ট্রামের টিকিটে কোথাকার টিকিট, কত দাম লিখিবে। কয়টি জিনিস তৈয়ার করিয়াছে প্রতিদিনের ডাইরীতে লিখিবে। যখন দোকান ঘর বা পুতুলের বিয়ে প্রজেক্ট হিসাবে নেয় তখন কোনের জিনিসের চার্ট, প্রতিটি জিনিসের নাম—তাহার নীচে দাম লিখিবে। পুতুলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ-পত্র লেখা, জিনিস-পত্রের ফর্দ তৈয়ার করা ইত্যাদির মাধ্যমে পড়া, লেখা ও গণিত শিখে।

নির্দেশিত কাজ

প্রথম দিকে শিশুরা অনির্দেশিত কাজ করিতে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু কোন কাজে বেশীক্ষণ লাগিয়া থাকিতে পারে না। একটি কাজ শেষ করার আগেই আবার একটি নূতন কাজ আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে শিক্ষককে দেখাইয়া দিতে হয়। শিশুরা কোন কাজে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে না। কারণ তাহারা কল্পনা দ্বারা কাজ করিয়া সব অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে না। সেইজন্য শিশুদের কাজের ব্যাপারে শিক্ষককে আরও সক্রিয় হইতে হইবে। বিদ্যালয়ে কাজ ঠিক করিবার সময় শিক্ষককে মনে রাখিতে হইবে কাজ মাধ্যম মাত্র—আসল লক্ষ্য শিক্ষা, শিশুর বৃদ্ধি। সুতরাং অনুরূপ ভাবে কাজের পরিকল্পনা করিতে হইবে। স্বভাবতঃই সেইখানে নির্দেশের কথা আসে।

কিন্তু পূর্বে দেখিয়াছি শিশুর আগ্রহ না জন্মাইলে কাজ ভাল হয় না। নির্দেশিত কাজে আগ্রহ আসে না। সে ক্ষেত্রে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে। কাজেই শিক্ষক এমন ভাবে অগ্রসর হইবেন যাহাতে নির্দেশিত কাজেও আগ্রহের

পাঠের সময়। প্রতিদিন কতটুকু কাজ হইবে, বিভিন্ন অংশে কত সময় লাগি
তাহার হিসাব পরিকল্পনায় থাকিবে।

(২) উপাদান ও উপকরণ। কাজ করিতে গিয়া কি কি উপকরণ ও যন্ত্রপ
লাগিবে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে।

(৩) পাঠ্য-বিষয়। কোন্ বিষয়ে কি কি পাঠ সম্বন্ধিত ভাবে দেওয়া হইবে
কাজের কোন্ অংশের সহিত সম্বন্ধিত করা হইবে? কোন্ দিন কোন্ পাঠ দে
হইবে, কি ভাবে দেওয়া হইবে, কি কি শিক্ষা উপকরণ লাগিবে? সবকিছু শিক্ষা
পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

(৪) আগ্রহ সঞ্চার—কি ভাবে ছাত্রদের কাজে আগ্রহ সঞ্চার করা হইবে
আগ্রহ বজায় রাখা যাইবে—পরিকল্পনায় তাহার ইঙ্গিত থাকিবে।

(৫) মূল্যায়ন—কাজের মূল্যায়ন কি ভাবে হইবে সে সম্পর্কে চিন্তা থাকিবে

(৬) শিক্ষক কি কি রেকর্ড রাখিবেন? এই কার্যকালে শিক্ষককে কি কি ে
রাখিতে হইবে, ছাত্ররা কি কি রেকর্ড রাখিবে—তাহা পূর্বাহ্নে ঠিক করিতে হইবে

বৎসরের প্রথমেই শিক্ষক একটি বাৎসরিক কাজের পরিকল্পনা করিবে
এইখানে শিক্ষার স্তর নির্দিষ্ট থাকিবে। বাৎসরিক পরিকল্পনা অনুসারে প্রতি মা
জন্য পৃথক্ পরিকল্পনা থাকিবে। তাহার পর সাপ্তাহিক পরিকল্পনা। সাপ্তা
পরিকল্পনায় কাজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকিবে।

২। দলীয় আলোচনায় ভিত্তিতে রক্ষিত সাপ্তাহিক রেক
বিদ্যালয়ের সব শিক্ষক একত্রে বসিয়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিবেন। শি
স্তর ঠিক আছে কিনা, পুনরুক্তি ঘটিতেছে কিনা, কোন বিষয় বাদ পড়িয়াছে কিন
খুঁটিনাটি পর্যালোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত লিখিয়া রাখিতে হইবে। কাজের মাঝে ম
শিক্ষকদের এইরূপ আলোচনা অত্যন্ত কার্যকর। শ্রেণী-শিক্ষক এই আলোচ
সুবিধার জন্য প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত কাজের বিশদ বিবরণ রাখিবেন। কাজ, উপা
সময়, উৎপাদন, সম্বন্ধিত শিক্ষা, বিশেষ পাঠ, অসম্বন্ধিত পাঠ, কাজের প্রগতি, শি
প্রগতি, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রাখিবেন।

৩। শিশু সমীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ: শিক্ষক শিশু-সম্পর্কিত যাবতীয় তা
যথাযথ রেকর্ড রাখিবেন। যেমন—

(ক) ভর্তি হইবার সময় শিশুর পরিচয়, পারিবারিক ইতিহাস, তাহার সাংস্কৃ
আর্থিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি একটি পৃথক্ খাতায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

(খ) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর বিদ্যালয়-জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ রাখিবে
এইখানে শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য, উচ্চতা, ওজন, পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্তিতা, আ
অনুরাগ, শিল্পকাজ, সামাজিক কাজ ইত্যাদিতে যোগ্যতা, নৈপুণ্য ইত্যাদি লি
হইবে।

৪। সময়পত্র (Routine): কর্মকেন্দ্রিক বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সম
অত্যন্ত কার্যকর। দিনের ও আবাসিক স্কুলভেদে বিভিন্ন রকমের সময়পত্র হইবে।

৫। **প্রগতিপত্র (Progress report)**: ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে
)তার পরিমাপ লিখিত হয় ও মাঝে মাঝে অভিভাবকের অবগতির জন্য পাঠান
থাকে।

৬। **ধারাবাহিক পরিমাপ পত্র (Cumulative record card)**: ইহা
র বিদ্যালয়-জীবনের সামগ্রিক পরিমাপ। অনেকক্ষেত্রে কোনরূপ শেষ পরীক্ষার
য়া থাকে না।

৭। **পাঠোন্নতি পত্র**: প্রত্যেক ছাত্রের পাঠোন্নতি বিষয়ে চার্ট বা রেখাচিত্র
ph) বিবরণ রাখিতে হইবে। প্রতিটি কাজে শিশুর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার
াপ দৈনিক, সাময়িক ও বাৎসরিক হিসাবে রক্ষিত হইবে।

৮। **অন্যান্য রেকর্ড**: পাঠাগারের পুস্তক-তালিকা, মিটিং বুক, নোটিশ বই,
বই, হাজিরা খাতা ইত্যাদি। যে কোন বিদ্যালয় পরিচালনায় এইগুলি
রিহার্য।

(খ) **ছাত্রদ্বারা রক্ষিত রেকর্ড**: কর্মকেন্দ্রিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে
ন্ন কাজকর্ম ও পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু রেকর্ড রাখিতে হয়।
বা প্রজেক্টের পরিকল্পনা, ডাইরী ও মূল্যায়নের রেকর্ড রাখিতে হয়। শিল্প
জর বেলায়ও এইসব রেকর্ড প্রয়োজনীয়। সেইজন্য প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে
কাজ, সামুদায়িক কাজ, সাহিত্য কর্ম, ব্যক্তিগত পাঠ, সংস্কৃতিমূলক কাজ ইত্যাদির
ব রাখিতে হয়। এই রেকর্ড রাখিবার একটি নমুনা দেওয়া হইল। শিশুর
সরিক পরীক্ষার সময় এই সামুদায়িক কাজের হিসাবও যথোপযুক্ত ভাবে
ক্ষিত হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ে কাজের নৈর্ব্যক্তিক হিসাব

১. কাজের বিবরণ	
২. প্রদত্ত সময়	
৩. কাজের স্বরূপ শ্রমযুক্ত/ বৌদ্ধিক	
৪. যোগদানের স্বরূপ পরিকল্পনা/ সক্রিয়তা উভয়তঃ	
৫. কাজের মূল্যবোধ	
৬. গৃহীত মূল্য	
৭. কোন নূতন জ্ঞান অর্জিত হইলে তাহার বিবরণ	
৮. প্রতিক্রিয়া	

কাজের বিবরণ

(১) স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা-সূচক। যেমন—সাফাই, গোছগাছ করা, খে
স্বাস্থ্যচর্চা ইত্যাদি।

(২) বৌদ্ধিক—পড়াশুনা, লাইব্রেরীর কাজ, পরীক্ষা ইত্যাদি।

(৩) সাংস্কৃতিক—প্রার্থনা, সাহিত্য-রচনা, সঙ্গীত, অভিনয়, সাংস্কৃতিক ব
বিতর্ক আলোচনা-চক্র, পত্রিকা-প্রকাশ ইত্যাদি।

(৪) সেবামূলক কাজ—রোগীর পরিচর্যা, অতিথি পরিচর্যা, গ্রামসেবা ইত

(৫) সামাজিকতা—সমাজের সঙ্গে সংযোগ।

(৬) শিল্পকাজ—যে সব শিল্পকাজ করা হইবে।

(৭) কৃষি ও উদ্যান রচনা—

(৮) রান্নাঘরের কাজ—বাজার করা, বাসনমাজা, তরকারী কাটা, রান্ন
পরিবেশন করা ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the basic principles of Activity Method.
2. Write in brief the difference between the Activity Metho
Project Method.
3. Give an outline of records to be kept in an Activity school.

অষ্টম অধ্যায়
সংঘ-পদ্ধতি

এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া
একটি ছাত্রকে এক-এক ভাগ শিক্ষা করিতে দেওয়া হয়। তাহারা নানা
পড়িয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে এবং তাহার সারমর্ম লি
ফেলে। নির্দিষ্ট সময়ের পরে তাহারা একত্র হইয়া পরস্পরের অধীত
আলোচনা করে। এক-এক জন তাহার লেখার সারমর্ম পাঠ করে। অন্য
তাহা শুনিয়া ও আলোচনা করিয়া শিক্ষা করে। এইরূপে সকল ছাত্র সমগ্র বি
অল্প সময়ে শিক্ষা করিতে পারে। যেমন আকবরের ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য
এক জনকে আকবরের বাল্যজীবন ও সিংহাসন লাভ, রাজ্য বিস্তার ও সা
সীমা, শাসন-ব্যবস্থা, চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষা করিতে দেওয়া
উঁচু শ্রেণীতে এক-এক জন ছাত্রকে এক-এক জন রাজার ইতিহাস শিক্ষা ক
দেওয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ অংশ শিক্ষা করার পর সকলে
হইয়া পরস্পরের অধীত বিষয়ের বর্ণনা শ্রবণ করিবে ও আলোচনা কা

., সকল ছাত্র আকবরের সম্পূর্ণ ইতিহাস বা কোন বংশের অনেক রাজার |স পরস্পরের সহযোগিতায় অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা করিতে পারে।

ই প্রণালীতে শিক্ষাদানের সুবিধা এই যে, ছাত্রগণ স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের সঙ্গে পরস্পরের সাহায্যে বেশী শিক্ষা করিতে পারে এবং অন্যের সহিত গিতা করিয়া কাজ করিতেও শিখে। সহপাঠী অন্য ছাত্রদের সমক্ষে বর্ণনা ও চনা করিতে হইবে বলিয়া সকলে নিজ নিজ অংশ উত্তমরূপে শিক্ষার দায়িত্ব ক্ষ করে এবং তাহা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করে। সর্বোপরি ইহাতে সময় ও শক্তির মিতব্যয়িতা হয় এবং দ্রুত পাঠোন্নতি হয়। তবে সকল র শিক্ষা করিবার শক্তি সমান নয় বলিয়া তাহাদের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে অর্জিত অংশের জ্ঞান সমমূল্যের নাও হইতে পারে। কিন্তু এক এক জনের পরিবর্তে এক দল ছাত্রকে এক এক অংশ শিক্ষা করিতে ও তাহাদের অধীত বিষয় বর্ণনা ত দেওয়া হইলে ইহার প্রতিকার হইবে।

হা ছাড়া আলোচনার সময় বিষয় শিক্ষক উপস্থিত থাকিয়া ছাত্রের বর্ণনার জন মত সংশোধন ও অনুপূরণ করিলে এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইবে।

ংঘ-পদ্ধতি বিভিন্ন ভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে। যেমন—

১) কর্মশালা বা ওয়ার্কশপ পদ্ধতি (Work-shop Method)
২) সেমিনার বা আলোচনা চক্র (Seminer Method)
৩) প্যানেল আলোচনা (Panel discussion)
৪) প্রজেক্ট (Project) ইত্যাদি।

। **ওয়ার্কশপ পদ্ধতি বা কর্মশালা পদ্ধতি ঃ** কর্মশালা পদ্ধতি বলিতে কর্মভিত্তিক পদ্ধতি বুঝায়। উচ্চতর শ্রেণীতে কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের বিশেষ পাঠ, গবেষণা, সাহিত্য রচনা বা কাজের জন্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া। সাম্প্রতিক যুগের যৌথ পদ্ধতিতে কর্মশালা পদ্ধতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ ছে। অল্প সময়ের মধ্যে একটি বৃহৎ বিষয় একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর বোধগম্য একটি বৃহৎ সমস্যার সমাধান করা এবং বড় শ্রেণীর সকলের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণ।

ই পদ্ধতি এবং ইহার মূল লক্ষ্য সম্পর্কে জানা আবশ্যক। শ্রেণী-শিক্ষণে র্থীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপর সমধিক গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয় না। এই অসুবিধা রিবার উদ্দেশ্যেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কর্মশালা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। র্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের স্থান য়, তিনি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রয়োজনে সাহায্যকারী (resource person) ব থাকিবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা, আলোচনা র্যক্রম ঠিক করিয়া কাজ করিবে। কোথাও অসুবিধা ঘটিলে, অগ্রসর হইতে ারিলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবে। কর্মশালা পদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য সমগ্র দলের একজন মূল পরিচালক থাকিবেন, তাঁহাকে পরিচালক irector বলে। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য থাকিবেন কয়েক জন

পরামর্শদাতা (consultant)। শিক্ষার্থীদের লইয়া কর্মপরিষদ গঠিত হইবে, শিক্ষ
সেখানে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে থাকিবেন।

কর্মপরিষদের প্রথম সভায় শিক্ষক সমস্যাটির বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করিবে
বিভিন্ন দিক্ আলোচনার জন্য কয়েকটি উপদল গঠিত হইবে। উপদলগুলি নি
সমস্যা লইয়া আলোচনা করিবে, প্রয়োজন স্থলে বিশেষজ্ঞের সাহায্য লইবে
সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে। পরিশেষে কর্মপরিষদের বিভিন্ন সভায় উপদলগু
পরিচালকরা নিজ নিজ দলের সিদ্ধান্ত রাখিবেন। এইভাবে সকলেই মূল সমস্
তাহার সমাধানের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, উচ্চ-বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের কঠি
ব্যাপক বিষয়ের স্বয়ং শিক্ষণের ইহা একটি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। কেবল ব্যক্তি
শিক্ষণ নয়, দলগত শিক্ষণ বলিয়া তাহাদের দায়িত্ববোধ, পরমত সহিষ্ণুতা, সহযোগি
অনুসন্ধিৎসা ও বিচার-বুদ্ধি পরিণত হয়। সামাজিক জীব হিসাবে তাহার ব্যা
বিকশিত হইবার সুযোগ পায়।

আমাদের দেশে কিছু দিন পূর্বে বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্য রচনার জন্য এ
কয়েকটি সাহিত্য কর্মশালা অত্যন্ত সার্থক ভাবে আয়োজিত হইয়াছিল।

২। **আলোচনা চক্র বা সেমিনার** (Group discussion or Semina
বাহ্যত: সংঘ-পদ্ধতির বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহ
বহিরঙ্গ রূপ প্রায়শ:ই এক রকম। কিন্তু পদ্ধতি-ভেদে ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম পা
রহিয়াছে।

অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক সদস্য লইয়া যে আলোচনা-সভা, যদি কোন স
লইয়া গবেষণামূলক আলোচনা করে, তাহাকে সেমিনার বলে। আলোচনা-
এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ (resource person) উপস্থিত থাকিবেন। এ
প্রত্যেক সদস্য সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ চিন্তাধারা বলিবেন। সেমিনারে এ
সভাপতি ও একজন লেখক থাকিবেন। সভাপতি আলোচনাকে ঠিক
পরিচালিত করিবেন।

অন্য যে কোন পদ্ধতি অপেক্ষা এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে বেশী সজাগ, নি
প্রতি আস্থা ও যোগ্যতা দেখাইতে হইবে। যোগ্য পরিচালনা না হইলে এ
সাধারণ উদ্দেশ্যহীন আলোচনায় পর্যবসিত হয়। আলোচনা-পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষ
নিম্নলিখিত জিনিসগুলি মনে রাখিতে হইবে:

(১) শিক্ষক সর্বপ্রথম নিজেই নিয়মানুগ আলোচনার পথ পরিহার ক
স্বাভাবিক কথাবার্তায় পরিবেশ সৃষ্টি করিবেন।

(২) আলোচ্য বিষয়ের উপর কোন প্রশ্ন হইতে আলোচনা শুরু হইবে।

(৩) শিক্ষক আলোচনায় মানকে দলের উপযোগী রাখিবেন।

৩। **প্যানেল আলোচনা** (Panel discussion): যে কোন আকা
আলোচনা-সভাকে প্যানেল হিসাবে ব্যবহার করা চলে। দল খুব বড় হ
কথোপকথন পদ্ধতি ঠিক কার্যকর হয় না। সে ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কয়েক জন

য়টি সম্পর্কে আলোচনা করেন, অন্যেরা শোনেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বক্তাদের লোচনা শেষ হইলে শ্রোতারা প্রয়োজন হইলে প্রশ্ন করেন ও সেই প্রশ্নের ত্তিতে পুনরালোচনা চলে।

প্যানেল আলোচনার সুবিধা হইল :

(১) বড় দলের মধ্যে সার্থকভাবে আলোচনা পদ্ধতি অনুসৃত হয়।

(২) একটি বিষয়কে বিভিন্নভাবে ভাগ করিয়া এক-এক জন বক্তা তাঁহার নির্দিষ্ট শের মধ্যে আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখেন।

(৩) অল্প সময়ে পরিকল্পনামত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হয়। প্যানেল লোচনার সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলি মনে রাখা উচিত :

(ক) সভার সভাপতিই কেবল বক্তৃতা দিবেন। প্রারম্ভে সেদিনের আলোচ্য-য়য় সম্পর্কে ভূমিকা করিবেন।

(খ) সভার সদস্যগণ বিষয়ের বিভিন্ন দিক্ চিন্তা করিবেন, শুনিবেন তবে বক্তৃতার কারে অবশ্যই বলিবেন না। তৈরী করা বা লিখিত বক্তৃতা চলিবে না। বক্তারা হাদের নির্দিষ্ট বিষয় বা বিষয়াংশের উপর আলোচনা করিবেন।

(গ) শ্রোতারা যে সব প্রশ্ন করিবেন, বক্তাদের যাঁহার বক্তব্যের এলাকায় ড়, তিনি তাহার পরিষ্কার ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিবেন।

(ঘ) প্রত্যেক বিষয় বা বিষয়াংশের জন্য সময় নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(ঙ) প্যানেলের বক্তাগণ শ্রোতাদের দিকে ফিরিয়া বসিবেন। শ্রোতারা এবং হারা যেন পরস্পরকে দেখিতে পান।

৪। **ডেক্রলি পদ্ধতি (Decroley Method)** : এই পদ্ধতির প্রবর্তক লেন অভাইড ডেক্রলি (Ovide decroley) নামক একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ। নসিক রোগগ্রস্তদের জন্য তিনি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি এই নূতন পদ্ধতি চালু করেন।

ডেক্রলি পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়-জীবন যাপনের মধ্য াই শিক্ষা লাভ করিবে। বিদ্যালয়ের আদর্শ পরিবেশ হইল প্রাকৃতিক পরিবেশ ং এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা ভ করিবে। বিদ্যালয়ে জীবন যাপনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিবে। তাহারা াই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সমাজগত শিক্ষা লাভ করিবে। এই শিক্ষা পদ্ধতি পাঁচটি ত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত :

(১) শিশু একটি সজীব এবং পৃথক্ সত্তা। সে নিয়ত বৃদ্ধির পথে আগাইয়া চলে।

(২) সমাজের সদস্য বলিয়া তাহার বৃদ্ধি এমন ভাবে হইবে যাহাতে সে সমাজের যুক্ত রূপে গড়িয়া উঠে।

(৩) প্রত্যেকটি শিশু অন্যের চেয়ে পৃথক্।

(৪) বয়স অনুযায়ী শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য আলাদা। এই আগ্রহ ও সুক্যের ভিত্তিতে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৫) শিশুর সক্রিয়তা তাহার শিক্ষার পক্ষে সহায়ক। এই সক্রিয়তাকে সঠি ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে।

ডেক্রেলি পদ্ধতির বিদ্যালয়

(১) এই পদ্ধতির বিদ্যালয় আমেরিকার কর্মশালা বিদ্যালয়ের (Work shop Method) অনুরূপ। বিদ্যালয়টি যেন একটি প্রয়োগশালা বা ল্যাবরেটোরি এখানে বক্তৃতার স্থান থাকে না।

(২) এক একটি শ্রেণীতে ১৫/২০ জনের বেশী ছাত্র-ছাত্রী থাকে না। প্রত্যে দল বা ইউনিটকে একটি করিয়া বিষয় জানিয়া লিখিতে বলা হইয়া থাকে।

(৩) প্রত্যেকটি দল পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকিবেন।

(৪) শ্রেণীর এক একটি দল তাহাদের কাজ শেষ হইলে সমগ্র শ্রেণীর সম্মু তাহাদের লিখিত রিপোর্ট পেশ করিবে। রিপোর্ট পেশ করিবার সময় মানচিত্র চার্ট ইত্যাদি প্রদীপন ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৫) রিপোর্টটি সম্পূর্ণ বা উপযুক্ত বিবেচিত না হইলে ঐ দলকে পুনরায় ঐ অংশের কাজ করিতে হয়।

(৬) এইখানে প্রতিযোগিতার স্থান থাকে না। কোন ছাত্রকে ভাল বা ম বলা হয় না বা সেরূপ ভাবে পরীক্ষা ও অভিজ্ঞান-পত্র দেওয়া হয় না।

(৭) সহসা এই পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের একসঙ্গে পাঠ ও কাজকে বেশী গুরু দেওয়া হইয়াছে।

(৮) ডেক্রেলি পদ্ধতির বিদ্যালয়ে পরীক্ষায় নম্বর দেওয়া হয় না।

এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নততর বিকাশ ঘটে তাহারা সামাজিক হয়—এক সঙ্গে কাজ করার মত মানসিকতা অর্জন করে সহযোগিতা, সামাজিক সচেতনতা, যৌথ দায়িত্ববোধ ও সহিষ্ণুতা অর্জন করে।

৫। **আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি** (Heuristic Method) : এই প্রণালীতে শিক্ষ দিতে হইলে ছাত্রকে আবিষ্কারকের স্থানে স্থাপন করিতে হয় এবং তাহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া বা অনুসন্ধান করিয়া সত্য আবিষ্কার করিতে দিতে হয়। এই জন্য ইহাকে আবিষ্ক্রিয়া পদ্ধতি বলে।

ছাত্রকে একটা লৌহ দণ্ড, একটা কাঁচের দণ্ড, একটা পাথর দণ্ড, একটা মাপিবা যন্ত্র (scale) ও একটা স্পিরিট ল্যাম্প দেওয়া হইল। সে প্রথমোক্ত জিনিসগুলি দৈর্ঘ্য মাপিয়া লিখিয়া রাখিবে। তাহার পর স্পিরিটল্যাম্প জ্বালাইয়া উহার আগুনে সেইগুলি উত্তপ্ত করিয়া পুনরায় মাপিবে। ইহার ফলে সে দেখিবে যে, উত্ত করিবার পর প্রত্যেক জিনিস প্রসারিত হইয়াছে। সুতরাং সে সিদ্ধান্ত করিবে যে উত্তাপ সমস্ত জিনিসকে প্রসারিত করে। ইহা বলা বাহুল্য যে, আরোহী অবরোহী পদ্ধতিতে ছাত্রকেই এই পরীক্ষার সাহায্যে সিদ্ধান্ত লইতে হইবে। ইহার পর ছাত্র আরও যত বেশী সম্ভব জিনিস উত্তপ্ত করিয়া ও তাহারা প্রসারিত হইয়াছে কিনা দেখিয়া ইহার সত্যতা নির্ধারণ করিবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের উপকারিতা এই যে, ছাত্র নিজে পরীক্ষা করিয়া ন্ধান্ত করে বা সত্য আবিষ্কার করে বলিয়া জ্ঞান তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব হয় এবং াহার উদ্ভাবনী প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তবে ইহার বিরুদ্ধে এই আপত্তি হয় যে, কলের উদ্ভাবনী শক্তি থাকিতে পারে না। সেই শক্তি যাহাদের আছে তাহাদিগকে ত্য আবিষ্কারের পূর্বে আবিষ্কারক যে সব ভ্রম-প্রমাদ করিয়াছিলেন তাহার নরাবৃত্তি করিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্রকে পরীক্ষা করিতে দিলে সেই সকল ভ্রম-প্রমাদের সম্ভাবনা াকে না। কি সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে হইবে তাহার কিছুমাত্র আভাস দিয়া শিক্ষক ছাত্রকে ঠিকভাবে পরীক্ষা করিবার কার্যে সাহায্য করিতে পারেন। রীক্ষার ফল দেখিয়া ছাত্র সত্য বা নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারে।

৬। **অভিনয় পদ্ধতি** (Dramatic Method)ঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ন্য ছাত্রগণকে নানা মানুষ, পশুপক্ষী বা গুণ সাজিয়া শিক্ষণীয় বিষয়ের অভিনয় রিতে দেওয়া হয়। তাহাদের কথোপকথনের আচারেই শিক্ষণীয় বিষয়ের বর্ণনা ওয়া হয়। শিক্ষকের বর্ণনা শ্রবণ বা পুস্তক পাঠের পরিবর্তে ছাত্রগণ শিক্ষণীয় ষয়টির অভিনয় করিয়াই তাহা শিক্ষা করে। যথা—বাবরের ইতিহাস শিক্ষাদানের ন্য এক একজন ছাত্র বাবর, ইব্রাহিমলোদী, সংগ্রাম সিংহ, হুমায়ুন ইত্যাদি সাজিয়া ভিনয় করিতে পারে। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ভূগোল শিক্ষার জন্য এক এক জন াত্র এক এক জেলা সাজিয়া ও তাহাদের বর্ণনা দিয়া অভিনয় করিতে পারে। ততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, প্রভৃতি গুণ সাজিয়া অভিনয় করিয়া াত্রগণ নৈতিক শিক্ষা পাইতে পারে। আলো, বাতাস, খাদ্য, জল প্রভৃতি সাজিয়া ভিনয় করিয়া ছাত্রগণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে পারে।

অভিনয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে শিক্ষা ছাত্রের নিকট খুব ানন্দদায়ক হয় বলিয়া তাহারা উৎসাহের সহিত শিক্ষা করে। ইহাতে বিষয়টি াস্তব আকার ধারণ করে এবং সহজে বোধগম্য হয়। কোন বিষয়ে অভিনয়ের াকারে শিক্ষা করিলে তাহা ছাত্রের মনে গভীর রেখাপাত করে এবং বেশী দিন রণ থাকে। কিন্তু ইহাতে দ্রুত পাঠোন্নতি হয় না এবং অন্য শ্রেণীর কাজে ব্যাঘাত য়। সকল বিষয় এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তবে সময় সময় ছাত্রগণকে কান কোন বিষয়ে অভিনয় পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে শ্রেণী-পাঠনায় একঘেয়েমি দূর হইবে এবং শিক্ষাকার্য অধিকতর আনন্দদায়ক হইবে।

৭। **গবেষণা পদ্ধতি** (Source Method)ঃ বাস্তব উপাদানকে সূত্ররূপে রিয়া অজানা সত্যের দিকে ছাত্রকে চালিত করিতে হইবে। সেই উপাদানকে বশ্লেষণ করিয়া বা নূতনতর উপাদান সংগ্রহ করিয়া সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে ইবে। এখানে শিক্ষক ও ছাত্রের কাজ সমান। ছাত্র গবেষণা করিবে, উপাদান ংগ্রহ করিবে, পাঠাগারে ঐ সম্পর্কে পড়াশুনা করিবে—এইভাবে সূত্র হইতে নজের চেষ্টায় অনেক জানিয়া লইবে। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস ও বিজ্ঞান শিক্ষা াল হয়।

শিক্ষক ছাত্রদের লইয়া ইতিহাসখ্যাত কোন প্রাচীন নিদর্শন দেখিলেন। তাহার পর ছাত্ররা সেই নিদর্শন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিল, সেইযুগ সম্পর্কে পড়াশুনা করিল ইতিহাসের নিদর্শন হইতে শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠের সঙ্গে সংযুক্তি ঘটাইতে পারেন এই পদ্ধতি একটু উঁচু শ্রেণীর পক্ষে অধিকতর কার্যকর।

৮। **সক্রেটিস পদ্ধতি** (Socratic Method)**:** গ্রীস দেশের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটিস অন্য লোককে স্বমতে আনয়নের জন্য এক বিশেষ উপায় অবলম্বন করিতেন কোন লোক বিরুদ্ধ বা ভুলমত পোষণ করিলে তিনি প্রথমে তাহাকে চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিয়া তাহার মতের অসারতা প্রদর্শন করিতেন। তাহার পর অন্য প্রকার প্রশ্ন করিয়া তাহাকে প্রকৃত সত্যে বা ঠিক সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতেন। এই প্রণালীতে প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণকে কোন কোন বিষয় শিক্ষাও দেওয়া যায়। ছাত্রগণকে শিক্ষাদানের জন্য সকল সময় প্রথমোক্ত ভ্রম প্রদর্শক প্রশ্নের ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। তবে কোন ছাত্র মিথ্যা গর্বে স্ফীত হইয়া শিক্ষকের প্রদত্ত জ্ঞান গ্রহণ করিতে বা তাঁহার উপদেশ মত কাজ করিতে অবহেলা করিলে এইরূপ প্রশ্নের সাহায্যে তাহার অজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রয়োজন হইতে পারে। পথপ্রদর্শক বা উত্তর নির্দেশক (Leading) প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রের নিকট হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করিয়া বা তাহাকে ঠিক সিদ্ধান্তে লইয়া গিয়াই কোন কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। ইহাই সক্রেটিস পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বাহির হইতে কোন নূতন জ্ঞান দেওয়া যায় না।

তবে ধাত্রী যেমন মাতৃগর্ভ হইতে সন্তান বাহির করিয়া আনে, সেইরূপ শিক্ষকও সক্রেটিস প্রণালীতে চতুরতার সহিত প্রশ্ন করিয়া ছাত্রের ভিতর হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করে বলিয়া ইহাকে ধাত্রীর পদ্ধতিও (Midwife's Method) বলে।

এই প্রণালীতে কোন নূতন জ্ঞান দেওয়া যায় না বলিয়া ইহা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি তথ্যমূলক পাঠের উপযোগী নয়। প্রধানতঃ নৈতিক শিক্ষাদানের জন্যই এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। তবে কতকগুলি জ্ঞাত বিষয় হইতে নূতন সত্যে বা সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়ার জন্য সকল বিষয় শিক্ষায় ইহার ব্যবহার হইতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the salient featurers of Decroley Method.

2. Write short notes on—Panel discussion, Seminor Method, Workshop Method and Source Method.

3. What do you know about Heuristic Method ? How is teachin carried on by Heuristic Method ?

নবম অধ্যায়

বুনিয়াদী শিক্ষা

শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বর্তমান কালে সমাজতন্ত্রবাদকে লওয়া হইয়াছে। সামাজিক দর্শনের উপর শিক্ষার লক্ষ্য নির্ভরশীল। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন সমাজ দর্শনের অনুরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য নিরূপিত হইয়াছে। যেমন—ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ, চরিত্র গঠন, সমাজের উপযুক্ত নাগরিক তৈরী ইত্যাদি। বর্তমান যুগে একদিকে যেমন গণতন্ত্র অপর দিকে সাম্যবাদ প্রভাব বিস্তার করিতেছে এবং কাজে কাজেই শিক্ষাদর্শও অনুরূপ হইতেছে। বর্তমান যুগে শিক্ষার লক্ষ্য হইল ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মাধ্যমে শিশুকে সুনাগরিক রূপে গড়িয়া তোলা।

ভারতের সমাজের উপযোগী একটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন মহাত্মা গান্ধী, যাহা 'নঈ তালীম' নামে খ্যাত। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় স্বাবলম্বী ভারতীয় সমাজ বিপর্যস্ত, তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতি অবলুপ্ত। স্বাভাবিক কৃষি ও শিল্পের অবস্থা শোচনীয়। তৎকালীন চিন্তানায়করা রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক মান উন্নয়নের বিষয় চিন্তা করিলেন। গান্ধীজী এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত এক আদর্শ ভারতীয় সমাজ রচনার কল্পনা করিয়াছিলেন। যে সমাজ সত্য, অহিংসা ও প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে।

এই সমাজ রচনার বিষয় দীর্ঘদিন চিন্তা করিবার পর স্থির করিলেন, কেবলমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমেই এইরূপ সমাজ রচনা সম্ভব। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য তিনি ওয়ার্ধায় একটি শিক্ষা-সম্মিলন আহ্বান করিলেন। ১৯৩৭ সালের ২৩শে অক্টোবর ওয়ার্ধায় নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইল। সেখানে গান্ধীজীর প্রস্তাব বিশেষরূপে বিবেচনা করিবার জন্য ডঃ জাকির হোসেনের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করা হইল। এই সমিতি ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও গান্ধীজীর প্রস্তাব সম্পর্কে খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া ১৯৩৭ সালের ২রা ডিসেম্বর তাঁহাদের রিপোর্ট গান্ধীজীর কাছে পেশ করিলেন। এই রিপোর্টই ওয়ার্ধা পরিকল্পনা বা বুনিয়াদী শিক্ষা নামে খ্যাত। ব্রিটিশ সরকার স্থাপিত ১৯৪৪ সালের সার্জেণ্ট কমিশন সামান্য পরিবর্তিত আকারে বুনিয়াদী শিক্ষাকে ভারতের প্রাথমিক পর্য্যায়ের শিক্ষা হিসাবে সুপারিশ করেন। উত্তর স্বাধীনতা যুগে বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

১। **বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি**—সমগ্র জাতির জন্য সাত বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক আবশ্যিক শিক্ষা—এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে, সাত হইতে চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকাদের শিক্ষা অবৈতনিক ও আবশ্যিক হইবে। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজী বাদ দিয়া অন্য সমস্ত বিষয়ে ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীর সমান জ্ঞান দিতে হইবে।

২। **শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা**—এতদিন যে কেবল পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্যর্থতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, ইহাতে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে এক একটা হস্তশিল্পে শিক্ষাদানের এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য সমস্ত বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে জাকির হোসেন কমিটির বক্তব্য হইল, "নির্বাচিত শিল্প বা উৎপাদনাত্মক কাজ শিক্ষাগত সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ হইতে হইবে। এইটি সাধারণ কাজকর্ম ও আগ্রহের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে সম্পর্কিত হইবে এবং বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিবে। এই শিক্ষা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, কিছু কারিগর তৈরী, পরন্তু শিল্পকাজের সমস্ত সম্ভাবনাকে শিক্ষার কাজে লাগান।"

শিশুকে যন্ত্রের ন্যায় শিল্পটি শিক্ষা না দিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুদ্ধির সহিত তাহা শিক্ষা করিতে দিতে হইবে, যেন তাহার দ্বারা শিশুর মানসিক বিকাশের সাহায্য হয়। ইহা ছাড়া, যতদূর সম্ভব, সেই হস্তশিল্পের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিয়াই বিভিন্ন বিষয়গুলি শিক্ষা দিতে হইবে। বস্তুতঃ প্রথম হইতে এরূপ ভাবে একটা হস্ত-শিল্প শিক্ষা করিতে হইবে যেন পরে সে তাহা একটা বৃত্তি হিসাবেও গ্রহণ করিতে পারে।

৩। **স্বাবলম্বন**—গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা হইল স্বাবলম্বী শিক্ষা। আমাদের গরীব দেশে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করা দুষ্কর। যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা কিছু উপার্জন করে তাহা হইলে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হইল—অন্ন, বস্ত্র, আবাস। যদি শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের এই মূল সমস্যার সমাধান করা যায়, তাহার অপেক্ষা ভাল আর কি হইতে পারে।

পরবর্তী কালে এই সিদ্ধান্তের উপর অনেক আলোচনা হইয়াছে। বর্তমান কালে কাজের মাধ্যমে শিক্ষার নীতি সর্বজন-স্বীকৃত। সে কাজ সৃজনাত্মক হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু উৎপাদনাত্মক নীতি অনেকে অনুমোদন করেন নাই। এ বিষয়ে ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হইল :

"এই কথাও মনে রাখা দরকার যে, এই শিল্পকর্মের উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ আয় বিদ্যালয় পরিচালনার আংশিক ব্যয় নির্বাহে সমর্থ হইবে অথবা উৎপন্ন দ্রব্য ছাত্রদের দুপুরের খাবার বা স্কুলের পোশাক দিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।"

৪। **মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান**—শিক্ষার মাধ্যম হইবে মাতৃভাষা। ইহার অতিরিক্ত সর্বভারতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দুস্থানী শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে।

৫। **আদর্শ নাগরিক তৈরী**—আধুনিক ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মতবাদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই নবজাগ্রত গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী নাগরিক তৈরী শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

গান্ধীজী বুঝিয়াছিলেন, জনসাধারণের জীবন যাপন প্রণালীর উপর শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা নির্ভরশীল। গান্ধীজী একটি নূতন সমাজ গড়িতে চাহিয়াছিলেন। নূতন শিক্ষা-পদ্ধতিই এইরূপ পরিবর্তন আনিতে পারে যে শিক্ষাধারা নরনারীকে নূতন সমাজ-রচনায় দীক্ষা দিবে এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার বৈষম্য দূর করিবে। তিনি দেখিলেন দেশের দুর্দশার অন্যতম কারণ এদেশের গ্রামীণ শিল্পগুলির অবনতি। শিক্ষার মাধ্যমে এইসব শিল্পের পুনরুজ্জীবন, এইগুলির প্রতি অনুরক্তি ও নূতন ভাবে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতীয় সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল ইহার সংঘবদ্ধ জীবন। স্বাবলম্বন, সহযোগিতা, পারস্পরিক বুঝাপাড়া, ও তিতিক্ষার উপর সমাজবন্ধন নির্ভরশীল। শিক্ষার মাধ্যমে এইসব মানবিক গুণগুলির বিকাশ সাধন করা বুনিয়াদী শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য।

গান্ধীজী সমাজকে ধনের উপর নয়—শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে অনর্থক ধনসঞ্চয়ের ভয় থাকিবে না, অসাম্যও থাকিবে না। সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার প্রাথমিক কর্তব্য কায়িক শ্রম। এই শ্রম ও সেবার মাধ্যমে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ ঘটিবে ও পারস্পরিক লাভবান হইবে। কাজ করিবার ফলে পাঠও কাজের সংযোগে শিশুর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সহজতর হইবে এবং গ্রামসেবা, সাফাই, কৃষি, শিল্পকাজ, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগের ফলে জনসাধারণের মানসিক ও আত্মিক সম্মতি সাধিত হয়।

এ বিষয়ে ভারত সরকারের মত হইল—

"বুনিয়াদী শিক্ষানীতি বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিবিড়তর সংযোগ স্থাপন প্রয়াসী। এর লক্ষ্য এমন শিক্ষা, যার ফলে শিক্ষার্থী সমাজের প্রতি সংবেদনশীল ও সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব-সম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দুইটি কাজ করা হয়। প্রথমতঃ, বিদ্যালয়কে একটি সজীব ও সক্রিয় সমাজরূপে গঠন করার জন্য বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা করা ও দ্বিতীয়তঃ, ছাত্রদের বিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কাজে এবং নানাবিধ সমাজসেবার কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা। বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছাত্রদের স্ব-শাসন ব্যবস্থা। এভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাবলম্বন, সহযোগিতা, এবং পরিশ্রমের মর্যাদাবোধ জাগ্রত করে ও সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে একটি গতিশীল সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার সহায়তা করে।[১]

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি

যেমন তত্ত্বের, তেমনই পদ্ধতির দিক দিয়াও বুনিয়াদী শিক্ষা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে। শিক্ষার অর্থ কেবল বিদ্যাশিক্ষা নয়—সমাজের আদর্শ নাগরিক হিসাবে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনও শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাজেই পদ্ধতিও অনুরূপ হইয়াছে। সামাজিক সাম্য আনিতে হইলে সমাজকে শ্রমের

১ সমাজ উন্নয়নের ভূমিকা—শ্রীসন্তোষকুমার কুণ্ডু পৃঃ ১২৯

উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিদ্যালয়েও সেজন্য শ্রমমূলক কাজকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প।

পদ্ধতির দিক্ দিয়া বুনিয়াদী শিক্ষায় তিনটি ক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। এই তিনটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে। এই তিনটি ক্ষেত্র হইল :—

(১) শিল্প। (২) প্রাকৃতিক পরিবেশ। (৩) সামাজিক পরিবেশ।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধকরণের (correlation) নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শিল্পকাজের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন নৈপুণ্য বৃদ্ধি হইবে অন্য দিকে আত্মবিশ্বাস ও সৌন্দর্যজ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে। আবার ঐ শিল্পের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা সহজ হইবে।

বিদ্যালয় সমাজের একটি প্রতিষ্ঠান। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সংযোগ অতি নিবিড়। বিভিন্ন কাজকর্মের ভিতর দিয়া একদিকে যেমন শিশুর সামাজিক দিক্‌গুলির বিকাশ ঘটে, অন্য দিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ, কাজকর্ম, জীবিকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয় শিক্ষা দেওয়া চলে।

জ্ঞানরাজ্যের অনেক কিছুই আসে প্রকৃতির কাজ হইতে। দিবা রাত্রি, ঋতু পরিবর্তন, কুয়াশা, মেঘবৃষ্টি ঝড়, জলবায়ু, গরম শৈত্য, বৃক্ষলতা, পাতা, জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা চলে।

বর্তমান কালে একথা স্বীকৃত সত্য যে, কাজের মাধ্যমে শিক্ষা দিলে শিক্ষা সহজ হয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয় আসলে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কেন্দ্র।

এখন প্রশ্ন, শিশুকে কি কাজ দেওয়া হইবে? যে কোন কাজ হইলেই অবশ্য শিশুর চলিবে, কিন্তু তাহার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই। সেই কাজ লইতে হইবে যাহাতে বিষয়-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পুষ্টি হয়, কল্পনা ও বিচার-শক্তির বিকাশ ঘটে এবং কাজে নৈপুণ্য জন্মে।

এই সাধনের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বিভিন্ন রূপ কাজের পরিকল্পনা করা হইয়াছে। শিক্ষার অর্থ হইল শিশুকে সুনাগরিক রূপে তৈরী করা, ভবিষ্যত জীবনের উপযুক্ত করিয়া তোলা।

জীবনে পরিচ্ছন্নতার স্থান সর্বাগ্রে। স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য সব কিছু কমবেশী পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সেইজন্য পরিচ্ছন্নতাকে সর্বাধিক মূল্য দেওয়া হইয়াছে। শিশুরা যেমন বিদ্যালয় গৃহ ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখে, তেমনই গ্রাম-পরিবেশকেও সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। ফলে অত্যন্ত বাল্যকাল হইতেই পরিচ্ছন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি ঘটে ও অভ্যাসের মাধ্যমে সুন্দর মন গড়িয়া উঠে।

ভবিষ্যৎ জীবনে বিদ্যা ছাড়াও আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। জীবনের যে তিনটি মুখ্য প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র ও আবাস—ইহার সংস্থান করিতে শিখিতে হইবে। কৃষিকাজ শিখিবে—সুতাকাটা, কাপড় বোনা এবং আরও বিভিন্ন জিনিস তৈয়ার করিতে শিখিবে। জীবনে যা প্রয়োজন, তাহা সমাধানের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি চলিবে। প্রথম হইতে জীবন সংগ্রামে অভ্যস্ত হইলে মানুষ জীবন-সংগ্রামে অপরাজেয় ও কুশলী জীবন-শিল্পী হইয়া উঠিবে।

শিশুরা একত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে নানাবিধ কাজ করে: দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ, অলংকরণ, অনুষ্ঠান ও অভিনয় ইত্যাদি। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয়-শিক্ষা, ও নিজেকে প্রকাশ করা চলে, তেমনই সংগঠন, মঞ্চ-নির্মাণ, নিমন্ত্রণ-পত্র রচনা, অভ্যর্থনা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির ভিতর দিয়া দায়িত্ব ও সামাজিকতা-বোধ বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির নানারূপ বিরূপ সমালোচনা করা হইয়া থাকে। তাহার কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল। বস্তুতঃ পক্ষে অধিকাংশ সমালোচকই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির তাৎপর্য উপলব্ধি না করিয়াই সমালোচনা করিয়াছেন। আবার অন্য পক্ষে আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্যবিধ অনেক ভাল জিনিসের মতই বুনীয়াদী শিক্ষাও আন্তরিক প্রয়োগের অভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল। ফলে সমালোচকদের সুবিধাই হইয়াছে।

(১) কোন হস্ত-শিল্পের মাধ্যমে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। কোন শিল্পের মধ্যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। আবার কোন একটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে ক্রম অনুসারে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অনুবন্ধ প্রণালীর শিক্ষা সর্বোত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সম্বন্ধ স্বাভাবিক হইতে হইবে। অনেক ক্ষেত্রেই সম্বন্ধকরণ স্বাভাবিক হয় না।

ইহার উত্তরে বলা চলে বুনিয়াদী পদ্ধতিতে কেবল শিল্পের মাধ্যমে নয়, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া অনুবন্ধ প্রণালীতে প্রায় সব বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া চলে। যে বিষয়ে বা বিষয়াংশে কোন সমন্ধকরণ সম্ভব হইবে না, তাহা সাধারণভাবে পড়াইতে বাধা কোথায়?

(২) উৎপাদনাত্মক শিল্প শিক্ষার উপর অনেকে আপত্তি করিয়া থাকেন। কাজের মাধ্যমে শিক্ষানীতি আধুনিক যুগে বহুল ভাবে স্বীকৃত। সেই কাজ না হয় সৃজনমূলক হউক; কিন্তু বুনিয়াদী পদ্ধতিতে বলা হইয়াছে, যে কোন কাজ হইলেই হইবে না। সমাজ কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক শিল্প শিক্ষা করিতে হইবে। উৎপাদনাত্মক শিল্প অবশ্যই সৃজনমূলক, এবং শিশু যখন উৎপন্ন করিবে তখন তাহার আনন্দ বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনাত্মক হওয়ায় তাহার মনে কোন প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করিবে না।

(৩) সমালোচকদের তৃতীয় আপত্তি ইহার স্বাবলম্বন লইয়া। এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছে। প্রথম দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই স্বাবলম্বনের উপর অত্যধিক জোর দেওয়া হইয়াছিল। এখন অবশ্য তাহা দেওয়া হয় না। এখন শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ফলে জীবনে চলার পথে সব দিক্ দিয়া আত্মনির্ভরশীল হইবে—এই কথাই বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, সে দিক্ দিয়া অত্যুৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

(৪) অনুবন্ধ প্রণালীর অসম্পূর্ণতা বুনিয়াদী পদ্ধতির সমালোচনার অন্যতম বিষয়। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। যে সব ক্ষেত্রে সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না, জোর করিয়া সম্বন্ধিত শিক্ষা দিলে তাহা

যান্ত্রিকতায় পর্যবসিত হইবে। অনুবন্ধপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়াও সহজ নয়। কেব
শিক্ষণপ্রাপ্ত হইলেই হইবে না, উন্নত ধী-সম্পন্ন শিক্ষক হইতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধি
ক্ষেত্রে তেমন উন্নত ধী-সম্পন্ন শিক্ষক বেশী মিলে না। ফলে অযোগ্য শিক্ষকের হাত
অনুবন্ধ কষ্টকল্পিত ও অসম্পূর্ণ হইয়া উঠে।

(৫) বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রাম্য পরিবেশের উপযুক্ত করিয়া রচিত হইয়াছে
শহরের চাহিদা ও পরিবেশের উপযুক্ত উপাদান এখানে বেশী মিলে না।

(৬) গ্রাম্য কুটির-শিল্পের উপর এই শিক্ষা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হইয়াছে
কিন্তু উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ভারত দ্রুত যন্ত্রশিল্প এবং কলকারখানা প্রসারের নীতি
গ্রহণ করিয়াছে। যান্ত্রিক ও ভারী শিল্প প্রসারের ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষানীতিতে
পদ্ধতি কার্যকর নয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the main features of Wardha scheme.
2. Critically examine the Method of Basic Education.
3. Give an account of the major characteristics of Basic Educati
in India.

দশম অধ্যায়

সাঙ্গীকৃত পাঠ

(Correlated Teaching)

জ্ঞান এক এবং অখণ্ড। ইহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায় না। ইতিহা
তথ্য, বিজ্ঞানের তথ্য, ভূগোলের তথ্য আলাদা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের
মূলত: এক—ইহাদের মধ্যে সম্পর্ক রহিয়াছে। শিশুর কাছে এই সব তথ্যের
অর্থ নাই। সে যাহা শিখে, সমগ্রভাবে শিখে, আলাদা আলাদা তথ্য সে
উপলব্ধি করিতে পারে না, তেমনই ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও বুঝিতে পারে
আলাদা আলাদা ভাবে শিক্ষা দিলে তাহার গোলমাল হইয়া যায়। সেই
শৈশবের শিক্ষা হইবে অখণ্ড। শিখণের (Learning) একটি সূত্র হইল পুরা
অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া নূতন অভিজ্ঞতা আসে। কোন জ্ঞান নিরালম্বভা
আসে না। পুরাতনকে ভিত্তি করিয়া পুরাতনের সঙ্গে তুলনা করিয়া নূ
অভিজ্ঞতা আপনার স্থান করিয়া লয়। এই সম্পর্ক বা relation, ইহাই শিখ
মূলসূত্র।

শিশুদের কাছে এই সম্বন্ধের মূল্য সমধিক। শিশুরা তাহাদের পরিবেশ
চিনে। তাহারা খেলাধূলা ভালবাসে, ভালবাসে গড়িতে ও ভাঙ্গিতে। ই

বাহিরে তাহার অভিজ্ঞতা কম। কৌতূহলও বেশী নয়। নূতন কিছু শিক্ষা দিতে গেলে তাহার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে না। ফলে তাহার আগ্রহের উদ্রেক করে না এবং শিখিতেও পারে না। তাহার পরিচিত পরিবেশ যদি একটু বৃহত্তর হয় অর্থাৎ, তাহার পরিচিত পরিবেশের আবহাওয়ার মধ্যে যদি নূতন অভিজ্ঞতা দিবার ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে স্বাভাবিক আগ্রহের বশে শিশুরা তাহা শিক্ষা করে।

প্রচলিত শিক্ষায় শিখনের এই সূত্রটিকে উপেক্ষা করিয়া গতানুগতিক ভাবে পুস্তক-কেন্দ্রিক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টির ব্যবস্থা বা চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ফলে শিক্ষায় শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে না। অনেক সময় যান্ত্রিক ভাবে শিক্ষা করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুরা প্রাণান্তকর চেষ্টায় ইতিহাস, ভূগোল, মুখস্থ করে। তাহাদের কাছে এসব জানা অর্থহীন বলিয়াই এইগুলির প্রতি সে আগ্রহী হয় না।

শিক্ষার্থীর উপর এই কৃত্রিম নীতির প্রভাব দূর করিবার চেষ্টার ফল হিসাবে সম্বন্ধিত পদ্ধতি বা অনুবন্ধ প্রণালীর কথা বলা হইয়াছে।

অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির গতানুগতিক বিভাগ ঠিক রাখিয়াই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। তবে বিষয়গুলির মধ্যে যে মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান তাহা শিক্ষাদান কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়। যেমন, ইতিহাস পাঠের সময় ভূগোল, রাজনীতি ও সাহিত্যের সঙ্গে পাঠটির সম্পর্ক রাখিয়া ইতিহাসের মূলগত ঐক্য বিদ্যার্থীর কাছে পরিবেশন করিতে পারেন। অর্থাৎ একটি বিষয়ের পাঠ দিবার সময় প্রাসঙ্গিক রূপে অন্য বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা মূল বিষয়টিকে যেমন বুঝিতে সাহায্য করে, তেমনই আনুষঙ্গিক ভাবে অন্য অনেক বিষয়েরও পাঠ দেওয়া হয়। ইহার ফলে শিক্ষা কতকগুলি বিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্বন্ধহীন অভিজ্ঞতা না হইয়া অভিজ্ঞতাগুলির সমষ্টি হইয়া উঠে।

সাম্প্রতিক কালে সম্বন্ধকরণের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার ফলে শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক নীতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি সর্বাংশে সম্বন্ধিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

সম্বন্ধিত (correlated) পাঠের সঙ্গে সাঙ্গীকরণের (integration) প্রভেদ যতটা বিবেচনীয়, আসলে ততটা নয়। সাঙ্গীকরণ হইল কাজের সঙ্গে জ্ঞান বা বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন। আর সম্বন্ধিত জ্ঞানও একই ভাবে আসিবে। একটি বিষয় বা কাজকে অবলম্বন করিয়া আর এক বা একাধিক বিষয় বা কাজের সম্পর্কে জ্ঞান দান।

প্রজেক্ট পদ্ধতি, বুনিয়াদী পদ্ধতি এবং অন্যান্য কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে সম্বন্ধিত (correlated) এবং সাঙ্গীকৃত (integrated) শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধিত নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুনিয়াদী শিক্ষায় সম্বন্বিত পাঠ

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে সম্বন্বিত পাঠের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুনিয়াদী শিক্ষা প্রধানতঃ শিল্পকেন্দ্রিক। কোন মূল শিল্পকাজের সঙ্গে সম্বন্বিত করিয়া জ্ঞা অর্জিত হইবে। সাম্প্রতিক কালে আরও দুইটি ক্ষেত্রকে মাধ্যম রূপে স্বীকার কর হইয়াছে। সেইগুলি হইল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ। এ তিনটি ক্ষেত্র হইতে সহজেই জ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব হইবে। পূর্বে বল হইয়াছে শিশুর স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে কাজ লইয়া তাহার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে। সামাজিক পরিবেশ এবং শিশুর আগ্রহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত সৃজনমূলক কাজে সেই পরিবেশ গড়িয়া উঠে।

মূল শিল্প কৃষি বা উদ্যান রচনার সঙ্গে সে আবাল্য পরিচিত। শিশুদের প্রবণতা হইল কর্ম বা কাজ করা। তাহার সেই স্বাভাবিক কর্মপ্রিয়তাকে উদ্যান রচনার কাজে লাগান হইল। সে পরিকল্পনা করিবে, মাপজোপ করিয়া স্থান নির্বাচন করিবে, মাটি খুঁড়িবে, মাটির প্রকৃতি জানিবে। সার দিবে, সার সম্পর্কে জানিবে। বিভিন্ন বীজ বপন করিবে বা চারা রোপণ করিবে। গাছের পরিচর্যা করিবে। শেষে যখন সেই গাছে ফুল ফুটিবে বা ফল ধরিবে সেদিন তাহা আনন্দের আর শেষ থাকিবে না।

বাগানে কাজ করিবার সময় সে মাপিতে শিখিয়াছে, ক্ষেত্রফল প্রভৃতি অ শিখিয়াছে। জলবায়ু, উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদি ভূগোলও শিখিয়াছে। ফুল, ফল ও কৃ সম্বন্ধে অনেক কবিতা প্রবন্ধ পড়িয়াছে। ডাইরী লিখিয়াছে, কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে জানিয়াছে। কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে জ্ঞান আসিয়াছে। শিশু আনন্দের সঙ্গে শিখিয়াছে।

শিশুর প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করিতে গিয়া গাছ, পাতা, পাতার প্রকৃতি পাখী, পতঙ্গ, প্রজাপতি ইত্যাদি উদ্ভিদ ও জীবজগৎ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান এবং বৃষ্টি, রোদ, মেঘ, কুয়াশা, দিন-রাত্রি প্রভৃতি আলোচনার মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান জন্মে। পর্যবেক্ষণের পর সংগৃহীত উপাদান তথ্য সংযোগে শ্রেণীতে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত পঠন-পাঠনের মাধ্যমে জ্ঞান বিস্তৃত ও গভীর হয়।

সমাজ-জীবনের নানাবিধ কাজকর্ম—সাফাই, উৎসব অনুষ্ঠান, সেবামূলক কা ইত্যাদি এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিদর্শন ও আলোচনার ভিতর দি সমাজ-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা দেওয়া চলে।

ইহা হইল বিষয় শিক্ষার কথা। বাস্তব কাজ করিবার ফলে শিশুর দেহ ও ম সুস্থ ও সবল হইয়া গড়িয়া উঠে। জীবন সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান লাভ করে। আত্ম বিশ্বাস বাড়ে। তাহার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। প্রাপ্ত শিক্ষাও স্থায়ী হয়

সমাজীকৃত শিক্ষায় শিক্ষকের প্রস্তুতি

(১) শিক্ষক হইবেন সব পরিকল্পনার ও কাজের উৎস-স্বরূপ। সমস্যা সমাধানের উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা থাকিবে।

(২) সম্বন্বিত শিক্ষায় নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রতি আগ্রহ।

(৩) পরিচ্ছন্ন ও বৈজ্ঞানিক রীতিতে কাজকর্মের বিবরণ রাখা।

(৪) সাঙ্গীকৃত ও সম্বন্ধিত শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষকদের মধ্যে অভিজ্ঞতার আদান-
[প্রদা]ন।

সম্বন্ধকরণের প্রকৃতি

সাধারণতঃ তিন রকমের সম্বন্ধকরণ দেখা যায়। সেইগুলি হইল—

(ক) একমুখী সম্বন্ধকরণ (Unilateral correlation)

(খ) দ্বিমুখী সম্বন্ধকরণ (Co-lateral correlation)

(গ) বহুমুখী সম্বন্ধকরণ (Multilateral correlation)

(ক) **একমুখী সম্বন্ধকরণ:** যখন একটি কাজ, ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে [এক]টি বিষয় বা কাজের সম্বন্ধকরণ ঘটে, তাহাকে একমুখী সম্বন্ধকরণ বলে। অত্যন্ত [স্বাভা]বিক ভাবে যে বিষয় বা কাজ আসে, সেই বিষয় বা কাজের শিক্ষা এই [পর্যা]য়ে পড়ে।

যেমন কৃষির স্থান নির্বাচনের সময় ক্ষেত্রফল নির্ণয় প্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান [দান]। কেবল জ্ঞান লাভই নয়, পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞানকে স্থায়ী করিবার জন্য [ব্যা]পক অনুশীলনের ব্যবস্থা।

এই একমুখী সম্বন্ধকরণে প্রায়শঃই ভুল করা হইয়া থাকে। এই ধরণের পাঠে [বিশেষ]তঃ মনে রাখিতে হইবে:

(১) শিশুর অভিজ্ঞতা হইতে বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। পুস্তকের বিষয়-[বস্তু]র অনুরূপ কাজ নয়।

(২) বিষয় শিক্ষা দিলে হইবে না—স্বাভাবিক ভাবে বাস্তব শিক্ষা দিতে হইবে।

(খ) **দ্বিমুখী সম্বন্ধকরণ:** অনেক সময় একটি কাজ বা ঘটনার সঙ্গে [এক]াধিক বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। সেই কাজের সঙ্গে সহজেই সেই [দুই]টি বিষয়ের শিক্ষাদান করা চলে। সব সময় মনে রাখা দরকার সম্বন্ধকরণ হইবে [স্বা]ভাবিক (Natural)।

(গ) **বহুমুখী সম্বন্ধকরণ:** একটি কাজ, ঘটনা বা বিষয়ের সঙ্গে বেশ [ক]একটি বিষয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে বহুমুখী সম্বন্ধকরণ বলে। অনেক সময় শিক্ষা[সম্ভা]বনাপূর্ণ এমনি অনেক কাজের দেখা মিলে। তৎপরতা এবং কৌশলের সঙ্গে [ব্যব]হার করিলে বেশ সুফল ফলে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেজন্য শিক্ষকের [যথেষ্ট] প্রস্তুতির প্রয়োজন যথার্থ রূপে ব্যবহার করা না হইলে বহুমুখী সম্বন্ধকরণ বরং [গোল]ই দেয়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহুমুখী সম্বন্ধকরণ যথার্থরূপে [ব্যব]হৃত হয় না।

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টিকে পরিষ্কার করা যাক্। একজন শিক্ষক [ছাত্র]দের তকলিতে সুতা কাটার মাধ্যমে বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন। তকলিতে [সুতা] কাটিবার পর ঘটেরণে গুটাইয়া কত 'তার' সুতা হইল গুণিতে দিলেন। এবং [ই]হার মাধ্যমে পাটীগণিত শিক্ষা দিলেন। সুতা কাটা বিষয়ে একটি কবিতা [পা]ঠের ভিতর দিয়া ভাষা, তুলা হইতে পাঁজ তৈয়ার করিয়া সুতাকাটা হইয়াছে—

সেই সূত্র ধরিয়া তুলা উৎপাদক রাজ্য বোম্বাই সম্পর্কে ভূগোলের জ্ঞান, বিভি ধরণের তকলির আলোচনা প্রসঙ্গে তকলির ক্রমপরিণতির ইতিহাস এবং শে কার্পাস গাছ ও তকলির ছবি অঙ্কনের ভিতর দিয়া চিত্র-শিল্প শিক্ষা দিলেন শিক্ষক একটি শিল্পের সঙ্গে সম্বন্ধিত করিয়া পাঁচটি পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দিলেন। বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে সাঙ্গীকরণের এরূপ গোঁড়ামি চালু ছিল সাম্প্রতিক কালে সম্বন্ধকরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা হইয়াছে। সামাজি পরিবেশ ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে সাঙ্গীকরণ আরও স্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃ হইয়াছে। সম্বন্ধকরণে সব সময় মনে রাখিতে হইবে—সম্বন্ধকরণ হইবে স্বাভাবিক, জোর করিয়া টানিয়া নয়।

বহুমুখী সম্বন্ধকরণের ফলাফল : বহুমুখী সম্বন্ধকরণে যে পরিবেশ প্রয়োজন অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক তাহা রচনা করিতে সমর্থ হন না। সাধারণতঃ শিক্ষকে নির্দেশে ছাত্ররা শিল্পকাজ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের আগ্রহ থাক বা ন থাক। তাহা ছাড়া শিল্প কাজের সঙ্গে সম্বন্ধিত করিয়া যে জ্ঞান দেওয়া হই প্রায়শঃই তাহার ঠিক মত অনুশীলন হয় না। ফলে সেই বিষয়ের জ্ঞান গভীর ও স্থায়ী হয় না। কাজেই একটি কাজকে কেন্দ্র করিয়া বেশী বিষয় শিক্ষা দেওয়া অনেক সময় স্বাভাবিক হয় না।

সম্বন্ধিত পাঠে সতর্কতা : শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া বহুমুখী সম্বন্ধকরণে বিপদ সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হইয়াছে। সম্বন্ধিত করিবার সময় নিম্নলিখি বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(১) সম্বন্ধকরণ যেন স্বাভাবিক হয়। সম্বন্ধকরণের পর সেই বিষয়ে অনুশীলনে বা অভ্যাসের অভাব না ঘটে। ছাত্রদের আগ্রহ যেন বজায় থাকে।

(২) কাজের সময় স্বাভাবিক ভাবে যে সব জ্ঞান আসিবে সেইগুলির সদ্ব্যবহা করিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহার না করিলেও শিশুর জ্ঞানের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত করা উচিত নয়।

(৩) স্তর অনুযায়ী শিক্ষা। কোন কাজ বা ঘটনার সঙ্গে সম্বন্ধকরণের ফ দেখা যায় প্রাপ্ত জ্ঞান সর্বস্তরের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এক। যেমন, সামাজি পরিবেশ হইতে লওয়া স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। ইহার প্রস্তুতিপর্বে যদি স শ্রেণীতেই একই ভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস, বরেণ্য শহীদগণে কাহিনী, ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করা হয়, তা হইলে ঠিক হইবে না। শ্রেণীর মান অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচন ও আলোচন মান নির্ধারিত হইবে।

(৪) শিক্ষক-পরিকল্পিত হইলেও সম্বন্ধকরণে প্রধান ভূমিকা থাকিবে শিশুর তাহার প্রয়োজন ও তাহার আগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা অগ্রসর হইবে।

সাঙ্গীকৃত পাঠ

সাম্প্রতিক শিক্ষা-চিন্তায় সাঙ্গীকরণের প্রভাব অসামান্য। বিশেষ আলোচনা পূর্বে সাঙ্গীকরণের স্বরূপ সম্পর্কে কিছু আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে কতকগুলি বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান বাহরণের চেষ্টা করা হইয়া থাকে। ক্রম অনুসারে যুক্তিযুক্ত ভাবে এইগুলি ব্যবহৃত য়। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাচিন্তা তথা দ্ধতিরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শিক্ষা-প্রণালী গতানুগতিকতার পরিবর্তে র্থবহ অভিজ্ঞতাভিত্তিক হইয়াছে।

সাঙ্গীকৃত শিক্ষার স্বরূপ : সাঙ্গীকৃত শিক্ষা হইল সেই ক্রিয়া বা কাজ যাহার ারা শিশু কোন একটি বিশেষ কাজের মাধ্যমে অর্থবহ কোন জ্ঞান বা নৈপুণ্য অর্জন রে। এই নূতন জ্ঞান স্বাভাবিক অবস্থায় শিশু অর্জন করে। যাহার ফল সে ত্যক্ষ করে বা কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারে। সত্যকার শিক্ষার লক্ষ্য নির্দিষ্ট ও উদ্দেশ্য স্থির থাকা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে বিষয়গুলি আদপেই শিক্ষার লক্ষ্য য়, উপায় মাত্র।

সাঙ্গীকৃত শিক্ষার রূপ ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রচলিত। এ বষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি নাই। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে প্রয়োগ-পদ্ধতি ভিন্নরূপ ইতে পারে। সাধারণতঃ দুই প্রকারের পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে— ১) বিষয়মূলক ও (২) কর্মমূলক। বিষয়মূলক পদ্ধতি বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ াকিয়া অর্থবহ সমগ্রিক জ্ঞান রূপে বিষয় শিক্ষা দেয়। আর কর্মমূলক পদ্ধতি নজেকে বিষয়ের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া শিশুর দৈনন্দিন বাস্তব জীবন ইতে উদ্ভূত কোন সাম্প্রতিক সমস্যার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়া থাকে।

সাঙ্গীকৃত শিক্ষার প্রভাব : সাধারণতঃ চার রকমের পদ্ধতিতে সম্বন্ধিত শক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। (১) প্রজেক্ট পদ্ধতি, (২) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি, ৩) বিষয় পদ্ধতি ও (৪) কর্মপদ্ধতি। অবশ্য ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বড় কম এবং কে অন্যের সম্পূরক।

অনুবন্ধ প্রণালীর সুবিধা : (১) অনুবন্ধ প্রণালীর মাধ্যমে শিশু অখণ্ড জ্ঞান র্জন করে। ফলে সে যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা অখণ্ড এবং অবিভক্ত রূপ ারণ করে।

(২) পাঠ্যক্রমের যে কৃত্রিম বিভাজনের ফলে বিভিন্ন বিষয়ের আলাদা আলাদা াবে পাঠ দেওয়া হইয়া থাকে, অনুবন্ধ পদ্ধতির ফলে তাহা দূর হয়। একই বিষয়ের খণ্ড খণ্ড শিক্ষায় কখনও বাঞ্ছিত ফললাভ করা যায় না। অনুবন্ধ প্রণালীতে তাহা হয় না।

(৩) বিষয়ক্রমিক পাঠদানে পাঠ্য-বিষয় অনেক থাকে বলিয়া শিশুর কাছে তাহা ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। সভ্যতার অগ্রগতির ফলে পাঠ্যবস্তু ব্যাপক ও গভীর হইয়াছে। অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ফলে শিশুর উপর পাঠ্যবস্তুর অকারণ চাপ পড়ে না, এবং বিষয়গুলির মধ্যে এক ঐক্যসূত্র শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিভাত হয়।

(৪) পাঠ দানের সময় অনুবন্ধ প্রণালীতে একটি বিষয়কে সামগ্রিক জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে। নিছক ইতিহাস পাঠ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভূগোলের জ্ঞান না থাকিলে ইতিহাসের জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। কারণ কোন জাতির সম্পূর্ণ ইতিহাস

নিহিত থাকে সেই জাতির বৈশিষ্ট্য, জীবনধারণ পদ্ধতি, রীতিনীতি ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক প্রভাব ইত্যাদির মধ্যে। অনুবন্ধ প্রণালীতে ইতিহাস পাঠের সময় প্রাসঙ্গিক সব বিষয়ের আলোচনায় জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়। ইহাতে সামগ্রিক জ্ঞানার্জনে সময় ও শক্তি কম লাগে, পুনরুক্তি-দোষ বর্জিত হওয়ায় পূর্বাপর আগ্রহ বজায় থাকে। ইতিহাস পাঠকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশিষ্ট কবিতার অনুবৃত্তিও প্রাসঙ্গিক রূপেই শিক্ষা দেওয়া চলে। ফলে পাঠও যেমন সরস হয়, শিক্ষাও তেমনি ব্যাপক ও স্থায়ী হয়।

অনুবন্ধ প্রণালীর ত্রুটি : অনুবন্ধ প্রণালী অনেক প্রয়োজন সিদ্ধ করিলেও ইহার প্রয়োগের ত্রুটি অনেক সময় শিক্ষায় ব্যর্থতা আনে। ইহার অনেক ত্রুটিও রহিয়াছে ; যেমন—

(১) বিষয় বিভাজন এমন সুনিশ্চিত ভাবে করা হইয়াছে যে, সম্পূর্ণভাবে ইহাদের গণ্ডী অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়, এমন কি সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করা যায় না। কোন বিষয়ের আলোচনায় সময় প্রাসঙ্গিকরূপে অন্য বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করা গেলেও সেই সেই অন্য বিষয়গুলির জ্ঞান ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ ও স্তর অনুযায়ী দেওয়া যায় না। এবং এই প্রাসঙ্গিক জ্ঞানও ব্যাপক ও গভীর হয় না। কতকগুলি নীতির ভিত্তিতে বিষয় বিভাজন করা হইয়াছে। যেমন—কালানুসারে ইতিহাস, দেশগতভাবে ভূগোল, মানব-মনের চিন্তা ও রসানুভূতি অনুসারে সাহিত্যের বিভাগ করা হইয়াছে। ফলে প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্দিষ্ট সীমারেখা রহিয়াছে। অনুবন্ধ প্রণালীর দ্বারা এই সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বিষয়গুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রকৃত প্রস্তাবে সম্ভব হয় না।

(২) অনুবন্ধ প্রণালীতে বিষয়গুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপন সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় দেখা যায় প্রাসঙ্গিকতা-বর্জিত কষ্টকল্পিত অনুবন্ধ স্থাপনের চেষ্টা হইয়া থাকে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহা মোটেই কার্যকর হয় না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। বিদ্যাসাগর রাণীগঞ্জ অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, কাজেই বিদ্যাসাগর রচনার সঙ্গে কয়লা খনির সম্পর্ক স্থাপন বা তকলির ঘূর্ণনের সঙ্গে পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে সম্বন্ধকরণ আদপেই যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩) অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান সাধারণ শিক্ষকের পক্ষে সহজসাধ্য নয় দুই বা ততোধিক বিষয়ের মূল সূত্র অনুধাবন করা এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের দ্বারা সম্ভব। বিভিন্ন বিষয়ের প্রগাঢ় জ্ঞানসম্পন্ন, উন্নত বুদ্ধির প্রাজ্ঞ শিক্ষকই অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য।

প্রশ্নাবলী

1. What is correlation ? What are its merits and demerits ?
2. Describe the correlated method in Basic Education
3. Describe how correlation can be used to make lessons integrated to the learners.

একাদশ অধ্যায়

হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতি

(The five step method of Herbart)

শ্রেণীপাঠনায় শুধু পড়াদিয়া শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করাইলে বিষয়টি বোধগম্য হয় না। বিষয়বস্তুটি বুঝাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে। পেস্টালৎসী শিক্ষাদানকে মনস্তত্ব-সম্মত করিতে চাহিয়াছিলেন। জার্মান দার্শনিক হারবার্ট কয়েক স্তরের মধ্যদিয়া শিক্ষা দিবার কথা বলিয়াছেন। তিনি শিক্ষাদানকে মনস্তাত্বিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন। তিনি মনে করিতেন, শিক্ষা শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধন করিবে। শিশু প্রকৃতি ও সমাজ হইতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া থাকে এবং এই সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলির মাধ্যমেই শিশুর মানসিক বিকাশ হইয়া থাকে। হার্বার্ট পরিবেশের উপকরণগুলিকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রথমতঃ, প্রকৃতিতে যে উপকরণগুলি আছে, তাহাতে শিশুর অভিজ্ঞতা অর্জন হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, শিশুর সমাজের মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশু-মন সংবেদনশীল হয়। হার্বার্ট মানুষের মনের সহজাত ক্ষমতাতে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার কিছুই থাকে না। ধীরে ধীরে সে প্রকৃতি হইতে অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাহার মন সংবেদনশীল হয়। শিশুর মনে দুইটি ক্ষমতার উন্মেষ হয়। একটি হইল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়তঃ এই উপলব্ধিগুলিকে নিজস্ব করিয়া লইবার ক্ষমতা। পুরাতন অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিগুলির সাহায্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ হইতে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব। পুরাতনের সাহায্যে নূতনকে জানিবার নীতিই হইতেছে হার্বার্টের শিক্ষানীতি।

পঞ্চসোপান পদ্ধতির মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি:

শিক্ষালাভের জন্য শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জার্মান দার্শনিক হার্বার্ট পাঠদানের জন্য তাঁহার **পঞ্চসোপান পদ্ধতির** সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মতে ছাত্রের শিক্ষা-কাজকে প্রথমে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) **মনঃসংযোগ** এবং (২) **চিন্তন**। মনঃসংযোগ দ্বারা শিশু কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে এবং চিন্তনের সাহায্যে তাহা বিশ্লেষণ করে, সুশৃঙ্খল করে, তাহা হইতে সিদ্ধান্ত করে এবং সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ করে। হার্বার্ট মনঃসংযোগ কার্যকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন—(১) **উপলব্ধি** ও (২) **তুলনা**। তিনি চিন্তন কার্যকেও পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন—(১) **সিদ্ধান্ত করা** বা সূত্র-গঠন এবং (২) **তাহার প্রয়োগ**। হার্বার্টের পরবর্তিগণ উপলব্ধির কাজকে পুনঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) **প্রস্তুতিকরণ** বা সূচনা ও (২) **জ্ঞানদান**। এইরূপে পাঠদানের পাঁচটি সোপানের সৃষ্টি হয়:—

(১) **প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা** (Preparation or Introduction),

(২) জ্ঞানদান বা উপস্থাপন (Presentation)
(৩) তুলনা (Association),
(৪) সিদ্ধান্ত বা সূত্রগঠন (Generalisation) এবং
(৫) প্রয়োগ (Application).

নিম্নে প্রত্যেক সোপানের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল।

(১) প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা (Preparation or Introduction)—পাঠদানের প্রথম সোপানে ছাত্রদের মনকে পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়। ছাত্রদের ঐ বিষয়ে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতে হয়। সামান্য জানা থাকিলেও উহাকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ প্রশ্ন করিয়া ছাত্রদের মনকে নূতন পাঠের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা দরকার। আগ্রহ সৃষ্টি করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করিয়া এবং সমবেক্ষণ মণ্ডল জাগ্রত করিয়া নূতন জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। পূর্বে যে পাঠ শেষ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরের পাঠের সম্পর্ক থাকে। ঐরূপ অবস্থা হইলে পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা সহজ হয় এবং নূতন পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও কষ্টসাধ্য হয় না। কিন্তু যদি সম্পূ নূতন বিষয়ের অবতারণা করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ বিষয়বস্তুর সংশ্লিষ্ট বিষা পরিক্রমা করিয়া আগ্রহ সৃষ্টিসূচক প্রশ্ন করিয়া নূতন পাঠে উপস্থিত হইতে হয় প্রস্তুতিকরণ বা সূচনার শেষভাগে নূতন পাঠ ঘোষণা করা প্রয়োজন, উহাতে যোগসূত্র রক্ষিত হইবে। নূতন পাঠের সকল অংশের সহিত পূর্বজ্ঞান স্থাপন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিলেই চলিবে। প্রস্তুতিকরণ খুব দীর্ঘ হইবে না।

(২) নূতন জ্ঞানদান বা উপস্থাপন (Presentation)—ইহা হইল দ্বিতীয় সোপান। এই সোপানে শিক্ষক ছাত্রগণকে নূতন জ্ঞানদান করিবেন। শিক্ষক বিষয়বস্তুকে কয়েকটি শীর্ষে বিভক্ত করিয়া ছাত্রদিগকে ব্যাখ্যা করিয়া বলিবেন। ছাত্র-ছাত্রীগণ যে কেবল নীরব শ্রোতা হইয়া শিক্ষকের ব্যাখ্যা শুনিবে তাহা নয়। তাহারা শিক্ষকের পাঠদানে সক্রিয়ভাবে অংশ লইবে। শিক্ষক মহাশয় ব্যাখ্যা করিবার সময় মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করিবেন, ছাত্র-ছাত্রীগণ সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিবে। প্রশ্নগুলির মধ্যে পারম্পর্য থাকিবে। ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আছে কিনা শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। যদি শ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী পাঠ বুঝিতে না পারে, তাহা হইলে শিক্ষক পুনরায় তাহা ভালভাবে বুঝাইয়া দিবেন। এক এক শীর্ষ শিক্ষা দিবার পর প্রশ্নের সাহায্যে তাহার পুনরালোচনা করা প্রয়োজন এবং সম্ভব হইলে সারাংশ গঠন করাও আবশ্যক।

পাঠ উপস্থাপনের সময় পাঠকে সরস ও বাস্তব করিবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রদীপন ব্যবহার করিতে হইবে। এইরূপে সমগ্র বিষয়টি ছাত্রকে শিক্ষা দিতে হইবে। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনামূলক পাঠেই এই প্রণালী অনুসৃত হইবে। অন্যান্য বিষয় পাঠদানকালে পদ্ধতি ভিন্ন রূপ হইবে। সাহিত্যের পাঠে

প্রথমে শিক্ষক আদর্শ পাঠ দিবেন, তাহার পর ছাত্রদের পাঠ, শব্দার্থ গঠন, মর্মার্থ গ্রহণ হইবে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য ছাত্র-সহযোগিতা লইতে হইবে। গণিতের পাঠে শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতায় বোর্ডে কয়েকটি অঙ্ক করিয়া দেখাইবেন। পর্যবেক্ষণের পাঠে শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্ররা নিজেরা পর্যবেক্ষণ করিয়া জ্ঞান আহরণ করিবে। বিজ্ঞানের পাঠে পরীক্ষার সাহায্যে সত্য আবিষ্কার করিতে দিতে হইবে।

(৩) **তুলনা** (Association)—এই সোপানে ছাত্রের পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের তুলনা করিতে হইবে। আসলে এই তুলনা একটি মানসিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার ফলে নূতন জ্ঞান নিজের স্থান করিয়া লইবে। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই তুলনার কাজ ছাত্রেরাই করিবে। কিন্তু প্রশ্নের সাহায্যে দুই বিষয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন মাত্র। নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে সকল সময় বিস্তারিত তুলনা করা সম্ভব হই'ব না। তাহা ছাড়া অনেক সময় একই পাঠে বিস্তারিত তুলনা করার সময়ও পাওয়া যাইবে না। সেই সকল ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সোপানে নূতন জ্ঞানদানের সময়েই পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয়ের সহিত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

(৪) **সিদ্ধান্ত বা সূত্রগঠন** (Generalisation)—এই সোপানে নূতন জ্ঞান হইতে ছাত্রকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে বা একটা সূত্র গঠন করিতে হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পাঠে কোন সূত্র-গঠনের প্রয়োজন হয় না। সেই সকল ক্ষেত্রে এই সোপানে দ্বিতীয় সোপানে প্রদত্ত জ্ঞানের পুনরালোচনা করা যায়। ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সূত্রগঠন বা পুনরালোচনা ছাত্রেরই কাজ। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদিগকে এই সূত্র-গঠনে সাহায্য করিবেন বা তাহাদের নিকট হইতে পূর্বপ্রদত্ত জ্ঞান আদায় করিবেন। অবশ্য শিক্ষক তাহা ঠিক আকারে ও ভাষায় লিখিয়া দিতে পারেন।

(৫) **প্রয়োগ** (Application)—এই সোপানে নূতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিতে পারিয়াছে কিনা পরীক্ষা করিতে হইবে। যে সূত্র গঠন করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে কোন কাজ করিতে দিলেই নূতন জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে। সুতরাং গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়েই সূত্র-গঠন ও তাহার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে। ভূগোল শিক্ষাদানের সময় ম্যাপ আঁকিতে দিলেও প্রদত্ত জ্ঞানের প্রয়োগ হইবে। সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের পাঠে সূত্র-গঠন সম্ভব নয়, তবে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করিতে দেওয়া যায়। যেমন—সাহিত্যের পাঠে যে সকল নূতন শব্দ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাদের ব্যবহার করিয়া বাক্য রচনা করিতে দেওয়া যায়। ইতিহাসের পাঠে প্রশ্নের দুই একটি উত্তর করিতে বা লিখিতে বলা যায়।

পঞ্চসোপান পদ্ধতির সমালোচনা—

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় শিক্ষার সময়ে শিশু যে মানসিক কাজ করে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি করা হইয়াছে। সুতরাং

ইহাকে পাঠদানের একটা প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিতে হইবে। তথাপি ইহার **কতকগুলি দোষ** আছে। যেমন—(১) হার্বার্টের মতে শিশুর মন ফাঁকা বা শূন্য থাকে, **বাহির হইতে যে জ্ঞান দেওয়া হয় কেবল মাত্র তাহারই প্রভাবে মনের বিকাশ হয়, এই ধারণার উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চসোপান পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল**; কিন্তু এখন উক্ত ধারণা ভুল বলিয়া স্থির হইয়াছে। বর্তমানে মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মত এই যে, বংশগতির ফলেই শিশু তাহার মানসিক শক্তি লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা তাহার বিকাশ করা যায় মাত্র, তাহাকে নূতন শক্তি দেওয়া যায় না। তবে ইহার দ্বারা উক্ত পদ্ধতির মূল্য নষ্ট হয় না। কারণ, শিশু যে শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তাহার সম্যক্ বিকাশ না হইলে তাহার মূল্য নাই এবং জ্ঞানলাভের বা শিক্ষালাভের ফলেই তাহার সম্ভবমত বিকাশ হইতে পারে।

(২) **সোপানগুলি যে ক্রমে সাজান হইয়াছে, শিশু সকল সময় ঠিক সেই ক্রমে শিক্ষা করে না।** যেমন—নূতন জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সহিত পূর্বজ্ঞানের তুলনা হয়, তাহা স্থগিত রাখা যায় না এবং তাহার জন্য স্বতন্ত্র সোপান করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, জ্ঞানদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় তুলনা করিবার কোন বাধা নাই, যখনই সম্ভব পুনঃ বিস্তারিত তুলনার জন্যই স্বতন্ত্র সোপানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেইরূপ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্তও করে, তুলনা করিয়া সিদ্ধান্ত করে না; কিন্তু বলা যায় যে, পূর্বজ্ঞানের সহিত তুলনা করিয়াই নূতন জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং বিষয়টি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করার পূর্বে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়াই শ্রেয়।

(৩) **পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুযায়ী সকল বিষয়ে পাঠ দেওয়া যায় না** এবং অনেক বিষয়ের পাঠে সমস্ত সোপানগুলির ব্যবহার করা যায় না। কিন্তু দেখা যাইবে যে, প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠে প্রথম সোপানের ব্যবহার হয়; বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী দ্বিতীয় সোপানের পরিবর্তন করিবার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে; তাহা করা হইলে প্রায় সমস্ত পাঠেই তাহারও ব্যবহার করা যাইবে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম সোপানেরও প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা যায়। সমস্ত পাঠেই যে পাঁচটি সোপানের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। যেমন—বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য সাধারণতঃ পঞ্চসোপানের ব্যবহার করা যায় না। বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী সোপানগুলির পরিবর্তন করিয়া যতগুলি সোপান ব্যবহারের প্রয়োজন হয় ততগুলি সোপানে ব্যবহার করা যাইবে। বর্তমানে পাঁচটি সোপানের পরিবর্তে তিনটি সোপান ব্যবহৃত হইতেছে। যথা—প্রস্তুতিকরণ বা সূচনা, জ্ঞানদান বা উপস্থাপন এবং প্রয়োগ। উপস্থাপনের মধ্যে তুলনা আর প্রয়োগের মধ্যে সিদ্ধান্তের সংযোজন ঘটিয়াছে।

(৪) **ইহাতে পাঠে শিক্ষকের এবং ছাত্রের কার্য নির্দিষ্ট করা হয় নাই।** কিন্তু সোপানগুলির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, বিভিন্ন সোপানে এই কার্য বিভাগ করা বিশেষ কঠিন নয়।

(৫) পাঠদানের জন্য কোন একটা কার্য-পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার বিরুদ্ধে এই আপত্তি হয় যে, **ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা কমিয়া যায় এবং সমস্ত পাঠগুলি যেন এক ছাঁচে ঢালা হয়।** কিন্তু পঞ্চসোপান-পদ্ধতি কেবল পাঠের কাঠামোটা যোগায়, শিক্ষক তাহা প্রয়োজনমত পূরণ ও পরিবর্তন করিতে পারেন ; সুতরাং ইহাতে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্ব হয় না। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করিয়া ইহার ব্যবহার করিলে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠগুলি এক ছাঁচে ঢালা বলিয়াও বোধ হইবে না। ইহা ছাড়া কেবলমাত্র যে পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে পাঠ দিতে হইবে তাহা নয়, বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ততানুযায়ী অন্যান্য পদ্ধতিরও ব্যবহার করা যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

অনুশীলন পদ্ধতি

(Drilling Method)

শিখন ক্রিয়াটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। কোথাও শিক্ষার্থী হঠাৎ উপলব্ধির দ্বারা বিষয়টি উপলব্ধি করে। আবার কোথাও বার বার অনুশীলনের দ্বারা বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করে। থর্নডাইকের মতে Law of Exercise অর্থাৎ অভ্যাসের সূত্র একটি বিশেষ শিখন প্রক্রিয়া। গেস্টল্ট মতবাদীরা অবশ্য এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে মনে করেন না।

সাধারণ বিদ্যালয়ে প্রায়শঃই অনুশীলন করান হইয়া থাকে। অনেক সময় শিক্ষকদের কাছে এইটি কেবলমাত্র পুরাতন পাঠের অভ্যাসরূপে ব্যবহৃত হয়। ফলে অনেক সময় এই পদ্ধতির যথার্থ প্রয়োগ হয় না। অনুশীলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঠিক না থাকিলে ফললাভের আশা সুদূরপরাহত। এই পদ্ধতির যথার্থ মূল্য না জানায় ইহার ঠিকমত ব্যবহার করা হয় না।

শিক্ষা ও শিক্ষণকার্যে অনুশীলনের প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা

কোন কাজে নৈপুণ্য ও অধীত জ্ঞানের সার্থক গ্রহণের জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। এমন কি মনোবিজ্ঞানের মতেও শিক্ষার্থীর আগ্রহ অনুযায়ী ঠিকমত অভ্যাস জ্ঞানার্জনে সহায়তা করে। মানুষ যেমন শিখে, ভুলেও তেমনি। সেইজন্য শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে অনুশীলন অত্যাবশ্যক। অঙ্ক, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সময়পঞ্জী, ড্রইং ইত্যাদি মনে রাখিতে হইলে বার বার অভ্যাস করিতে হয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনুশীলনের বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতি অনুসৃত হইয়া থাকে। সাধারণপক্ষে অবশ্য পুনরুক্তির উপরেই জোর দেওয়া হইয়া থাকে। সত্যকার অনুশীলন অবশ্য আগ্রহ, প্রয়োজন এবং বুঝাপড়ার উপর নির্ভর করে।

অভিজ্ঞ শিক্ষকরা জানেন গণিতের সূত্র, ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী, ভূগোলের তথ্য, সুন্দর হস্তলিপি, স্বচ্ছ পাঠ, অঙ্কন, ক্রীড়ায় নৈপুণ্য ইত্যাদির জন্য যথোপযুক্ত অনুশীলন প্রয়োজন। এই সব নৈপুণ্য ও জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুশীলন পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ আবশ্যক। প্রায়শঃই শিক্ষকেরা শিক্ষণের দ্বিতীয় নীতি অর্থাৎ পুনরুক্তির উপর গুরুত্ব দেন। অন্য নীতিগুলি অবহেলিত হয়। সার্থক পুনরুক্তি অনুশীলনকে সীমিত, আগ্রহী ও প্রয়োজনসিদ্ধ করে।

অভ্যাস পাঠের উদ্দেশ্য : অভ্যাস পাঠের উদ্দেশ্য হইল শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় বিশেষ নৈপুণ্য বা জ্ঞানের সমীকরণ। তথ্য জ্ঞানের জন্য অভ্যাস ছাড়া আরও বিভিন্ন পদ্ধতি রহিয়াছে। সামগ্রিক ভাবে বিষয় বা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব না দিয়া কেবল কোন কিছু বুঝার জন্য অভ্যাস অনর্থক কালক্ষেপ মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলনের প্রকৃত কার্যকারিতা সম্পর্কে অবহিত না হইয়া জ্ঞান বা নৈপুণ্য অর্জনের জন্য অযথা ইহার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহার কারণ শিক্ষক উপলব্ধি অপেক্ষা স্মরণের উপর বেশী জোর দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ জানার পদ্ধতির উপর শিক্ষক বেশী গুরুত্ব দেন না। যে ভাবেই হউক জানা হইলেই হইল। যেমন—গণিতের কোন অঙ্ক এবং ইতিহাসের ঘটনা প্রায় একই সঙ্গে অভ্যাস করান হইয়া থাকে। ইহাদের ব্যবহার, অর্থ, প্রয়োজন ইত্যাদির উপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে কেবল ঘটনা বা তথ্য মুখস্থ করার জন্যই অভ্যাসের প্রয়োজন, প্রয়োগের জন্য নয়।

অবশ্য বিশেষ অংশের জন্য বিচ্ছিন্নভাবে অভ্যাসের প্রয়োজন হয়। যেমন—ভুল সংশোধন। বড় কাজে অভ্যাস স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে উদ্বোধিত করে।

কিন্তু কেবলমাত্র অন্ধভাবে পুনরুক্তি করিলে বা অভ্যাস করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যাইবে না। বুদ্ধি সংস্রব বর্জিত অবস্থায় যান্ত্রিকভাবে অভ্যাস করিলে কোন ফল হইবে না—যদিনা, কার্য, কারণ ও সম্বন্ধ জানা যায়। এইরূপ অভ্যাস উদ্দেশ্যহীন, অবুদ্ধি-সঞ্জাত ও বৃথা। শিক্ষকের সুকৌশল নির্দেশেই অভ্যাসকে কার্যকর করা সম্ভব।

অভ্যাসকে কার্যকর করিবার উপায় : অভ্যাস উদ্দেশ্যমূলক ও বুদ্ধিযুক্ত হইবে। শিক্ষার্থী জানিবে বিষয়টি কি এবং তাহাকে কি শিখিতে হইবে, ভুল হইলে কি ভাবে সংশোধন করিতে হইবে। অসুবিধা বা ভুল সম্পর্কে সে অবহিত হইবে। ঠিক পথে অর্থ বুঝিয়া অভ্যাস করিলে অল্প সময়ে সে লক্ষ্যে পৌছাইতে পারিবে। উত্তম অনুশীলন হইল বুদ্ধিযুক্ত ও ব্যক্তিগত।

সাম্প্রতিক কালে অভ্যাস সম্পর্কে অনেক পরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে, সমগ্র বিষয়ের অভ্যাসই অংশের অভ্যাস অপেক্ষা বেশী কার্যকর। রুটিন অনুযায়ী দীর্ঘ সময়ের অভ্যাস অনেক সময় অনাগ্রহ সৃষ্টি করে। তাই অল্প সময়ের জন্য বারে বারে অভ্যাসের ব্যবস্থা করা ভাল। নূতন জ্ঞানের সঙ্গে অভ্যাসকে যোগ করা বিধেয়।

যদি সত্যকার পরিকল্পনা দিয়া শিক্ষার সঙ্গে অভ্যাসকে যোগ করা হয়, তাহা হইলে হয়তো বর্তমানের মত দীর্ঘকালব্যাপী যান্ত্রিক অভ্যাসের প্রয়োজন হয় না। সত্যকার অনুশীলন হইল বুদ্ধিধৃত, আগ্রহসঞ্জাত এবং সার্থক অভ্যাসযুক্ত।

শিক্ষা-বিষয়ে অভ্যাস: বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অভ্যাসের বিষয় সম্পর্কে বিরোধ দেখা যায় না। গণিত, ভাষা, হস্তাক্ষর ও বানান অভ্যাসের দিকে সাধারণতঃ জোর দেওয়া হইয়া থাকে। এইগুলির অভ্যাস সাধারণতঃ অত্যন্ত গতানুগতিক ভাবে হইয়া থাকে এবং বিষয়গুলিকে আগ্রহসম্পন্ন করিবার চেষ্টা খুব কমই হইয়া থাকে।

সাম্প্রতিক কালে এই অভ্যাসকে সহজ ও সংক্ষিপ্ততর করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া স্বাভাবিকভাবে অভ্যাস ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজ করিবার সময় বিষয়-পাঠের অভ্যাস সম্পর্কে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি থাকিবে এবং সে বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট থাকিবে। অভ্যাস পাঠে সব সময় ব্যক্তিগত মনোযোগের প্রয়োজন। বাস্তব প্রয়োগমূলক কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত অভ্যাস সহজতর হয়।

বর্তমান কালে অনেক বিদ্যালয়ে এই সব বিষয়ের বিশেষ অনুশীলন কমাইয়া সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিষয়-শিক্ষার প্রবণতা লক্ষিত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু অবশ্য-স্বীকার্য যে, প্রাসঙ্গিক শিক্ষা খুব বেশী কার্যকর নয়। তাহার চেয়ে সুপরিকল্পিত কাজের ভিতর দিয়া অভ্যাস কার্যকর।

কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে অভ্যাস-পাঠ: কোন সমস্যা, প্রজেক্ট বা কাজ অভ্যাসের মাধ্যমে সার্থকতা লাভ করে। যদি গণিত, ব্যাকরণ, বানান, পাঠ ইত্যাদি মূল বিষয় ভালভাবে অধিগত না হয় তাহা হইলে বড় প্রজেক্ট ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না।

এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে নৈপুণ্য বাড়ে। কাজের নৈপুণ্য, গতি অনেকাংশে অনুশীলনের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিক অভ্যাসের দ্বারা গণিতের বিভিন্ন পদ্ধতির নৈপুণ্য জন্মায়। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, ভগ্নাংশ ইত্যাদি অভ্যাসের মাধ্যমে নির্ভুল ও সহজভাবে কষিতে শিখে। রচনা লেখা বা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এইরূপ হয়। তবে এই সব ক্ষেত্রে সমস্যামূলক বিভিন্ন কাজের ভিতর দিয়া অভ্যাস করা চলে। এইরূপ অভ্যাস সাধারণপক্ষে ব্যক্তিগত পাঠের পর্যায়ভুক্ত।

অভ্যাস-পাঠকে আগ্রহসম্পন্ন করিবার উপায়: সাধারণতঃ দুইটি উপায়ে অনুশীলনে আগ্রহ আনা যায়। (১) পরোক্ষ ও (২) প্রত্যক্ষ পদ্ধতি। প্রথমটিতে ছাত্রদের মনে বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা জাগরূক করা, যাহাতে সে বুঝিতে পারে ভালভাবে জানার জন্য অনুশীলন অত্যাবশ্যক এবং পরেরটি শিক্ষক নিজের চেষ্টায় বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োগ করেন। অনেকে বলেন, আগ্রহ না জন্মাইলেও প্রকৃষ্ট উপায়ে অভ্যাস-পাঠ সম্ভব। তবে একথা মনে রাখা ভাল, যে কোন পদ্ধতিই হউক শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি না হইলে শিক্ষা ভাল হয় না।

অভ্যাসে আগ্রহ সৃষ্টি : নিম্নলিখিত উপায়ে অভ্যাস-পাঠে সার্থকথা আসে। প্রাথমিক পর্যায়ে কোন পাঠ বা কাজের অভ্যাসের বিষয় সহজ হইলে আগ্রহ আসে—ইহার ব্যতিক্রমে বিপরীতই ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য প্রথমে অভ্যাস-পাঠকে সহজ হইতে শক্তের দিকে চালিত করা ভাল। তাহা ছাড়া অভ্যাসের দ্বারা উন্নতি বা অবনতির বিষয় শিক্ষার্থীর পরিষ্কার জানা উচিত। সেজন্য মাঝে মাঝে পরীক্ষা হওয়া দরকার। সাফল্যের সংবাদ বা সাফল্য শিশুদের অধিকতর আগ্রহী করিয়া তুলে। পরীক্ষার ফলাফল চার্ট গ্রাফের আকারে দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাবে তুলনামূলক গ্রাফ বা চার্ট দিলে আগ্রহ আরও ঘনীভূত হয়। অভ্যাস-পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির আর একটি পদ্ধতি হইল শ্রেণীকক্ষে সীমিত পরিবেশেই এই পদ্ধতির প্রয়োগ। ছাত্ররা যখন দেখিবে বিশেষ পদ্ধতিতে তাহাদের পাঠ উন্নতির দিকে, তাহারা আগ্রহে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

আগ্রহ সৃষ্টির নমুনা : একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখানে যাইতে পারে কি ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গণিতের অভ্যাসে আগ্রহী করা যায়। ছাত্রদের সংখ্যা শিখাইবার সময় নিম্নলিখিত উপায়ে অভ্যাস-পাঠ দেওয়া যায়—

(১) প্রতি পাঁচ মিনিটে কয়টি সংখ্যা শিখিতে পারে।

(২) পূর্ব দিনের রেকর্ডে ছাত্রদের দিয়া সেদিনের অগ্রগতি লিখিতে বলা।

(৩) বোর্ডে গ্রাফ আঁকিয়া প্রত্যেকের উন্নতি নির্দেশ করা।

(৪) প্রত্যেকটি ছাত্রকে ব্যক্তিগত গ্রাফ রাখিতে বলা ও শ্রেণীতে প্রত্যেকের গ্রাফ রাখা।

(৫) বিভিন্ন ছাত্রের মধ্যে সামান্য প্রতিযোগিতার ভাবের উন্মেষ সাধন করা।

শ্রেণীতে অনুশীলনের কাজ : অনুশীলনের ক্লাসে শিক্ষার্থীর খেলার আগ্রহকে শিক্ষার কাজে লাগাইতে হইবে। যেমন—শব্দ তৈরী। এই শব্দ তৈরী খেলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী একক বা দলবদ্ধ ভাবে নূতন নূতন অর্থবহ শব্দ তৈরী করিবে। গুণে গুণে স্কিপিং করার মাধ্যমে গণনা শিখবে।

শ্রেণীতে অভ্যাস-পদ্ধতি হিসাবে আবৃত্তি অত্যন্ত কার্যকর। পাঠশালায় আগে একত্রে নামতা পড়ানো হইত। ইহার সঙ্গে অর্থবোধ, অনুশীলনমূলক কাজ যেমন—গণিত ভ্রম-সংশোধন, দুরূহ বিষয়সমূহের আলোচনা ইত্যাদি করানো চলে। প্রাথমিক দিকে আবৃত্তিমূলক হইলেও ক্রমে ক্রমে নির্দেশিত ও ব্যক্তিগত কাজের দিকে লইয়া যাইতে হইবে।

দুরূহ প্রশ্নে শিক্ষকের বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। গণিতের বেলায় দুরূহ সমস্যা বেশ ভালভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহারপর শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ছাত্র নূতন সমস্যার সমাধান করিবে। নীতির পদ্ধতির দিকে যে ভুল হইবে সঠিক ভাবে সংশোধনের পর সেই গুলি ভালভাবে অভ্যাস করিবে। তাহার পর স্বাধীন অভ্যাস।

শ্রেণীতে অনুশীলনের কাজ বেশীক্ষণ করান ঠিক নয়। একই দিনে বরং বিভিন্ন বিষয়ের অনুশীলন করা যাইতে পারে। ইহার ফলে একঘেয়েমি আসিবে না এবং শিক্ষার্থীরা ক্লান্তিবোধ করিবে না।

নিচু শ্রেণীতে পাঠ অভ্যাসকালে সরব পঠনের দিকে জোর দিতে হইবে। ইহাতে পাঠের ত্রুটি ধরা পড়িবে, উচ্চারণ সঠিক হইবে এবং মনোযোগ ঘনিষ্ঠ হইবে।

শিক্ষার্থীকে বই না দেখিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। মানসিক অঙ্ক কষিবার অভ্যাস করান ভাল। বানান শিখিবার সময় চোখ বুজিয়া জোরে জোরে অভ্যাস করিবে। ভুল হইলে বই দেখিয়া সংশোধন করিবে।

দুইজনের অভ্যাসকালে একজন পড়িবে অন্যজন শুনিবে। শ্রেণীকক্ষে শ্রুতলিপি, রচনা লেখা, চিঠি লেখার ভিতর দিয়া ভাষা ও বানানের অনুশীলন করিবে। প্রতিদিন কিছু সময় অনুশীলনের জন্য রাখা ভাল।

গৃহকাজ : বিদ্যালয়ে যা শিক্ষা দেওয়া হয় গৃহকাজের মাধ্যমে তাহার প্রয়োগ চলে। ছাত্রদের অসুবিধা ও সময় বিচার করিয়া গৃহকাজ দেওয়া উচিত। প্রতিটি গৃহকাজ শ্রেণীতে পরীক্ষা করিয়া শিশুর উন্নতি অবনতির রেকর্ড রাখা দরকার যাহাতে শিশুও এক নজরে তাহার উন্নতি অবনতি বুঝিতে পারে। মনে রাখা দরকার, সব কাজই লিখিত হওয়ার প্রয়োজন নাই। কিছু মৌখিক কাজও থাকিবে। তবে সব কাজই শিশুর আয়ত্তের মধ্যে হওয়া চাই। কখনও নূতন বিষয় বা যা শ্রেণীতে ভালভাবে করা হয় নাই তাহা গৃহকাজ হিসাবে দেওয়া বিধেয় নয়।

মানসিক নৈপুণ্য অর্জনের সূত্র : শ্রেণীতে পাঠ অভ্যাসের সময় শিক্ষকের কয়েকটি নীতির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন—

(১) শিক্ষার্থী অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হইবে।

(২) সংক্ষিপ্ত ও সহজ পদ্ধতি সর্বদা অনুসরণ করা উচিত।

(৩) স্মরণের (Recapitulation) মাধ্যমে ভ্রম-সংশোধন বিধেয়।

(৪) বিস্মৃতি ঘটিলে বিভিন্ন সূত্র ধরিয়া স্মৃতির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত। তৎসত্ত্বেও স্মরণ না হইলে তখনকারমত অনুশীলন বন্ধ করা বিধেয়।

সাধারণতঃ সংশোধনী পাঠে অনুশীলন-পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সাম্প্রতিক কালে সাঙ্গীকৃত শিক্ষায়ও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। আরও একটি কথা—সমগ্র শ্রেণীর পক্ষে অনেক সময়ই একই প্রকার অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। পূর্বে যদিও শিক্ষকরা সমশ্রেণীতে একই ধরণের অনুশীলন পাঠ দিতেন। সাম্প্রতিক কালে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়াছে।

অনুশীলনের মান : মূল বিষয়গুলিতে অনুশীলন-পদ্ধতির প্রয়োগকালে একটি নির্দিষ্ট মান থাকা বাঞ্ছনীয়। নিম্নলিখিত উপায়ে নির্দিষ্ট মান রক্ষা করা চলে—

(১) শক্ত অংশটি আয়ত্ত করিবার জন্য অনুশীলনের ব্যবস্থা।

(২) অভ্যাস-পাঠের সময় সংক্ষিপ্ত করা বাঞ্ছনীয়—১৫ হইতে ২০ মিনিট।

(৩) ক্রমে ক্রমে অভ্যাস পাঠের সময়ের বিরতির সংখ্যা বাড়াইতে হইবে।

(৪) শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী অভ্যাসের পদ্ধতি ও সময় ঠিক করিতে হইবে।

(৫) শ্রেণীর মান ঠিক রাখিবার জন্য প্রত্যেকটি সদস্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(৬) অনুশীলন-পাঠ সহজেই ক্লান্তিকর হইয়া পড়ে, সেইজন্য বিভিন্ন সমস্যা আকারে উপস্থাপন বিধেয়।

(৭) মাঝে মাঝে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মান ঠিক রাখিবার চে করা উচিত।

অনুশীলনের পরীক্ষণ : জ্ঞান বা কর্ম, তাহা শারীরিক বা মানসিক যাহা হউক শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু প্রয়োগের ভিতর তাহার সাফল্য নির্ভর করে। কিছু নৈপু বাহির হইতে বিচার করা চলিবে ; যেমন—বাচনভঙ্গী, তীর ছোঁড়া ইত্যাদি। অব অনেক নৈপুণ্য নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মাধ্যমেও জানা যায়।

অনুশীলনের ফলশ্রুতি : কেবলমাত্র জ্ঞান বা কৌশল আয়ত্ত করিবার জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন, একথা সত্য নয়। বরং প্রাপ্ত জ্ঞানকে চর্চার মাধ্যমে রক্ষা ক ও উজ্জ্বল করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অপর পক্ষে অনুশীলন প্রথমে আচরণ সৃষ্টির জন্য পরে আচরণকে সাবলীল করিবার জন্য প্রযুক্ত হয়। অভ্যাসের ভিতর দিয়া আচর সৃষ্ট হয়। সুতরাং অনুশীলন তাহার সীমিত পরিধি অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর জীব ও বিষয়ের কাজে লাগে। গণিতের সূত্রাবলীর জ্ঞান, শুদ্ধভাবে বানান করিতে পার সুন্দর হস্তলিপি, এইগুলি অনুশীলনের ফল।

প্রশ্নাবলী

1. What do you know by drilling method ? What are its utility ?
2. Discuss the modes of application of drilling method.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজ

(Co-curricular Activities)

পাঠ্য বহির্ভূত কার্যাবলী (Extra curricular Activites) : ছোট ছো ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখিতে আসে। বিদ্যালয়ের কর্তব্য তাহাদে লেখাপড়া শিখিবার সুব্যবস্থা করা। কিন্তু ছেলে-মেয়েরা স্বভাব-চঞ্চল, সব সম খেলধূলা ভালবাসে। তাহারা খেলাধূলা, নাচ-গান, সাহিত্য-চর্চা ইত্যাদি অবস সময়ে করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের চরিত্রের অন্য দিকগুলির স্ফূর্তি হয়। এ দিন সব কাজগুলিকে পাঠ্যবহির্ভূত কাজ Extra curricular Activities না দেওয়া হইত। কিন্তু বর্তমান কালে এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই স বিষয়গুলিকে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের পাঠ্য বহির্ভূত না বলিয়া পাঠ্য-বিষ পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। সেই জন্য এই সব কাজের নামকরণ করা হইয়াে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (Co-curricular Activites)।

শিক্ষা-বিষয়ে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের ফলে শিক্ষার লক্ষ্যের যেমন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, মনই ইহার নীতি ও পদ্ধতির পরিবর্তন করা হইয়াছে। শিক্ষা বলিতে এখন আর ্যাশিক্ষাকে বুঝায় না। শিশুর সামগ্রিক বিকাশই শিক্ষার লক্ষ্য। কাজেই ্যালয়ের পাঠ্য-অন্তর্গত বিষয় বাদেও তাহাকে আরও অনেক বিষয়ে বা কাজে ক্ষা লইতে হইবে। তাহার চারিত্রিক আনুভূতিক, নান্দনিক ও সামাজিক দিক-্রের বিকাশ করিতে হইলে বিদ্যালয়-পাঠ্যের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। রও নানাবিধ কাজের ব্যবস্থা করা দরকার। এই প্রয়োজন সিদ্ধির উপায়-স্বরূপ ই পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয় সমূহের কথা চিন্তা করা হইল।

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী এই সব কাজে শিশু আনন্দ পায় এবং ্গুলিকে পাঠ-সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করিলে ভাল ফল দেয়।

কাজেই দেখা গেল, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী (১) প্রত্যক্ষভাবে বিষয়-শিক্ষায় হায্য করে এবং (২) পরোক্ষভাবে শিক্ষার ব্যাপকতর লক্ষ্যে পৌছিতে সাহায্য র।

সাম্প্রতিক কালের অনেক শিক্ষা পদ্ধতিতে, যেমন—প্রজেক্ট পদ্ধতি, বুনিয়াদী দ্ধতি; অভিনয় পদ্ধতি ইত্যাদিতে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে পাঠদান দ্ধতি রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই পাঠ-পদ্ধতি হিসাবেও সহ-পাঠ্যক্রমিক ্জগুলির মূল্য কম নয়।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের উদ্দেশ্য: সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজগুলি বিদ্যালয়-বনে কি উদ্দেশ্য সাধন করে এবং লক্ষ্যপূরণে কতদূর সাহায্য করে, তাহার লোচনা প্রাসঙ্গিক হইবে।

(১) **বয়ঃসন্ধি কালের প্রয়োজন মিটান:** ছাত্র-ছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিকালে নেক প্রয়োজন ও চাহিদা থাকে। আত্মপ্রতিষ্ঠা, দলপ্রীতি প্রভৃতি প্রেষণা তাহার ্য জাগরূক হয়। এই সহজ প্রেষণার সম্যক্ স্ফূর্তির সুযোগ না ঘটিলে সে ্বনাশমূলক পথে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী তাহার এই ষণার পরিপূরণে সাহায্য করে।

(২) **নাগরিকতা শিক্ষা:** কেবল বিদ্যা শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, তাহাকে মাজিক হইতে হইবে, ভবিষ্যতে সুনাগরিক হইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে ্গরিকতার অভ্যাস তাহাকে সুনাগরিক হইতে সাহায্য করিবে। সহ-পাঠ্যক্রমিক নেক কাজ তাহাকে ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করে। দলের বা সকলের সঙ্গে ্জ করিবার অভ্যাস করে।

(৩) **চরিত্রগঠন:** কেবল সামাজিক হইলেই চলিবে না, শিশুর নৈতিক চরিত্রও ্দর হওয়া প্রয়োজন। কোন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একাগ্রচিত্তে কাজ ্বা যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায় সম্ভব হয়। পরমত সহিষ্ণুতা, বিচারশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা, মা, দয়া প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ বিভিন্ন কাজ-কর্মের মাধ্যমে অভ্যাসসিদ্ধ হয়। ্ভিন্ন যৌথ কাজ ও খেলার মাধ্যমে চারিত্রিক গুণাবলীর বিকাশ সাধিত হয়। এই ্ক দিয়া দেখিলে সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(৪) **ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য অর্জন :** আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে স্বীকার করা হইয়াছে যে, শিশু প্রকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রবণতা লইয়া জন্মগ্রহণ করে। যেমন—সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য-রচনা, অভিনয় প্রভৃতি সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুর এই প্রবণতা বিকাশ লাভের সুযোগ পায়। সে স্বীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করিতে পারে।

(৫) **অবসর বিনোদনের শিক্ষা :** কাজ প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু জীবনে কাজ ছাড়াও অবসর আছে। অবসর কাজকে শক্তি জোগায়। স্বাস্থ্যকর অবসর যাপন কাজকে উদ্দীপনাময় করিয়া তুলে। বিশেষতঃ বর্তমান শিল্প প্রসারের ফলে অবসর জীবন যাপনের শিক্ষা না থাকায় নানারকম কুশ্রিতা ও অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে। তাহাতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আবার দীর্ঘ অবকাশ যাপন বা অবসর জীবন যাপন অসহনীয় হইয়া উঠে। যদি বিদ্যালয়ে সহ-পাঠ্যক্রমিক অনুবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে যাহাকে ইংরেজীতে হবি (hobby) বলা হয়, তাহা হইলে সুস্থ অবকাশ বা অবসর জীবন যাপনের কোন অসুবিধা হইবে না। যেমন—ঘর সাজান, পত্রবন্ধু, পশুপক্ষী পারিচর্যা, ফটো তোলা, ছবি আঁকা, উদ্যান রচনা প্রভৃতি।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের পরিচালনা : সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে অনেক সময় অনেক সৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। পরিচালনা না থাকিলে তো কথাই নাই, গণ্ডগোলে সব উদ্দেশ্য বিফল হইবে। তাই সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা লওয়া যাইতে পারে।

(১) প্রথমে কতকগুলি কাজ নির্বাচন করিতে হইবে। তাহার পর শিক্ষকদের মধ্যে যিনি সেই কাজে আগ্রহী ও পারদর্শী তিনি ঐ কাজের পরিচালক বা গাইড হইবেন। গাইড নিজের মতামত জোর করিয়া ছাত্রদের উপর চাপাইয়া দিবেন না। সময়োচিত পরিচালনার মাধ্যমে ছাত্রদের ঐ কাজে উৎসাহিত করিবেন।

(২) বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রই যাহাতে এইসব সহ পাঠ্যক্রমিক কাজে যোগ দেয় তাহা দেখিতে হইবে। সেইজন্য বিভিন্ন প্রকার কাজের ব্যবস্থা থাকিবে যাহাতে প্রতিটি ছাত্র নিজের রুচি মত এক বা একাধিক কাজ লইতে পারে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কাজের অভ্যাস করাইতে হইবে, যাহাতে কেহ ইচ্ছা করিলে একাধিক কাজ করিতে পারে।

(৩) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর গুরুত্ব যাহাতে বাড়ে সেজন্য এই কাজে নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা করা। ইহার জন্য নিরপেক্ষ ভাবে রেকর্ড রাখিতে হইবে। নম্বর দিবার ব্যবস্থা থাকিলে ছাত্রদের কাছে ইহার মর্যাদা বাড়িবে ও এই সব কাজের মান (standard) বাড়িবে।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর বিবরণ : সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যেমন—

১। জ্ঞানমূলক—সাহিত্য-রচনা, সাহিত্য-সভা, বিতর্ক, পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি

২। সামাজিক—সমাজসেবা, নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কাজ, মেলা ও ত্রাণমূলক কাজ, সমবায়-সমিতির কাজ।

৩। কৃষ্টিমূলক—সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রাঙ্কণ, অভিনয়, উৎসব অনুষ্ঠান, প্রদর্শনী।

৪। খেলা—ব্যায়াম, ফুটবল, হকি, ভলিবল, ব্যাটমিন্টন, ক্রিকেট, কপাটি স্পোর্টস ইত্যাদি।

৫। স্বায়ত্ত-শাসনমূলক কাজ—

৬। হবি—সঙ্গীত, চারু ও কারুকলা, উদ্যান-রচনা, পশু ও পাখীর পরিচর্যা, ডাক-টিকিট সংগ্রহ ইত্যাদি।

৭। ভ্রমণমূলক কাজ—শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ।

৮। বয়েজ স্কাউট্ ও গার্লগাইড, ব্রতচারী।

ইহা ছাড়া বিদ্যালয় ছাত্রদের মানসিক প্রবণতা অনুযায়ী অন্যবিধ কাজেরও ব্যবস্থা করিতে পারে। মনে রাখিতে হইবে, সহ-পাঠ্যক্রমিক কাজের প্রবর্তন ও পরিচালনা নির্ভর করে বিদ্যালয়ের আর্থিক স্বচ্ছলতা, ছাত্রসংখ্যা ও পরিচালক শিক্ষকদের দক্ষতার উপর।

প্রশ্নাবলী

1. What do you understand by Co-curricular Activities ?
2. Describe the utility of Extra curricular Activities in schools. Why are those activities called as Co-curricular Activities ?
3. How Co curricular Activities be organised effectively in a school ?

চতুর্দশ অধ্যায়

শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী

শিশুর শিক্ষাকে সর্বাঙ্গীণ করিতে হইলে ভ্রমণ কর্মসূচী থাকা আবশ্যক। সেজন্য বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে ভ্রমণের আয়োজন করা হইয়া থাকে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় বিদ্যালয়েই ভ্রমণ শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভ্রমণের উদ্দেশ্য

(১) শিশু তাহার পরিবেশকে ভালভাবে চিনে—এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতা আছে। এই পরিচিত পরিবেশকে কেন্দ্র করিয়া তাহাকে নূতন জ্ঞান দিতে হইবে। সেজন্য শিক্ষার্থী প্রথমে পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হইবে।

(২) ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে পুস্তকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। যান্ত্রিকভাবে সেগুলি মুখস্থ করে, কিন্তু সেই সব বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান তাহাদের থাকে না। অবাস্তব শিক্ষা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাঝে মাঝে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা

ভাল। বিদ্যালয়ে যে সব বিষয় পড়িবে ভ্রমণের মাধ্যমে তাহার অনেকগুলির সঙ্গে বাস্তব পরিচয় ঘটিবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাহাদের জ্ঞান কার্যকর ও স্থায়ী হইবে।

(৩) শ্রেণীকক্ষে যে সব অভিজ্ঞতা লাভের উপায় থাকে না ভ্রমণের মাধ্যমে সেই সব অভিজ্ঞতা শিশুরা অনুসন্ধান, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবে। তাহাদের অভিজ্ঞতায় যে সব ফাঁক থাকে ভ্রমণের মাধ্যমে তাহা পূর্ণ করিবে।

(৪) শিশু যে পরিবেশে বাড়িয়া উঠিয়াছে সে পরিবেশ সম্পর্কে বাস্তব ও দার্শনিক জ্ঞান লাভ করা ভ্রমণের আর এক উদ্দেশ্য। শিশুর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সমাজে এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহার প্রভাবে স্থানিক জীবনধারা একটি বিশেষ রূপে প্রতিভাত হয়। শিশু ঐ সব পরিবর্তন দেখিবে ও তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।

(৫) ভ্রমণ সকলের পক্ষে বিশেষ করিয়া শিশুদের পক্ষে আনন্দের। পরিচিত জগতের বাহিরে কত বড় জগৎ আছে। কত বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্ভার, লোকজন, রীতিনীতি, যানবাহন ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত হইবে। মানসিক সঙ্কীর্ণতা বিনাশের পক্ষে ভ্রমণ উপকারী।

(৬) শিক্ষাবিদ্‌দের মতে পরিভ্রমণ বিশেষ তিনটি উদ্দেশ্যে সাধন করিয়া থাকে:

(ক) শিশুরা যে সমাজে বাস করে তাহার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইতে সাহায্য করে।

(খ) সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে নিজেদের গড়িয়া তুলে।

(গ) শিশুর ব্যক্তিত্ব তাহার নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী বিকাশলাভে সাহায্য করে।

(৭) ভ্রমণের মাধ্যমে যে সব অভিজ্ঞতা লাভ করিবে সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা চলিবে।

(৮) শিশুদের মানসিক বিকাশের পক্ষে উপকারী। ভ্রমণে মনের ঔদার্য বৃদ্ধি হয়। কৌতূহল ও কল্পনা-বৃত্তির উদ্বোধন ঘটে, সৌন্দর্য উপভোগের স্পৃহা জাগে এবং নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিবার ফলে মনে ঈশ্বর বিশ্বাস উদ্বুদ্ধ হয়।

ভ্রমণের বিভিন্ন দিক্‌ঃ শিক্ষামূলক পরিভ্রণের কয়েকটি দিক্‌ আছে। ভ্রমণকে যথার্থভাবে শিক্ষণীয় করিতে হইলে এইগুলির প্রয়োজন আছে। যেমন—

(ক) পরিকল্পনা। (খ) ভ্রমণ। (গ) মূল্যায়ন। (ঘ) শিক্ষা উপকরণরূপে ব্যবহার।

(ক) প্রত্যেক কাজের আগে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা দরকার। ভ্রমণের কর্মসূচীর মধ্যে পারকল্পনার স্থান সর্বোচ্চ। পরিকল্পনাহীন কাজে যেমন কোন ফল হয় না, সেইরূপ পরিকল্পনা না করিয়া ভ্রমণ শিক্ষামূলক হয় না। ভ্রমণের পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে নিম্নলিখিত জিনিসগুলির বিষয় চিন্তা করিতে হইবে:

(১) পরিভ্রমণের জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করা হইয়াছে তাহা ভ্রমণের উপযুক্ত কিনা? আমাদের দেশে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে বড় রকমের ভ্রমণের কর্মসূচী গ্রহণ করা ঠিক নয়। শরৎ, শীত ও বসন্তকালে ভ্রমণ সবচেয়ে সুবিধাজনক।

আবার নভেম্বর ও ডিসেম্বরে বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ভ্রমণে যাওয়া সঙ্গত নয়। অবশ্য যদি এমন কিছু দেখার পরিকল্পনা থাকে যাহা ঐ বিশেষ সময় ভিন্ন দেখা যায় না—সময়ের বিচার সে ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

(২) বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, শিশুর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত ভ্রমণের প্রয়োজন আছে কিনা? অর্থাৎ প্রস্তাবিত ভ্রমণের শিক্ষাগত মূল্য (educative value) কতটুকু?

(৩) প্রস্তাবিত ভ্রমণ যে শ্রেণীর শিশুদের জন্য বন্দোবস্ত করা হইয়াছে সেই শ্রেণীর শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক দিক দিয়া তাহাদের উপযুক্ত কিনা?

(৪) পরিভ্রমণের ফলে যাহাতে বিদ্যালয়ের কার্যক্রমের বিশেষ অসুবিধা না ঘটে।

ভ্রমণের একটি বিস্তৃত ও খুঁটিনাটি পরিকল্পনা করিতে হইবে। পরিকল্পনা করিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে:

(১) **স্থান নির্বাচন**—শিশুদের বয়স, মানসিক মান (standard), শিক্ষাগত মূল্য ইত্যাদি বিচার করিয়া ভ্রমণের স্থান নির্বাচন করিতে হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের বেশীদূরে লইয়া যাওয়া সঙ্গত নয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রদের দূর-ভ্রমণে লইয়া যাওয়া চলে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগের ছাত্রদের কলকারখানা দেখিবার পরিকল্পনা লওয়া শিক্ষার পক্ষে উপযুক্ত। স্থান নির্বাচনের সময় যোগাযোগ ব্যবস্থায় সুযোগ সুবিধার দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেখানে যোগাযোগের অসুবিধা আছে সেখানে প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের লইয়া যাওয়া সঙ্গত নয়।

(২) **সময় নির্বাচন**—অনেক দিক বিবেচনা করিয়া সময় নির্বাচন করিতে হইবে। প্রাকৃতিক পরিবেশ যেন মনোরম থাকে—যাহাতে ভ্রমণের ফলে শারীরিক ক্ষতি না হয়। আমাদের দেশে শরৎ, শীত ও বসন্তকালে ভ্রমণের সময় নির্বাচন করা উচিত। বিদ্যালয়ের কাজে ক্ষতি হয় এইরূপ সময়ও নির্বাচন করা ঠিক নয়।

(৩) **পরিবহণ সমস্যা**—ভ্রমণের পক্ষে পরিবহণ একটি প্রধান সমস্যা। প্রাথমিক স্কুলের ছেলেদের স্কুল থেকেই সরাসরি পরিবহণের ব্যবস্থা করা ভাল।

বাস বা ঐ জাতীয় যানবাহনের দ্বারা শিশুদের ঐ স্থানে লইয়া যাওয়া ও ফিরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা উচিত। বড় বড় ছেলেদের লইয়া দূর দেশভ্রমণে যাইতে হইলে যানবাহনের যাবতীয় খুঁটিনাটির সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পরিকল্পনা ঠিক করিতে হইবে।

(৪) **যাত্রীদল**—ভ্রমণে কে কে যাইবে তাহাও ঠিক করিতে হইবে। সম্ভব হইলে শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর যাওয়া দরকার। নিকটস্থ ভ্রমণে এবং গাড়ির ব্যবস্থা করিতে পারিলে সকলকে লইয়া যাওয়া যায়। নতুবা শারীরিক সামর্থ্য ও আর্থিক প্রশ্ন বিবেচনা করিতে হয়। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের দূর দেশভ্রমণে লইয়া যাওয়া উচিত নয় এবং খরচ করিবার মত সামর্থ্যও বিচার করিতে হইবে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে এক জন বা দুই জন শিক্ষক থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৫) **দ্রষ্টব্য বস্তু**—গন্তব্যস্থানে কি কি দেখা হইবে তাহার একটি বিস্তৃত কর্মসূচী প্রণয়ন করিতে হইবে। চিঠিপত্র লিখিয়া, বই পড়িয়া সেখানে দেখিবার কি কি জিনিস আছে জানিতে হইবে। তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি ভ্রমণসূচির মধ্যে লওয়া

হইবে, কোন্‌টি কখন দেখা হইবে, কি ভাবে দেখা হইবে ইহার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে হইবে।

(৬) **শিক্ষাগত দিক্‌**—পরিভ্রমণকে শিক্ষামূলক করিতে হইলে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া দেখিতে হইবে। প্রত্যেকটি ভ্রমণের দর্শনের কি কি শিক্ষাগত মূল্য ও সম্ভাবনা আছে, পূর্বাহ্ণে চিন্তা করিতে হইবে। কোন জিনিসের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, স্থাপত্য, প্রাকৃতিক বা সামাজিক যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান আছে সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্ত একটি প্রশ্নমালা (questionnaire) তৈয়ার করিতে হইবে। প্রত্যেকটি দর্শনীয় জিনিসের উপরই প্রশ্নমালা থাকিবে। এই প্রশ্নমালা আগে পড়িয়া লইলে দেখিবার সময় স্বভাবতঃ সেই সব প্রশ্ন অনুযায়ী খুঁটি-নাটি দেখিবে ও জানিতে চেষ্টা করিবে।

(৭) **পরিচালনার কর্মসূচী**—ভ্রমণকে আনন্দময় করিতে হইলে ইহার পরিচালনাকেও ক্রটিহীন করিতে হইবে। কেবলমাত্র শিক্ষকের হাতে পরিচালনার ভার থাকিলে চলিবে না।

শিশুদের আত্মকর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই। শিক্ষক প্রধান উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসাবে থাকিবেন। বিভিন্ন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্ত ভ্রমণের সদস্তদের বিভিন্ন দলে ভাগ করিয়া এক এক দলকে এক এক কাজের ভার দেওয়া উচিত। এক একটি দল নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব যদি সুষ্ঠুভাবে পালন করে, তাহা হইলে কোথাও ক্রটি হওয়ার কথা নয়। অবশ্য প্রয়োজনে এক দল অন্য দলকে যে সাহায্য করিবে না তাহা নয়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপে দলভাগ করা চলে :

(ক) আহার্য। (খ) যোগাযোগ ও পরিবহণ। (গ) অর্থ ও হিসাব। (ঘ) স্বাস্থ্য। (ঙ) সমন্বয়।

প্রত্যেক দলে এক জন দলপতি থাকিবে। নিজের দলকে সে পরিচালনা করিবে।

(ক) ভ্রমণের আগে শ্রেণীকক্ষে সবাই একসঙ্গে বসিয়া এই পরিকল্পনা আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করিবে। যাহাতে শিশুরা ভ্রমণের দায়িত্ব ও গুরুত্ব বুঝিয়া নিজেরাই তাহার পরিচালক ভাবিয়া আনন্দ পায়। পরিকল্পনা যত ব্যাপক ও ক্রটিহীন হইবে ভ্রমণও তত আনন্দদায়ক ও শিক্ষাপ্রদ হইবে। পরিকল্পনা কালে এই কথা মনে রাখা দরকার।

(খ) ভ্রমণ পরিকল্পনামত অগ্রসর হইবে। ভ্রমণের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে যেন লক্ষ্য থাকে :

(১) ভ্রমণের লক্ষ্য যেন ঠিক থাকে। (২) ভ্রমণকারীরা যেন শ্রান্ত না হইয়া পড়ে। (৩) কোন দুর্ঘটনা যেন না হয়। (৪) সকলেই যেন অংশ গ্রহণ করে। (৫) প্রত্যেকেই যেন দেখিতে ও শুনিতে পায়। (৬) প্রত্যেক স্থানে যেন প্রশ্নোত্তরের সুযোগ থাকে।

(গ) **মূল্যায়ন :** ভ্রমণ শেষ হইলে তবে মূল্যায়ন। প্রত্যেক দল নিজেদের কার্যধারার রিপোর্ট দিবে। শ্রেণীতে সেই রিপোর্ট পাঠ করা হইবে। আলোচনা ও সমালোচনার প্রয়োজন হইলে তাহা করা হইবে ও রিপোর্ট গ্রহণ করা হইবে।

মণের স্থান, দ্রষ্টব্য বস্তু ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রত্যেককে রচনা লিখিতেও দেওয়া ইতে পারে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নমালার সাহায্যে অভিজ্ঞতার পরীক্ষা লওয়া যাইতে ারে অথবা ভ্রমণের বিভিন্ন দিক ঠিক করিয়া কয়েকটি দলকে সে বিষয়ে লিখিতে লা হইল। এই শেষোক্ত পর্যায়ের লেখাগুলি শ্রেণীতে পাঠ করা হইবে ও ালোচিত হইবে।

(ঘ) **শিক্ষা উপকরণ-রূপে ভ্রমণের ব্যবহার**—ইহার পর শিক্ষকের াজ। ভ্রমণের পর শিক্ষক তাহাকে শিক্ষার উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করিবার থা চিন্তা করিবেন, পরিকল্পনা করিবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছোট-খাট ভ্রমণকে াগ্রহের সূত্র করিয়া প্রজেক্ট শুরু করা চলিতে পারে। যেমন—চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, রেলস্টেশন, ডাকঘর, মেলা, হাট ইত্যাদি। শিশুরা নিজেরা দেখিয়াছে, সব কিছু ানিয়াছে—বাস্তব ভাবে কাজ করিতে চাহিবে।

মাধ্যমিক শ্রেণীতে ঐতিহাসিক উপাদান হইতে ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যায় থবা দ্রষ্টব্য স্থানের ঐতিহাসিকত্ব জানিবে, সে সম্পর্কে কথা-কাহিনী পড়িবে, ালোচনা করিবে। কলকারখানা দেখিয়া তাহার খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা রিবে—উপাদান, উপকরণ, উৎপাদন, বিপনন ইত্যাদি বিষয় জানিবে। শিক্ষক াধারণ আলোচনা ছাড়াও এই সব উপাদানকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা পরিচালনা রিবেন।

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ

পরিবেশ পর্যবেক্ষণ যদিও শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের (Excursion) পর্যায়ে পড়ে না থাপি প্রাথমিক স্কুলে ইহার প্রয়োজন, শিক্ষাগত মূল্য ও সম্ভাবনা সমধিক। ুনিয়াদী শিক্ষায় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে সম্বন্ধিত শিক্ষার ক্ষেত্র হিসাবে ওয়া হইয়াছে। কাজেই পরিবেশ পর্যবেক্ষণ শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে কার্যকর

প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব কাজের সঙ্গে ম্বন্ধিত করিয়া শিক্ষাকে উদ্দেশ্যমূলক ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। ছেলে-মেয়েরা নিজেদের পারিপার্শ্বিক সমাজকে চিনে, সেইজন্য নূতন করিয়া আর ভ্রমণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে—এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ইহার উত্তরে বলা যায়—াধারণতঃ শিশুরা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখে না। কোন জিনিসের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে সেই দিকে তাহাদের খেয়াল থাকে না। পরিবেশ পর্যবেক্ষণে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্বোধন ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, কেবল দেখা নয়, পরিবেশের বিভিন্ন অবস্থা ও কাজ তাহার মনে ছাপ ফেলিয়াছে—সেই অবস্থা ও কাজের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন ও বিচিত্র তথ্য ও জ্ঞানের সঙ্গে তাহার পরিচয় ঘটিবে।

শিক্ষকের প্রস্তুতি: পরিবেশ পর্যবেক্ষণের পূর্বে শিক্ষককে নিম্নরূপে প্রস্তুত হইতে হইবে:

(১) পরিবেশ পর্যবেক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূর্বাহ্নে স্থির করিতে হইবে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কি কি শিক্ষা তিনি দিতে পারিবেন ও

শিশুরা কি কি অভিজ্ঞতা লাভ করিবে, স্থির করিতে হইবে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূগোল সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হইলে প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে সমাজবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি পাঠের জন্য সামাজিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। (২) প্রজেক্টের পরিকল্পনা থাকিলে, সে বিষয়ে পরিকল্পনা লইয়া পরিবেশ পর্যবেক্ষণে বাহির হইতে হইবে। (৩) পর্যবেক্ষণের বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে। (৪) পর্যবেক্ষণের জন্য একটি প্রশ্নপত্র তৈয়ার করিতে হইবে। শিশুরা পর্যবেক্ষণের সময় এই সব প্রশ্ন সমাধানের মাধ্যমে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করিবে। (৫) শিশুরা পর্যবেক্ষণের সময় কি কি করিতে হইবে তাহার আলোচনা ও নির্দেশ।

পর্যবেক্ষণের স্তর : পরিবেশ পর্যবেক্ষণের সময় সর্বদা মনে রাখিতে হইবে ইহা উদ্দেশ্যমূলক। শিক্ষার মাধ্যমরূপে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে যাহাতে ইহাকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যায়, সেইজন্য তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যেমন—

(১) সুষ্ঠু পরিকল্পনা। (২) পর্যবেক্ষণের সময় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সম্ভাব্য আলোচনা। (৩) পর্যবেক্ষণের পরে শ্রেণীকক্ষে সম্পর্কিত পাঠদান বা প্রজেক্টের সূচনা।

পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষক তাহাদের মধ্যে কৌতূহলকে জাগ্রত করিয়া কৌতূহলকে তাহার লক্ষ্যাভিমুখী করিবেন। তিনি আবিষ্কারকের ভূমিকা লইয়া নিত্য পরিচিত পরিবেশকে অনাবিষ্কৃত দেশের পর্যায়ে লইয়া যাইবেন।

যদি শিক্ষক পাতা সম্পর্কে পাঠ দিতে চান তাহা হইলে আলোচনাকে পাতার দিকে লইয়া যাইবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত গাছের পাতার আকার যে কেমন বিচিত্র হয়, তাহা কি তাহারা জানে? বিভিন্ন গাছের পাতার বৈশিষ্ট্য দেখাইয়া দিবেন। শিশুরা কৌতূহলী হইয়া উঠিবে। তাহারা বিভিন্ন রকমের পাতা সংগ্রহ করিবে। তাহার পর শ্রেণীতে ফিরিয়া আসিয়া ব্লটিং কাগজের ভিতরের পাতা সাজাইয়া রাখিবে। রস একটু কমিয়া গেলে পাতা সংগ্রহের খাতায় শ্রেণীবদ্ধভাবে রাখিবে। ইতিমধ্যে শ্রেণীতে তাহাদের সংগৃহীত পাতা লইয়া শিক্ষক আলোচনা শুরু করিবেন। পাতার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য—একদল, বহুদল পাতা ইত্যাদি। সে ভাগ অনুযায়ী ছাত্ররা পাতা সাজাইয়া প্রতিটি পাতা কোন্ শ্রেণীতে পড়ে তাহা বৈশিষ্ট্য কি কি সব লিখিবে। তাহা হইলে শিক্ষকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—তাহার পাতা বিষয়ে পাঠদান সার্থক হইবে। এইভাবে পাখী, ফুল, ইত্যাদি বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করা চলিবে।

শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া হাটে যাইতে পারেন। হাটে গিয়া হাটের অবস্থান, কোন্ কোন্ গ্রাম হইতে হাটে লোক আসে, যাতায়াতের রাস্তা, হাটে কি কি জিনিস বিক্রী হয়, কোথায় এইগুলি উৎপন্ন হয়, বাহির হইতে কি কি জিনিস আসে, গ্রামের কোন্ জিনিস বাহিরে যায়—ইত্যাদি বিষয়ে জানিবে এবং খাতায় লিখিয়া রাখিবে। পরে শ্রেণীতে আসিয়া এসব আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষক নিজের ঈপ্সিত পাঠ দিবেন বা হাটের প্রজেক্ট করাইবেন। এইভাবে মেলা, পাঠাগার, সমবায় ভাণ্ডার কুটির-শিল্প প্রভৃতি দেখান যাইতে পারে।

সমালোচনা : অনেকে বলেন পরিবেশ পর্যবেক্ষণের ফলে বিষয়গত জ্ঞান বেশী হয় না। আবার যেটুকু হয় তাহাও এলোমেলো, ছাড়া ছাড়া। পর্যায়ক্রমিক শিক্ষা ইহার দ্বারা হয় না। সমালোচনার অভিযোগ স্বীকার করিয়াও বলা যায় ত্রুটি হইল শিক্ষকের। শিক্ষক সব দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে তবে পরিবেশ পরিচিতির পরিকল্পনা করিবেন। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে এবং পরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তাহা হইলে অসাফল্যের কারণ ঘটে না। গুর অনুযায়ী শিক্ষা সমালোচনার উত্তরে বলা যায় সব বিষয়ই পরিবেশ পরিচিতির দ্বারা দেওয়া যায় না। যেখানে পরিবেশ পরিচিতির প্রয়োজন কেবল সেইখানেই তাহার পরিকল্পনা করিতে হইবে।

প্রদর্শনী

কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে অন্যান্য কাজের ন্যায় প্রদর্শনীর শিক্ষাগত মূল্য কম নয়। প্রদর্শনী সংগঠনের ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কাজের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি হয়।

প্রদর্শনী শুরু করিবার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনপ্রদর্শনী দেখার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আশে পাশে কোথাও শিল্প প্রদর্শনী বা অনুরূপ কিছু হইলে পূর্ব পরিকল্পনা মত শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের তাহা দেখাইতে লইয়া যাইবেন।

উদ্দেশ্য : (১) প্রদর্শনীব সংগঠন সাধারণ বাজার বা দোকান অপেক্ষা উচ্চস্তরের হয়। জিনিসপত্র পৃথক্ পৃথক্ রাখা ও সাজান ইত্যাদির মাধ্যমে সুরুচির পরিচয় বহন করে। জিনিসপত্র মান অনুযায়ী শৃঙ্খলার সঙ্গে গুছাইয়া রাখিলে যে ভাল দেখায় তাহা ছাত্র-ছাত্রীরা উপলব্ধি করে

(২) সাধারণতঃ ভাল জিনিসই প্রদর্শনীতে রাখা হয়। শিল্পপ্রদর্শনী, কৃষি-প্রদর্শনী যাহাই হউক না কেন শিশুরা অনেক ভাল জিনিস দেখিতে পায়।

(৩) কে বা কাহারা জিনিসগুলি তৈয়ার করিয়াছে, প্রদর্শনীতে লেখা থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝিতে পারে তাহাদের দেশের লোকেই এইগুলি তৈয়ার করিয়াছে। দেশের কৃষি বা শিল্পের উপর তাহাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগে।

(৪) শিশুরা প্রদর্শনীর সম্পর্কে জানিতে পারে।

প্রদর্শনী দেখিবার আগে একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করিতে হইবে। শিক্ষকই প্রধানতঃ এই পরিকল্পনা তৈয়ার করিবেন। এই প্রশ্নমালা প্রদর্শনী দেখিবার পূর্বে ছাত্র-ছাত্রীদের দিবেন।

তাহারা সেই প্রশ্নগুলি ভালভাবে পড়িয়া প্রদর্শনী দেখিতে যাইবে। কাছে নোট খাতা ও পেনসিল থাকিবে। প্রয়োজনীয় তথ্য লিখিয়া রাখিবে। প্রদর্শনী দেখিবার পর শ্রেণীতে আসিয়া আলোচনা করিবে। আলোচনায় স্থির হইলে তাহারাও একটি প্রদর্শনীর প্রজেক্ট লইতে পারে।

শ্রেণীতে শিল্পকাজ হইয়া থাকে—প্রদর্শনীর জন্য অন্যবিধ কাজেরও পরিকল্পনা লইতে হইবে।

শিক্ষক সব সময় খেয়াল রাখিবেন প্রধানতঃ সেই সব কাজ করা হইবে যাহার মাধ্যমে তাঁহার পাঠদান চলিবে।

শেষ পর্যন্ত শিক্ষক প্রদর্শনীকে একটি প্রজেক্টের রূপ দিবেন। প্রজেক্টের নিয়ম অনুযায়ী ইউনিট ভাগ ও দলগত কাজ হইবে ও কর্ম সম্পাদনের পর মূল্যায়ন করা হইবে।

শিক্ষক তাঁহার পরিকল্পনায় প্রজেক্টের কার্যকালে ভাষা, গণিত, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সামাজিক শিক্ষা ও শিল্প কাজের অনেকটাই এই প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পারিবেন।

বিদ্যালয় সংগ্রহশালা (Museum)

বিদ্যালয় সংগ্রহশালা শিক্ষার আর একটি মাধ্যম। অন্যান্য কাজের ভিতর দিয়া ইহা গড়িয়া উঠে। ইহারও শিক্ষাগত মূল্য কম নয়।

সংগঠন : যেখানে সুবিধা আছে ছেলে-মেয়েদের যাদুঘর বা অনুরূপ সংগ্রহশালা দেখাইয়া বিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়িয়া তুলিবার দিকে তাহাদের আগ্রহ সঞ্চার করা যাইতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা কত সম্ভব অসম্ভব জিনিস সংগ্রহ করিবে। কোনটিকে অনাদর না করিয়া সংগ্রহশালায় সাজাইয়া রাখিতে হইবে। সংগ্রহশালাকে একটি প্রজেক্টরূপেও লওয়া চলে। অবশ্য প্রজেক্ট না করিয়াও সংগ্রহশালা গড়িয়া তোলা যায়। তাহাতে সময় বেশী লাগিলেও স্বাভাবিক উপায়ে ধীরে ধীরে ইহা গড়িয়া উঠে। নিম্নলিখিত উপায়ে বিদ্যালয় সংগ্রহশালা গড়িয়া উঠিতে পারে :

(১) শিক্ষামূলক পরিভ্রমণে গিয়া ঐতিহাসিক কোন বস্তু পাইলে সংগ্রহ করিয়া আনা বা কোন ঐতিহাসিক নিদর্শনের মডেল লইয়া আসা, যেমন—তাজমহল বা কোণার্কের মডেল। সেগুলি যত্ন করিয়া সংগ্রহশালায় রাখা।

(২) বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার প্রয়োজনে পরিবেশ পর্যবেক্ষণে গিয়া ছাত্ররা যে পাতা সংগ্রহ ও বীজ সংগ্রহের খাতা তৈয়ার করিবে তাহা রাখা হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্ররা কৌতূহলের বশে বিভিন্ন সময়ে যে সব জিনিস সংগ্রহ করিবে যেমন—পাখীর বাসা, ডিম—তাহা যত্ন করিয়া রাখা।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীর তৈরি শিল্পকাজের ভাল নিদর্শন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাহাদের দ্বারা তৈরি জিনিসের রক্ষণযোগ্য অংশ রাখা হইবে।

সংগ্রহশালার মূল্য : (১) ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গর্ব ও আনন্দবোধ জাগিবে। তাহারা নিজেদের চেষ্টায় বিদ্যালয়ে একটি সংগ্রহশালা গড়িয়া তুলিয়াছে।

(২) প্রাচীন এবং ভাল জিনিস যত্ন করিয়া সংরক্ষণের দিকে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ জন্মাইবে। জাতীয় মনোভাবের দিক দিয়া ইহা তাৎপর্যপূর্ণ।

(৩) এই সব জিনিস সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহারা অনেক নূতন জিনিসের সঙ্গে পরিচিত হইবে। নূতন জিনিস ও অনেক ঐতিহাসিক কাহিনী জানিবে।

শিক্ষাগত মূল্য ঃ সংগ্রহশালাকে যদি প্রজেক্টের রূপে লওয়া হয় তাহা
ল পরিকল্পনা মত শিক্ষা দেওয়া যাইবে। অন্যথায় সংগ্রহশালাকে কেন্দ্র করিয়া
ার ব্যবস্থা করা যায়।

(১) সংগ্রহশালা বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকের শিক্ষা উপকরণরূপে ব্যবহৃত হইতে
র। এইখানে সংগৃহীত বিভিন্ন বস্তু অনেক সময় পাঠদানকালে প্রদীপন হিসাবে
হৃত হইতে পারে।

(২) সংগ্রহশালাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়। ইতিহাস,
াল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, ভাষা ও সাহিত্য, সমাজ-বিদ্যা ইত্যাদি।

(৩) সংগ্রহশালা বা ইহার কোন জিনিসকে আগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার
রয়া পাঠ দেওয়া যায়। যেমন—তাজমহলের মডেলকে উপলক্ষ্য করিয়া শাজাহানের
 দেওয়া চলিতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the importance of educational tour in education.
2. Discuss how the tour can be made educative ?
3. Discuss the importance of School Museum, in classroom teaching.

পঞ্চদশ অধ্যায়

বাড়ির কাজ

(Home-Task)

বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ লক্ষ্য হিসাবে বলা যায় বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কতকগুলি বিষয় ও
ে নির্দিষ্ট মনে অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষাকে পুরোপুরি ভাবে দিতে
ল বা সফল করিতে হইলে কেবল শ্রেণীকক্ষের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেওয়া যায়
। বিদ্যালয় পরিবেশে ছাত্র-ছাত্রীরা দিবারাত্রির মধ্যে অত্যন্ত স্বল্প সময় থাকে।
অল্প সময়ে সব কিছু মান অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া যায় না। সেইজন্য ছাত্রদের
ড়িতেও পড়াশুনা করিতে বলা হয় বা কোন কাজ দেওয়া হয়। কোন নির্দিষ্ট
 বা কাজ যাহা নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িতে করার নির্দেশ দেওয়া হয় তাহাকে বাড়ির
জ বলা হয়।

প্রয়োজনীয়তা ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহকাজ দিবার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক
ক্ষাবিদ্ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কোন কোন শিক্ষাবিদের মতে
ত্র-ছাত্রীদের গৃহকাজ দিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনেকে উচ্চশ্রেণীর
ত্র-ছাত্রীদের পক্ষে গৃহকাজের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও প্রাথমিক পর্যায়ে
ার গুরুত্ব স্বীকার করেন না।

অনেক শিক্ষাবিদ্ গৃহকাজের মূল্য সম্পর্কে সন্দীহান। তাঁহাদের মতে শিক্ষা গৃহকাজ কোন সুফল আনয়ন করে না। কারণ :

(১) অনেকক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা গৃহকাজের অধিকাংশ গৃহশিক্ষক বা অভিভাব দের দিয়া করাইয়া লয়।

(২) অন্য ছাত্রদের খাতা হইতে টুকিয়া লয়।

(৩) বাড়ির পরিবেশ পড়াশুনার অনুকূল না হইলে গৃহকাজ করিতে পারে না।

(৪) কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর প্রশ্ন বোধগম্য হয় না বলিয়া গৃহকাজ করা স হয় না।

(৫) যে সব ছেলে খেলিতে ভালবাসে গৃহকাজ তাহাদের কাছে ভীতিপ্র হইয়া দাঁড়ায়।

(৬) কেহ কেহ গৃহকাজের ফলে বাড়িতে এত বেশী পড়াশুনা করে যে, স্বা অবনতি ঘটে।

তবে অনেক শিক্ষাবিদ্ গৃহকাজ একেবারে বন্ধ করার পক্ষপাতি নন। শ্রেণীক ছাত্র-ছাত্রীরা একসঙ্গে পড়াশুনা করে। শিক্ষকের পক্ষে সব সময় ব্যক্তি মনে যোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। বাড়ির কাজের মাধ্যমে ছাত্রের উৎকর্ষ বা ধরিতে পারা যায় ও তাহাকে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

(১) শ্রেণীকক্ষে যে সব জিনিস শিখিল তাহার অনুশীলনের প্রয়োজন থা গৃহকাজের মাধ্যমে সেই অনুশীলন হইয়া থাকে।

(২) গৃহকাজের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীর স্বাধীন পাঠে আগ্রহ জন্মে ও তাহা তাহার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটে।

(৩) বিদ্যালয়ের বাহিরেও তাহাকে কার্যে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা হয় তাহার ফলে সে কুচিন্তায় মগ্ন হইবার বা কুসঙ্গে মিশিবার সময় পায় না।

(৪) সততার সহিত লিখিত গৃহকাজ করিলে ছাত্রদের জ্ঞানোন্নতির প পাওয়া যায় এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া ছাত্রকে অতিরিক্ত শিক্ষা দেওয়া হয়।

গৃহকাজের অপকারিতা :—

(১) ইহাতে **ছাত্রের কাজের বোঝা বেশী হইতে পারে** এবং ফলে তা স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে।

(২) প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধানের অভাবে ছাত্র ভুল করিতে পারে এবং ভালরূপে সংশোধিত না হইলে সে **ভুল শিক্ষা করিতে পারে।**

(৩) লিখিত গৃহকাজ করিবার জন্য ছাত্র অসদুপায় অবলম্বন করিতে পারে তাহার ফলে তাহার জ্ঞানোন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে।

(৪) **শিক্ষক লিখিত গৃহকাজ সংশোধনের সময় না পাইতে পা** অথবা ইহাতে তাঁহার কাজের বোঝা অত্যন্ত ভারী হইয়া পড়িতে পা শিক্ষকগণের ইহা সাধারণ অভিযোগ এবং তাহা একান্ত ভিত্তিহীন নয়।

(৫) সংশোধিত গৃহকাজ ছাত্র নিজে পুনঃ পড়িয়া না দেখিতে পারে তাহার **ভুল সংশোধন না হইতে পারে।** ইহা হইলে **গৃহকাজের**

াত্রের কোন উপকার হইবে না, তাহা সংশোধনের জন্য শিক্ষকের শক্তির
পব্যয় হইবে মাত্র।

(৬) শিক্ষক শ্রেণীতে দক্ষতার সহিত পাঠদানের চেষ্টা না করিতে পারেন।
ানি গৃহকাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াও তাহা পরীক্ষা করিয়া বা সংশোধন করিয়াই
ষ্ট থাকিতে পারেন। ইহাতে শিক্ষক কেবল কার্য আদায়কারী (Task Master)
'য়া পড়েন।

প্রতিকার ঃ (১) বিদ্যালয়ে শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট অনুশীলনের র্বে ছাত্রগণকে কোন গৃহকাজ দেওয়া উচিত নয়। যে শ্রেণীতে যে রকম
কাজ দেওয়া প্রয়োজন প্রথমে সে রকমের যথেষ্ট কাজ ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের
ক্ষকের তত্ত্বাবধানে করাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সময়-পত্রিকায় **শিক্ষকের
ত্ত্বাবধানে কতকগুলি পাঠের** (Supervised Study) **বন্দোবস্ত** করিতে
বে।

(২) ছাত্রের বয়স ও বিকাশ অনুযায়ী গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণের
রতম্য করিতে হইবে। প্রথমে **কেবল পুনরালোচনামূলক কাজ করিতে
রে, তাহার পর প্রয়োগের কাজ করিতে পারে। সর্বশেষে নিজ
ষ্টায় শিক্ষার চেষ্টা করিতে পারে।**

(৩) গৃহকাজের, বিশেষতঃ লিখিত গৃহকাজের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া
ত্রগণকে চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে শিক্ষা দিতে
বে চিন্তা করিয়া ও সাবধানতার সহিত অল্প কাজ করিলেও ছাত্রগণের বেশী
ক্ষা হইবে।

(৪) গৃহকাজ যেন বিদ্যালয়ে প্রদত্ত পাঠের সহায়ক ও অনুপূরক হয়, কিন্তু পাঠের
ন অধিকার না করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৫) লেখা গৃহকাজের সমস্ত ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং তাহার
পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৬) লেখা গৃহকাজ ছাত্রের নিজ কাজ নয় বলিয়া সন্দেহ হইলে শিক্ষক
হার সংশোধন করিবেন না। ছাত্রের জ্ঞান ও তাহার লেখা কাজের প্রকৃতি
uality) তুলনা করিয়া বুদ্ধিমান শিক্ষক সহজে ইহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
র পরও সন্দেহ থাকিলে সেই সম্বন্ধে ২।১টি প্রশ্ন করিলে অথবা বিদ্যালয়ে সে
জ পুনঃ করিতে দিয়া তাহা আরও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

(৭) মধ্যে মধ্যে শ্রেণীতে গৃহকাজ করিতে দিলে ছাত্রের পাঠোন্নতির সঠিক
াপ পাওয়া যাইবে।

(৮) গৃহকাজের জন্য নম্বর দেওয়াও মন্দ নয়। ইহাতে ছাত্র অধিকতর যত্ন
সাবধানতার সহিত গৃহকাজ করিতে উৎসাহিত হয়। তবে তাহা ছাত্রের নিজের
জ নয় বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহার জন্য যে কেবল কোন নম্বর দেওয়া হইবে
তাহা নয়, পূর্বে যে নম্বর দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেও কিছু নম্বর বাদ দিতে

বিভিন্ন স্তরে ছাত্রের গৃহকাজের প্রকৃতি ও পরিমাণ

শিশুশ্রেণী : এই শ্রেণীতে গৃহকাজ দেওয়া আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। কা: এই বয়সের শিশু অন্যের সাহায্য না লইয়া লেখাপড়ার কাজ করিতে পারে না তবে গৃহে তাহার কাজ তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত লোক থাকিলে কেবল প্রাতে ২ ঘণ্টা লেখার ও পড়ার অভ্যাস করিতে পারে।

১ম ও ২য় মান (৬—৭ বৎসর) প্রাতে ২ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১ ঘণ্টা, মোট ৩ ঘণ্ট গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন ও হস্তলিপি।

৩য় ও ৪র্থ মান (৮—৯ বৎসর) প্রাতে ২॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ১॥ ঘণ্টা, মে ৪ ঘণ্টার গৃহকাজ। বিদ্যালয়ে অধীত বিষয় পুনরধ্যয়ন, নামতা শিক্ষা, হস্তলিপি গণিতের অঙ্ক (প্রয়োগ) ইত্যাদি।

৫ম ও ৬ষ্ঠ মান (১০—১১ বৎসর) প্রাতে ৩ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২ ঘণ্টা, মে ৫ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন ও প্রয়োগ (গণিতের অঙ্ক কষা, ব্যাকরণের উদাহ লেখা, অনুবাদ, রচনা ইত্যাদি)।

৭ম ও ৮ম মান (১২—১৩ বৎসর) প্রাতে ৩॥ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ২॥ ঘণ্টা, মে ৬ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ ও নূতন পাঠ শিক্ষার প্রথম চেষ্টা।

৯ম ও ১০ম মান (১৪—১৫ বৎসর) প্রাতে ৪ ঘণ্টা ও সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা, মে ৭ ঘণ্টার গৃহকাজ। পুনরধ্যয়ন, প্রয়োগ, স্বচেষ্টায় নূতন বিষয় শিক্ষা এবং পাঠ্য-বিব অন্য পুস্তক পাঠ।

লেখা গৃহকাজ সংশোধন : লেখা গৃহকাজ মাত্রেরই সংশোধন এক আবশ্যক। কেননা, ভুল সংশোধন না করিলে ছাত্রগণ ভুল শিক্ষা করে। সুতর সংশোধনের ব্যবস্থা না করিয়া লেখা-কাজ দেওয়াই উচিত নয়। অপর দি শিক্ষক লেখা-কাজের ভুল সংশোধন করিয়া দিলেও ছাত্রগণ সকল সময় তা দ্বারা উপকৃত হয় না। কারণ, অনেক সময় তাহারা সংশোধিত লেখা প পড়িয়াও দেখে না। সুতরাং ছাত্রগণের প্রকৃত উপকার হয় এমনভাবে লে কাজ সংশোধনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায়গু অবলম্বন করা যাইতে পারে :

(১) যখনই **সম্ভব ছাত্রগণের দ্বারাই তাহাদের ভুল সংশোধনে ব্যবস্থা করা যায়।** ইহাতে ছাত্রগণ তাহাদের ভুল সম্বন্ধে বেশী সচেতন হয় এ অধিকতর মনোযোগের সহিত শুদ্ধ আকার শিক্ষা করে। যেমন—

(ক) সহজ সহজ ভুলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়া ছাত্রগণকে স্বচেষ্টায় তা সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা নিজে সংশোধন করিতে পারিলেই শিক্ষকের সাহায্যপ্রার্থী হইবে।

(খ) ।পুস্তক দেখিয়া আদর্শ দেখিয়া সংশোধন করা সম্ভব হইলে শ্রেণীর ছাত্রদে মধ্যে খাতা বিনিময় করিয়া তাহাদিগকেই পরস্পরের ভুল সংশোধন করিতে দেও

যাইতে পারে। অন্যের ভুল সংশোধন করিতে গিয়া তাহাদের নিজেরও শিক্ষা হইবে॥

(গ) কেবল এক রকম শুদ্ধ আকার হইলে তাহা ব্ল্যাক-বোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রগণকেই নিজ ভুল সংশোধন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

(ঘ) এক এক জন ছাত্রকে তাহার লেখা পড়িতে দিয়া শ্রেণীর সহযোগিতায় তাহা সংশোধন করা যাইতে পারে। নিম্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রকেই সমস্ত অংশ পড়িতে দিতে হইবে ও তাহা সংশোধন করিতে হইবে। উচ্চ শ্রেণীতে ২।৩ জন ছাত্রকে এক এক অংশ পড়িতে দিয়া এবং তাহা শ্রেণীর সহযোগিতায় সংশোধন করিয়া, অন্য ছাত্রগণকে সেই সেই অংশ সংশোধন করিয়া লইতে বলা যায়। অবশ্য অন্য কেহ সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারে লিখিয়া থাকিলে তাহাকেও তাহার লেখা পড়িতে দিতে হইবে এবং তাহা সংশোধন করিতে হইবে। এইভাবে সংশোধিত কাজ ছাত্রগণকে পুনঃ লিখিতে হইবে এবং শিক্ষককে তাহা দেখাইতে হইবে। (গ্রন্থকার ৯ম এবং ১০ম শ্রেণীতেও এইভাবে অনুবাদ সংশোধন করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে তাহাদের ভুল সংশোধিত হয় ও তাহারা উপকৃত হয়।)

(২) **নিম্ন শ্রেণীর গৃহকাজ যতদূর সম্ভব শ্রেণীতেই সংশোধন করা উচিত, উচ্চ শ্রেণীতেও সময় সময় তাহা করা যায়।** শ্রেণীর ছাত্রগণকে কোন কার্যে নিযুক্ত করিয়া এক এক জন ছাত্রের লেখা-কাজ শ্রেণীতেই সংশোধন করা যায়। ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে—ইহাতে ছাত্রগণকে ব্যক্তিগতভাবে শুদ্ধ আকার শিক্ষা দেওয়া যায়। সুতরাং ইহা নিম্ন শ্রেণীর বেশী উপযোগী। ইহাতে পাঠদান-কার্য স্থগিত রাখিতে হয় বলিয়া উচ্চশ্রেণীতে ইহার বহুল ব্যবহার করা যায় না।

(৩) কতকগুলি লেখা কাজ ছাত্রদের দ্বারা বা শ্রেণীতে সংশোধন করা যায় না। যেমন—**রচনা, সারাংশ** (Substance) এবং উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের **অনুবাদ** সাধারণতঃ শ্রেণীতে সংশোধন করা যায় না। এই সকল বিষয়ে **গৃহকাজের খাতা শিক্ষকের বাড়ীতে লইয়া গিয়া সংশোধন করিতে হয়।**

(৪) কোন ছাত্র যদি মনোযোগ ও যত্নের সহিত গৃহকাজ না করে বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে তাহা না লেখে, শিক্ষক তাহা সংশোধন করিতে অস্বীকার করিবেন এবং ছাত্রকে তাহা পুনঃ করিতে বা লিখিতে দিবেন।

(৫) ব্যক্তিগতভাবে কোন গৃহকাজ সংশোধন করিলে ভুল হওয়ার কারণ দেখাইয়া দিয়াই শুদ্ধ আকার দেওয়া উচিত। শ্রেণীর বাহিরে সংশোধন করিলে **তা ফেরৎ দেওয়ার সময় সাধারণ ভুলগুলি ও তাহাদের শুদ্ধ আকার বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া উচিত** এবং ভুলের কারণ আলোচনা করা কর্তব্য।

(৬) কোন ছাত্র বেশী ভুল করিলে তাহাকে সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিতে দিতে হইবে। কেহ **ভুলের পুনরাবৃত্তি করিলে তাহাকে শুদ্ধ আকার অনেক বার লিখিতে দেওয়া উচিত** এবং সংশোধিত কাজ পুনঃ লিখিয়া

দেখাইবার পূর্বে তাহার নূতন গৃহকাজ সংশোধন করা উচিত নয়। প্রয়োজন হইলে তাহাকে ছুটির পর আটক রাখিয়াও সংশোধন কাজ পুনঃ দেখাইতে পারা যায়। উপরিউক্ত প্রণালীতে গৃহকাজ সংশোধন করিলে, শিক্ষকের কাজের বোঝা হাল্কা হইবে, অথচ ছাত্রগণ বেশী উপকৃত হইবে।

প্রশ্নাবলী

(1) What is the importance of home work in teaching? How the home task can be made effective?

ষোড়শ অধ্যায়

পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠটীকা

[Schemes of Lessons and Lesson Notes]

পাঠতালিকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন বিষয় বা তাহার অংশবিশেষ ধারাবাহিকরূপে শিক্ষা দিতে হইলে বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক বিষয়ের পাঠতালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাহা না করিলে পাঠ্য বিষয়ের কোন অংশ শিক্ষাদানে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হইতে পারে, অপর প্রয়োজনীয় অংশও তাড়াতাড়ি শিক্ষা দিতে হইতে পারে, এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাঠ্য-বিষয় শিক্ষাদান সম্ভব না হইতে পারে। সুতরাং সমস্ত বৎসরের শিক্ষাদান-কার্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বৎসরের প্রথমে প্রত্যেক পাঠ্য-বিষয়ের পাঠতালিকা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন।

পাঠতালিকা প্রস্তুত করার পদ্ধতি

পাঠতালিকা প্রস্তুত করার জন্য প্রথমে সময়-পত্রিকা (time-table) দেখিয়া সমস্ত বৎসরে এবং তাহার এক এক ভাগে (terms) কোন্ বিষয়ে কতগুলি পাঠ দেওয়া যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে হইবে। বন্ধের দিনগুলি বাদ দিয়াই কাজের দিনের সংখ্যা স্থির করিতে হইবে। তাহার পর সেই বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচি (syllabus)-কে প্রথমে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের জন্য সমগ্র বৎসরের যতটা ভাগ (terms) করা হয়, তত ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। পরিশেষে পাঠ্যসূচির এক এক ভাগকে বৎসরের এক এক ভাগে যতগুলি পাঠ দেওয়া সম্ভব তত পাঠে বিভক্ত করিয়া পাঠতালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। পাঠ্য-পুস্তকের পৃষ্ঠার হিসাবে পাঠের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিয়া এক এক পাঠে কতটা বিষয় শিক্ষা দেওয়া সম্ভব অথবা পাঠ্যসূচির এক এক বিষয়-এককে (subject unit) কতগুলি পাঠ দেওয়া প্রয়োজন তাহা স্থির করিয়াই পাঠের পরিমাণ ও সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হইবে। বিষয়ের বিভিন্ন অংশের কাঠিন্য ও গুরুত্বানুযায়ীও তাহাতে পাঠের সংখ্যার তারতম্য হইবে। ইহা ছাড়া বৎসরের প্রত্যেক ভাগের শেষে পুনরালোচনার জন্য কয়েকটি পাঠ রাখিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাঠে নূতন বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ইতিহাসের পাঠ-তালিকা

শ্রেণী—পঞ্চম মান। সময়—বৎসরের প্রথম ভাগ (জানুয়ারী—এপ্রিল)।
পাঠ্য-সূচি—প্রথম হইতে হর্ষবর্ধন। পাঠ-সংখ্যা—৩৮।

ময়	বিষয়াংশ	পাঠ-সংখ্যা
ানুয়ারী ঃ	ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থা ও ইতিহাসের উপর তাহার প্রভাব	১
	ভারতের আদিম অধিবাসী	২
	আর্যজাতির আদিম বাসস্থান, তাহাদের ভারত-আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন	৩
	আর্যজাতির ধর্ম ও সমাজ	৩
	রামায়ণের গল্প ও ঐতিহাসিক তথ্য	১
ফেব্রুয়ারী ঃ	মহাভারতের গল্প ও ঐতিহাসিক তথ্য	১
	বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ	১
	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও তাহার ফলাফল	২
	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ইতিহাস	১
	মেগাস্থিনিসের ভারত-বিবরণ	১
	মহামতি অশোক	২
	শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের ইতিহাস	১
	অন্ধ্র সাম্রাজ্য	১
ার্চ :	গ্রীক ও শক আক্রমণ	১
	কণিষ্কের ইতিহাস	১
	গুপ্তবংশ—	১
	চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত	১
	দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত	১
	পরবর্তী গুপ্ত সম্রাট্‌গণ	১
	ফাহিয়ানের ভারত-বিবরণ	১
	গুপ্ত সভ্যতা	১
	হূণগণ ও যশোবর্মন	১
	হর্ষবর্ধন	১
	হিউয়েন্‌সাঙের ভারত বিবরণ	১
প্রিল ঃ	পুনরালোচনমূলক পাঠ	৮
	মোট পাঠসংখ্যা	৭৮

পাঠ-টীকা
Lesson-notes

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার প্রয়োজনীয়তা :

দক্ষতার সহিত যে-কোন জটিল কার্য সম্পন্ন করিতে হইলে কার্যে প্রবৃত্ত হইবা পূর্বেই তাহার জন্য সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রস্তুত করা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান-কৌশল সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজে উপলব্ধি হইবে যে, কার্যারম্ভের পূর্বে পাঠদানের সুচিন্তিত কর্মসূচি প্রস্তুত না করিয়া ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ না করিয়া পাঠদানের ন্যায় জটিল কার্য দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করা ও তাহাতে সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়। **পাঠ-টীকাই পাঠের পূর্বকল্পিত কর্মসূচী**। যত্নের সহিত পাঠ-টীকা প্রস্তুত না করিয়া পাঠদানের চেষ্টা করিলে শিক্ষকের পদে পদে ভুল হইবে, সময় ও শক্তির অপব্যয় হইবে, লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া বা ভুল পন্থার অনুসরণ করিয়া তিনি ছাত্রকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাইতে অসমর্থও হইতে পারেন। ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কেবল কোন বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকিলেই ভাল পাঠ দেওয়া যায় না। পাঠদানের পূর্বে শিশুর শক্তি ব বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট না করিলে, তাহা ঠিক ভাবে গুছাইয়া না লইলে, কি পর্যায়ে ও পদ্ধতিতে তাহা শিশুর নিকট উপস্থিত করিতে হইবে স্থির না করিলে, এবং যে যে প্রদীপনের সাহায্যে তাহা চিত্তাকর্ষক করিতে হইবে ও শিশুর মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে সেগুলি প্রস্তুত না করিলে, পাঠদান-কার্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। পাঠদানের পূর্বে পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিলেই এই সমস্ত বি শিক্ষকের প্রয়োজনীয় মনোযোগ লাভ করিতে পারে এবং তিনি সকল দিকে দৃ রাখিয়া দক্ষতার সহিত পাঠ দিতে পারেন। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের সুচিন্তি পরিকল্পনা (plan), চিত্রকরের পক্ষে যেমন চিত্রের খসড়া-নক্সা (plan in outline শিক্ষকের পক্ষে তেমন পাঠ-টীকা। অবশ্য শিক্ষকের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় শিক্ষা (profe sional Training) ও অভিজ্ঞতার পরিমাণানুযায়ী প্রস্তুত হওয়ার কাজের পরিমা কমবেশী হইবে। কিন্তু পূর্বে কিছুমাত্র প্রস্তুত না হইয়া কেহই পাঠদান-কার্যে, বিশেষত অল্পবয়স্ক ছাত্রদের শ্রেণীতে, পাঠদান-কার্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না।

পরিকল্পনার সাধারণ কতকগুলি প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন—(১) সময় শক্তির অপচয় নিবারণ করে। (২) শিক্ষককে শৃঙ্খলাপরায়ণ করিয়া তুলে। (৩) বিষ ও কাজের সুপরিচালনায় প্রেরণা দেয় ও (৪) বিশৃঙ্খল এবং চিন্তাশূন্য শিক্ষা প্রতিবন্ধক হয়।

পাঠ-টীকা প্রস্তুত করিবার প্রণালী

(১) **বিষয়-নির্বাচন ও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ**—পাঠ-টীকা প্রস্তু করিবার জন্য শিক্ষককে সর্বপ্রথমে শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্য-বিষয় নির্বাচন করিতে হইবে এবং তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কেবল শ্রেণীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া তিনি ভাল পাঠ দিতে পারিবেন না।

(২) **পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণ**—তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানদান ও শিশুর কাশের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লক্ষ্য নির্দিষ্ট করিতে হইবে।

(৩) **বিষয়ের পরিমাণ নির্ধারণ ও তাহা ঠিকভাবে সাজান**—ছাত্রের স ও মানসিক বিকাশানুযায়ী পাঠ্য-বিষয়ের পরিমাণ স্থির করিতে এবং তাহাদের ক্ষালাভের উপযোগী আকারে তাহাকে সাজাইতে হইবে। ইহার পর পাঠ্য-ষয়কে কয়েকটি স্বাভাবিক ভাবে বিভক্ত করিয়া এক এক শীর্ষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রিতে হইবে। তবে সাধারণতঃ তিন শীর্ষের বেশী করা উচিত নয়।

(৪) **পাঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ**—ছাত্রের বিকাশ ও বিষয়ের উপযোগী ঠদান-পদ্ধতি নিরূপণ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের জন্য পাঠদান-দ্ধতির কি কি সোপান ব্যবহার করা যায় এবং বিভিন্ন সোপানে কি কাজ করা য়োজন তাহাও স্থির করিতে হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঠদান-পদ্ধতির ব্যবহার ইতিপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে।

(৫) **প্রয়োজনীয় শিক্ষাকৌশল, শিক্ষাসরঞ্জাম ও প্রদীপন নির্ধারণ**—শুকে শিক্ষালাভ-কার্যে সাহায্য করার জন্য, পাঠ তাহার নিকট চিত্তাকর্ষক করার এবং পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার জন্য কি কি শিক্ষা-কৌশল, শিক্ষা-ঞ্জাম ও প্রদীপনের ব্যবহার করিতে হইবে তাহাও পূর্বে নির্ধারণ করা প্রয়োজন ও য়াজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা আবশ্যক।

(৬) **বিভিন্ন সোপানের উপযোগী প্রশ্ন প্রস্তুত করা**—পাঠদানের সময় ন কিরূপ প্রশ্ন করিতে হয় তাহা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই প্রশ্নগুলি র্ব প্রস্তুত করিয়া পাঠ-টীকায় লিখিয়া রাখিলে পাঠদান-কার্যে যথেষ্ট সাহায্য হয়। ব সকল সময় যে, সেই প্রশ্নগুলিই করিতে হইবে তাহা নয়। সেইগুলি নমুনার মত জ করিবে; কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনমত অন্য প্রশ্ন করিবারও ক্ষমতা চাই।

(৭) **নূতন জ্ঞান প্রয়োগের ব্যবস্থা**—অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিতে না রিলে শিশুর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং প্রত্যেক পাঠদানের সঙ্গে সঙ্গে শিশু াতে তাহার অর্জিত জ্ঞানের ব্যবহার করিতে শিখে তাহার ব্যবস্থাও করিতে বে। বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের বিভিন্ন আকারে এই ব্যবস্থা করা যায়।

(৮) **শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে কর্মবিভাগ**—কোন্ স্তরে শিক্ষক কি কাজ রবেন এবং ছাত্র কি কাজ করিবে, তাহাও পাঠ-টীকায় দেখাইতে হইবে। ছাত্র পেক্ষ শ্রোতা না সাজিয়া যাহাতে পাঠদান-কার্যে শিক্ষকের সহিত সহযোগিতা রতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। বস্তুতঃ শিক্ষা করা প্রধানতঃ ছাত্রের জ। শিক্ষক তাহাকে এই কাজে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সুতরাং যেই জ ছাত্র নিজ চেষ্টায় করিতে পারে তাহা শিক্ষকের করা উচিত নয়। যেমন, ন বিষয় ছাত্রের জানা থাকিবার সম্ভাবনা থাকিলে তাহা শিক্ষক না বলিয়া প্রশ্নের াধ্যে ছাত্রের নিকট হইতে আদায়ের চেষ্টা করিতে হইবে। ছবি মানচিত্র াাদির ব্যবহার, বোর্ডে লেখা ইত্যাদি কাজ যতদূর সম্ভব ছাত্রদিগের দ্বারা করাইতে বে। পুনরালোচনা, সারাংশ-গঠন প্রভৃতিও প্রধানতঃ ছাত্রের কাজ। শিক্ষক

প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদিগকে এই কার্যে সাহায্য করিতে পারেন মাত্র। সর্বোপ
ছাত্রের মানসিক সহযোগিতা ভিন্ন তাহাকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায় ন
শিক্ষালাভের জন্ত ছাত্রের মানসিক প্রচেষ্টাকেই তাহার মানসিক সহযোগিতা বলে
পাঠদানের সময় ছাত্র মানসিক প্রচেষ্টা করিতেছে কিনা তাহার প্রতি শিক্ষকে
বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পাঠ-পরিকল্পনার রূপ

বিভিন্ন ধরণের পাঠ-পরিকল্পনা হইতে পারে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে প
পরিকল্পনা বিভিন্ন হয়। আবার বিষয় অনুযায়ীও পরিকল্পনা করিতে হয়। যেমন
(১) নোট খাতায় সংক্ষিপ্ত দৈনিক পরিকল্পনা। (২) পৃথক্ খাতায় বা কাগ
দৈনিক পাঠের বিস্তৃত পরিকল্পনা। (৩) এক এক টার্মের পাঠের সংগি
পরিকল্পনা। (৪) কোন কাজ বা বিষয়ের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা। প্রজেক্টের পরিক
ইহার পর্যায়ভুক্ত। (৫) কোন ইউনিটের পাঠের রূপরেখা। ইহা শিক্ষক ছ
উভয়ের কাজে লাগে। (৬) প্রতিদিনের কাজের বা পাঠের অগ্রগতির এ
পরিকল্পনা। (৭) ওয়ার্কবুক-অনুশীলনী ইত্যাদি যাহা পুস্তকের সঙ্গে থাকে
প্রত্যেক পাঠের শেষে সাহায্যের জন্ত দরকার হয়। (৮) শিক্ষকের শ্রেণী-পাঠে
জন্ত তাড়াতাড়ি তৈরী সামান্ত নোট ও মন্তব্য।

১। **সংক্ষিপ্ত দৈনিক পরিকল্পনা**—অনেক প্রধান শিক্ষক চান তাঁ
স্কুলের শিক্ষকরা যেন প্রত্যেকে একটি করিয়া সাধারণ পরিকল্পনা বই রাখেন।
পরিকল্পনা বই অনেক সময় জেলা শিক্ষা-পর্ষদ, শিক্ষা-বিভাগ বা স্কুল হইতে দে
হইয়া থাকে। ইহাতে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্ত ফর্ম ছাপা থাকে। শিক্ষক
ফর্মে দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাজের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা লিখিবেন। অনেক শি
পরিচালকের মতে এইটি প্রগতিপঞ্জী রক্ষা, নিয়মিত পাঠদান এবং কোন শিক্ষক
অনুপস্থিতিতে অন্ত শিক্ষক দ্বারা শ্রেণী পাঠনার ব্যাপারে অত্যন্ত কাজ দেয়। ত
অনেক শিক্ষক এই সংক্ষিপ্ততম বিবরণী রাখিতেও নারাজ। তাঁহারা মনে ক
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং শিক্ষণ কেন্দ্রের শিক্ষাই বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের প
যথেষ্ট। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষক পরিকল্পনার কার্যকারিতা বুঝেন ও বিদ্যালয় কর্তৃপ
নির্দেশ না পাইলেও পাঠনার জন্য পরিকল্পনা তৈরী রাখেন।

২। **দৈনিক পাঠের বিস্তৃত পরিকল্পনা**—অনেক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যাল
পাঠদান অভ্যাসের (Teaching practcie) সময় অনুরূপ বিস্তৃত পাঠ-পরিক
করিয়া থাকেন। এই সব পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে প্রধানতঃ
রাখা হয়:

(ক) পাঠদানের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। (খ) উপকরণ এবং উপাদান। বিষ
ইহার পর্যায়ভুক্ত। (গ) উপায় বা পদ্ধতি। (ঘ) প্রগতি অভীক্ষা।

অনেক সময় পাঠ-পরিকল্পনা দুইটি ভাগে লেখা হয়। বাম দিকে বিষ
ডান দিকে পদ্ধতি। ইহাতে এলোমেলো বা বিশৃঙ্খলভাবে পাঠদানের কোন আ

কে না। কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যক্রমে পার্বিক বা সাপ্তাহিক পরিকল্পনা ভিন্নরূপ। খানে পাঠের ভিত্তিতে কাজের পরিকল্পনা করিতে হইবে। সারা বৎসরে সম্বন্ধিত ঠের উপযোগী কাজের পরিকল্পনা প্রত্যেক পর্বে সামগ্রিক কাজের কোন্ কোন্ শ করান হইবে ও সেই সেই কাজের মাধ্যমে কোন্ কোন্ বিষয়ের কোন্ কোন্ ঠ দেওয়া যাইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ থাকিবে।

৩। **এক পর্ব ও টার্মের সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা**—এক একটি পর্ব বা টার্মের রকল্পনা অধুনাতন কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। এই পার্বিক পরিকল্পনা ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের নির্দিষ্ট অংশ কয়েকটি নির্দিষ্ট পাঠের ধ্যমে এক পর্বে দেওয়া যাইবে। কাজের ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া এই পরিকল্পনা ণ করা হয়। এই অধ্যায়ের প্রথমে একটি পার্বিক পরিকল্পনার দৃষ্টান্ত দেওয়া য়াছে।

৪। **বিষয়-এককের unit) পরিকল্পনা**—প্রজেক্টের মতে কোন একটি স্যা সমাধানের মাধ্যমে শিক্ষাদান কার্যের পরিকল্পনা এই বিভাগের অন্তর্গত। য়েকটি বিষয় একক মিলিয়া এক একটি পর্বের পরিকল্পনা গড়িয়া উঠে। এই ধরণের রিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয় :

(ক) শিক্ষণীয় বিষয়। (খ) বিষয়-এককের (unit) লক্ষ্য। (গ) পঠিতব্য কাদি। (ঘ) সূচনা বা ভূমিকা। (ঙ) পদ্ধতি (চ) প্রগতি অভীক্ষা (test)।

এই পরিকল্পনার সুবিধা হইল, ইহার দ্বারা ছাত্রদের উপযোগী কাজের ব্যবস্থা করা য় এবং দিন-তেন প্রকারে দৈনিক পাঠদানের কুফল হইতে মুক্ত থাকা যায়। অবশ্য ই ধরণের পরিকল্পনায় পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়, প্রতিটি কাজ ও প্রগতির সঠিক হিসাব খতে হইবে।

৫। **সাহায্য পুস্তক**—অনেকটা নোটবই জাতীয়। শিক্ষক-কর্তৃক রচিত হায্যপুস্তক পাঠ্যপুস্তক পাঠে ও অনুশীলনে ছাত্রদের সহায়তা করে। অবশ্য ইহাকে নোট বইর পর্যায়ভুক্ত বলা যায় না। বিষয়-এককের মত ইহাকেও মোটামুটি টি ভাগে ভাগ করা চলে। এই সাহায্য পুস্তক বা অনুশীলনী পাঠের সময় ত্রদের হাতে দেওয়া হয়। অবশ্য মনে রাখা দরকার ইহা অবশ্য পাঠ্য নয়—পাঠ্য-ক ভালভাবে অনুসরণ করিবার জন্য সাহায্য পুস্তক মাত্র।

৬। **অনুশীলনের পরিকল্পনা**—কোন বিষয়কে ভালভাবে শিক্ষা দিবার জন্য তটি পাঠের পর অনেক শিক্ষক অনুশীলনের ব্যবস্থা করেন। ইহার জন্য তিনি শীলনের পরিকল্পনা করেন ও সেইগুলি শ্রেণীতে ব্যবহার করেন। এই ধরণের রকল্পনা যেমন শিক্ষার্থীর শিক্ষার পক্ষে সহায়ক, তেমনি শিক্ষকের পক্ষেও রম্ক্রমিক শিক্ষার পথপ্রদর্শক।

৭। **ওয়ার্কবুক**—বিভিন্ন বিষয় শিক্ষার জন্য অনেক সময় বাজারে প্রস্তুত রিকল্পনা পাওয়া যায়। ইহার ফলে অনেক শিক্ষকই পাঠ-পরিকল্পনা হইতে বিরত ন। এই সব ওয়ার্কবুক শিক্ষককে পাঠ-পরিকল্পনায় ও পাঠদানে সাহায্য করে। য়ার্কবুক প্রদীপন হিসাবে অনেক সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৮। **অপরিচ্ছন্ন নোট ও মন্তব্য**—অনেক সময় শিক্ষক পাঠের কে
পরিকল্পনা করেন না। পাঠদানের জন্য তাড়াতাড়ি কোনক্রমে দুই-একটি জি
টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখেন। বলা হইয়া থাকে কোন চিন্তা না করিয়া শ্রেণী
পাঠদান অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। কিন্তু ইহা পরিকল্পনাই নয়—ইহা না করা
সামীল।

উত্তম পাঠ-পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য—যে কোন পাঠ-পরিকল্পনার সময় শিক্ষ
উপাদানসমূহ পর্যায়ক্রমে সন্নিবেশ করিবেন। অনেকে পাঠ-পরিকল্পনায় হার্বা
পঞ্চসোপান পদ্ধতি অনুসরণ করেন। যেমন—প্রস্তুতি (preparation), উপস্থা
(presentation), তুলনা (comparison), সামান্যকরণ (generalisatic
এবং প্রয়োগ (application)। অনেকে ডিউইর মত কোন সমস্যাকে কে
করিয়া পরিকল্পনা করেন। তবে পরিকল্পনা করিবার সময় নিম্নোক্ত বিষয়গু
দিকে লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয় :

(১) বিষয় বা সমস্যার বিবরণী। (২) বিষয়-একক বা পাঠের পরি
নিধারক। (৩) সুনির্বাচিত উপাদান, সরঞ্জাম ও প্রদীপন নিধার
(৪) প্রয়োজন স্থলে ভূমিকা। (৫) পদ্ধতি নিরূপণ। (৬) বক্তৃতা রচনা ইত্যা
কাজের নির্দেশ। (৭) উপযুক্ত প্রশ্ন প্রস্তুত করা। (৮) স্বয়ং অভীক্ষা। ছাত্র
নিজেরাই প্রগতির পরীক্ষা করিবে। (৯) সূত্র গঠন ও সমাপ্তি। (১০) শিক্ষক
ছাত্রের কর্মবিভাগ।

সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন সব ভাল পাঠ-পরিকল্পনাই পরিবর্তনশী
পরিবেশের ও শ্রেণীর অবস্থার প্রতিকূল পাঠ-পরিকল্পনা ব্যবহার করা উচিত ন
শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষক পরিকল্পনা রচনা করিবেন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is the importance of lesson plan in class teaching ?
2. What are the criteria of a good lesson plan ?

সপ্তদশ অধ্যায়

পরীক্ষা (Examination)

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের সঙ্গে পরীক্ষার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। পড়াশুনা থাকি
পরীক্ষা থাকিবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর মানুষের জ্ঞানের ও পড়াশুন
পরিমাপ করিবার প্রথা দীর্ঘদিনের। সাম্প্রতিক পরীক্ষার লক্ষ্য ও পদ্ধ
সম্পর্কে বিবিধ সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠিলেও এখনও পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কে
সন্দেহ জাগে না।

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য—(১) পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী
ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। কোন বিষয়ে বা কাজে শিক্ষার্থী কত

ান বা দক্ষতা অর্জন করিয়াছে তাহার পরিমাপ করা হইয়া থাকে। একটি শ্রেণীর দলগত উন্নতিও এই পরীক্ষার মাধ্যমে স্থির করা যায়।

(২) ব্যক্তিগত ও দলগত উন্নতি যেমন পরীক্ষা দ্বারা পরিমাপ করা যায়, তমনি শ্রেণী-শিক্ষকেরও শিক্ষাদান কার্যের পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষ ভাবে করা না হইলেও পরোক্ষ-ভাবে করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি বুঝা ায় পরীক্ষার ফলাফল হইতে এবং সেই ফলাফলের মান হইতে শিক্ষক কি ভাবে াহার শিক্ষাদান-কার্য করিয়াছেন তাহার পরিমাপ করা যায়।

(৩) পরীক্ষার ফলাফলের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়। পরীক্ষার লাফল কোন একটি নির্দিষ্ট মান সূচিত করে। পরীক্ষা গ্রহণের অন্যতম উদ্দেশ্য ইতেছে শিক্ষার পরবর্তী গুরে প্রবেশ করিবার অধিকার ছাত্র-ছাত্রীকে দান করা।

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা যে কেবল শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞানের পরিমাপ রা হয়, তাহা নয়। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করিতে হইলে অধ্যবসায়, পরিশ্রম, ধর্য, নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি জিনিসের প্রয়োজন এবং ইহা তাহার বৃদ্ধি পাইয়া াকে। সুতরাং পরীক্ষার মাধ্যমে শুধু বিষয়গত বুৎপত্তিই জানা যায় না, শিক্ষার্থীর ন্যান্য গুণাবলীও জানা যায়।

(৫) পরীক্ষা পড়াশুনায় প্রেরণা (incentive) দান করে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক উভয়েই ইহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রকৃত পক্ষে পরীক্ষার চাপেই র্তমান সময়ে পড়াশুনা করিয়া থাকে।

(৬) অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন যে, পরীক্ষার একমাত্র কাজ হইল পরিচালনা। পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষক স্থির করেন কোথায় তাঁহার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কোথায় তাঁহার সাফল্য। আবার শিক্ষার্থীও নিজের দোষ ত্রুটি সাফল্য ইত্যাদি পরীক্ষার ফলেই বুঝিতে পারিয়া থাকে।

(৭) পরীক্ষা শ্রেণী-নির্ণায়ক। পরীক্ষা দ্বারা স্থির হয় কে কোন্ শ্রেণীর যাগ্য, কাহাকে পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হইবে, কাহাকে দেওয়া হইবে না।

প্রচলিত পরীক্ষার ত্রুটি—(১) পরীক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ এই যে, পরীক্ষা সমগ্র পাঠ্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। পরীক্ষার াহিদা অনুসারে পাঠ্যক্রম অদল-বদল করা হয়। যেমন—নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী চতুর্থ শ্রেণীর শষ পরীক্ষা দিয়া থাকে। নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যে শিল্প শিক্ষা করিয়া থাকে, গণতান্ত্রিক জীবন যাপন করিতে শিক্ষা করে, তাহার কোন রীক্ষা হয় না। যে সব বিষয় পরীক্ষার অন্তর্গত তাহাদের উপরই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়, অথচ অন্য যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইল, তাহার কোন রীক্ষা হইল না। কাজেই দেখা গেল পরীক্ষা-ব্যবস্থা পাঠ্যক্রমকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

(২) প্রচলিত পরীক্ষায় সমগ্র পাঠ্যসূচী হইতে পরীক্ষার প্রশ্ন করা সম্ভব হয় না, অর্থাৎ সমগ্র পাঠ্যসূচি সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করিল কিনা তাহা বুঝা যায়

না। শিক্ষক-শিক্ষিকা পরীক্ষার প্রশ্ন আঁচ করিতে পারেন এবং সেইভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রস্তুত হইতে বলেন। ইহার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্র পাঠ্যসূচি পড়ে না, বাছিয়া বাছিয়া মুখস্থ করে এবং এর ফলে পাঠ্যসূচির অনেক অংশ সম্বন্ধেই ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান লাভ করে না।

(৩) প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একটি অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

(৪) প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপর একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। পিতামাতা-অভিভাবক-শিক্ষক সকলের বেশী রকম চাপের দরুন ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বৈকল্য দেখা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ক্ষতি হয় এবং মানসিক বিকৃতিও দেখা গিয়া থাকে।

(৫) পূর্বে পরীক্ষার একটি পরোক্ষ উপকারিতা আছে বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌গণ বলিতেন। তাঁহারা বলিতেন যে পরীক্ষার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের মানসিক শৃঙ্খলা হয়। কিন্তু বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে, পরীক্ষা পদ্ধতির চাপে মানসিক বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়।

(৬) অনেকে মনে করেন প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি মোটেই নির্ভরযোগ্য নয় যেমন—যদি পরীক্ষক একই বিষয়ের উপর দুই বার পরীক্ষা লন, এবং যদি তিনি দুই বার খাতা পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তবে দেখা যাইবে পরীক্ষার্থী দুই বার দুই রকম নম্বর পাইয়াছে। আবার যদি একই পরীক্ষার খাতা দুই জন পরীক্ষক পরীক্ষা করিয়া দেখেন তবে দেখা যাইবে যে, দুই জন পরীক্ষক দুই রকম নম্বর দিয়াছেন। এই নির্ভরযোগ্যতার অভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহারা কয়েকটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন।

(ক) ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিবার সময় নানারূপ জটিল শারীরিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে থাকে। এই অবস্থার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন রূপ পরীক্ষা দিয়া থাকে।

(খ) পরীক্ষায় যে প্রশ্ন দেওয়া হয়, সেই প্রশ্ন সমগ্র জ্ঞান-ভাণ্ডারের এক অংশের উপর মাত্র অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের সমগ্র পাঠ্য-বিষয়ের জ্ঞানের উপর পরীক্ষা হয় না, জ্ঞানের অংশের উপরমাত্র হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাফল্যের ক্ষেত্রে তারতম্য দেখা যায়।

(গ) পরীক্ষক যে প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্ন সমগ্র পাঠ্য-পুস্তকের উপর করিতে পারেন না। ফলে উহা আংশিক পরীক্ষা হয় মাত্র। দেখা গিয়াছে, একই খাতা বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে বিভিন্ন নম্বর পাইয়া থাকে। পরীক্ষায় নম্বরের কম-বেশী অনেকটা পরীক্ষকের উপর নির্ভরশীল। একই রচনা পরীক্ষাতে দেখা যায় একজন পরীক্ষক সর্বোচ্চ নম্বর দিয়াছেন আবার আর একজন দিয়াছেন সর্বনিম্ন নম্বর মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানসিক অবস্থা, ক্লান্তি, খাদ্য ইত্যাদি পরীক্ষকদের নম্বর দানে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(ঘ) পরীক্ষকের রুচি, পছন্দ, ব্যক্তিগত ধারণা ইত্যাদির জন্যও পরীক্ষার র্ভরযোগ্যতার অভাব দেখা যায়। সেইজন্য এই পরীক্ষা-পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত নীতি বা Subjective type বলিয়া থাকি। রচনাধর্মী পরীক্ষায় পরীক্ষকের নের ভাব, ব্যক্তিগত ধারণা বিশ্বাস, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি অধিক পরিমাণে তিফলিত হইতে দেখা যায়।

(৭) সভ্যতার অভাব। অনেক সময় দেখা যায় যে, যে জ্ঞান পরিমাপ রিবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই জ্ঞানের পরিমাপ না করিয়া অন্য নের পরিমাপ করা হইয়াছে। যেমন—ভূগোল পরীক্ষার কথা। ভূগোল রীক্ষায় উত্তর লিখিতে গিয়া পরীক্ষার্থী হয়ত বানান ভুল বা বাক্য রচনায় ভুল বিল পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সেই ভুল ধরিয়া কম নম্বর দিলেন। পরীক্ষক নেক সময়েই অবান্তর বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন, আসল ষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় না।

(৮) প্রয়োগশীলতার অভাব। প্রয়োগশীলতা বলিতে বুঝায় সঠিক উত্তর ওয়ার ক্ষমতা আর মূল্যায়ন স্থির করার সুবিধা। প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় শ্নগুলি কিছুটা অস্পষ্ট। পরীক্ষক ঠিক কতটুকু জানিতে চান তাহা পরিষ্কার াবে বুঝা যায় না পরীক্ষার্থী নিজের ইচ্ছামত উত্তর দেয়। আবার নম্বর দিবার কোন নির্দিষ্ট মান নাই।

আধুনিক পরীক্ষা

পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটি আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পরীক্ষার প্রশ্ন ও রীক্ষাকার্যে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতির আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি। পরীক্ষা কার্যে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি বর্জন করিয়া নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি অবলম্বন করাই আধুনিক পরীক্ষার দেশ্য। অবশ্য এই জাতীয় পরীক্ষাও যে একান্ত নির্ভুল তাহা মনে করিবার কোন ারণ নাই। এই পরীক্ষা পদ্ধতি তিনটি স্তরে বিভক্ত :

(১) প্রশ্নপত্র রচনা। (২) উত্তর দিবার পদ্ধতি। (৩) মূল্যায়ন করিবার পদ্ধতি।

এই তিনটি ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রথম ক্ষেত্রে ব্যক্তিমুখী পদ্ধতির প্রভাব রহিয়াছে, স্ত মূল্যায়ন করিবার পদ্ধতিতে কোন ত্রুটি দেখা যায় না।

নূতন ধরণের পরীক্ষা বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। যেমন—(১) সত্য-মিথ্যা শ্ন (True-False Test), (২) শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন (Multiple choice Test), ৩) সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন (Completion Test), (৪ সামঞ্জস্য সন্ধান (Matching est), (৫) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short answer Test) ও (৬) সাদৃশ্য নুসারে সাজানোর প্রশ্ন।

১। **সত্য-মিথ্যা প্রশ্ন** (True-false Test): ইহাতে সত্য ও মিথ্যা শ্রিত থাকে এবং তাহার মধ্য হইতে সত্য কথাগুলি বাছিয়া লইয়া চিহ্নিত করিতে য়। যেমন—

(ক) ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ হয় · সত্য/মিথ্যা

(খ) আকবর একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন ·· সত্য/মিথ্যা

(গ) জগদীশচন্দ্র নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন সত্য/মিথ্যা
(ঘ) তেল জল অপেক্ষা হাল্কা ... সত্য/মিথ্যা

২। **শুদ্ধ উত্তর নির্বাচন** (Multiple choice) : নানাপ্রকার উত্তর হইতে শুদ্ধ উত্তর বাছিয়া লওয়ার প্রশ্ন। যেমন—

(ক) ওয়াশিংটন, (খ) লিন্‌কলন, (গ) কলাম্বাস—আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

৩। **সামঞ্জস্যকরণ** (Matching Test) : দুই শ্রেণীর কতকগুলি বস্তু বা তথ্য হইতে সম্পর্কযুক্ত দুই দুই বস্তু বা তথ্য বাছিয়া লইয়া যুক্ত করা। যেমন—

৪৮৩ খৃঃ পূঃ	পাণিপথের ৩য় যুদ্ধ হয়।
১৭৬১ খৃঃ অঃ	পলাশীর যুদ্ধ হয়।
১৭৫৭ খৃঃ অঃ	বুদ্ধদেবের মৃত্যু হয়।

৪। **সম্পূর্ণ করার প্রশ্ন** (Completion Test) :

(ক) কলম্বাস……খ্রীস্টাব্দে……মহাদেশ আবিষ্কার করেন।

(খ) বাবর……খ্রীস্টাব্দে……কে………যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দিল্লী সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৫। **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন** (Short answer Test) :

(ক) মাধ্যাকর্ষণ কে আবিষ্কার করেন? (খ) কোন্ বৈদেশিক আক্রমণকারী সর্বপ্রথম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? (গ) ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম ভারত-সম্রাট কে? (ঘ) কোন্ দেশকে এশিয়ার ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বলা হয়? (ঙ) কোন্ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী?

৬। **সাদৃশ্যানুযায়ী শ্রেণী-বিভাগের প্রশ্ন**। যেমন—মানুষ, ছাগল, মেষ, বানর, বিড়াল, শিয়াল, কুকুর, বাঘ, শশক, ইঁদুর।

আধুনিক পরীক্ষা (Objective Tests)-**র অনেক সুবিধা আছে**। যেমন—
(১) ইহাতে উত্তরের মূল্য নিরূপণ পরীক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী বা সাময়িক ভাববৃত্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় না। (২) ইহাতে পরীক্ষার্থীর ও পরীক্ষকের সময়ের মিতব্যয়িতা হয়। (৩) ইহাতে বেশী প্রশ্ন করা যায় এবং নানা প্রকারের প্রশ্ন করা যায়। সুতরাং পরীক্ষার্থীর জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে ও সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা যায়। (৪) ইহাতে ঠিক ভাবে প্রকাশের ক্ষমতা হইতে পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের পরীক্ষা বেশী হয়। (৫) ইহাতে প্রশ্নের সোজাসুজি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে হয়। সম্পর্কশূন্য অবান্তর দীর্ঘ উত্তর দেওয়ার সুযোগ থাকে না। (৬) নূতন ধরণের পরীক্ষায় ছাত্র ছাত্রীকে সমগ্র পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তু পড়িতে হয়। (৭) নূতন ধরণের পরীক্ষাগুলি নির্ভরযোগ্য! কারণ, পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নে কোনরূপ প্রতিফলিত হয় না।

আধুনিক পরীক্ষার ত্রুটি

(১) ইহাতে কেবল তথ্যের জ্ঞান পরীক্ষিত হয়। তাহা ঠিকভাবে প্রকাশের শক্তি পরীক্ষিত হয় না।

(২) ইহাতে জ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষমতা ঠিকভাবে পরীক্ষিত হয় না।

(৩) ইহার দ্বারা সকল বিষয়ের ভাল পরীক্ষা করা যায় না। যেমন—ভাষা, অঙ্ক, তর্কশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি। কারণ এইসকল বিষয়ে নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়া যায় না।

(৪) অধ্যাপক Sandiford-এর মতে ইহাতে অনেক সময় আন্দাজে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়।

(৫) এই প্রশ্ন তৈয়ার করিতে যথেষ্ট সময়ের ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। বর্তমান সময়ে বিশেষভাবে আমেরিকার বিদ্যালয়সমূহে ৩য় প্রকারের অন্য এক পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। ইহাকে **আদর্শের সাহায্যে পরীক্ষা** (Standard or Norm Tests) বলে। ইহাতে এক একটা আদর্শের সাহায্যে উত্তরের মূল্য নিরূপণ করা হয়। যেমন—কতকগুলি আদর্শ লেখার সহিত তুলনা করিয়া শিশুর হাতের লেখার মূল্য নিরূপণ করা যায়। সেইরূপ অঙ্কন, বানান এবং বাক্য-গঠন বা রচনা (Composition) ইত্যাদিও আদর্শের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায়।

অবশ্য সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নের সাহায্যে পরীক্ষার ন্যায় আদর্শের সাহায্যে পরীক্ষাও সকল বিষয়ের উপযোগী নয়। যেমন—অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত প্রভৃতি আদর্শের সাহায্যে পরীক্ষা করা যায় না। তবুও আমেরিকার শিক্ষাবিদ্‌গণ ইহাতে নিরুৎসাহিত না হইয়া যত বেশী বিষয়ের সম্ভব পরীক্ষার জন্য আদর্শ পুস্তক (Scale or Standard books) লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা: প্রচলিত রচনাধর্মী ও আধুনিক নৈব্যক্তিক অভীক্ষা ছাড়া আরও কয়েক প্রকারের পরীক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে :

(১) মৌখিক পরীক্ষা: মৌখিক পরীক্ষা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। লিখিত পরীক্ষার বহু পূর্বে মৌখিক পরীক্ষার জন্ম। লিখিত পরীক্ষার কুফল সম্বন্ধে আজ যাহা বলা হইতেছে, তাহা এক সময়ে মৌখিক পরীক্ষা সম্বন্ধেও বলা হইয়াছিল। মৌখিক পরীক্ষা ত্রুটিমুক্ত নয় বরং ব্যক্তিগত প্রভাব বেশী পড়ে। ইহাতে ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। মৌখিক পরীক্ষায় কোনওরূপ মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। পরীক্ষার প্রশ্নগুলি আদর্শীকৃত পরিমাপের (Standard-ised Tests) হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হইলে পরীক্ষার ফলে ভুল ভ্রান্তি পাওয়া যাইবে।

সাধারণতঃ খুব নিচু শ্রেণীতে মৌখিক পরীক্ষা লওয়া হইয়া থাকে। কারণ ঐ শ্রেণীর শিশুরা ভাল লিখিতে পারে না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই সব ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর উপস্থিত বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, বাচনভঙ্গি, যুক্তি, বিচার-বুদ্ধি ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়।

(২) বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা: এই পরীক্ষা দ্বারা অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ

করা হয় না। ইহা দ্বারা পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা বর্তমানে খুব বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দুই রকম ভাবে এই পরীক্ষা গৃহীত হইয়া থাকে—ব্যক্তিগত ভাবে ও দলগত ভাবে। ব্যক্তিগত পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীকে একক ভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং দলীয় পরীক্ষায় সমগ্র শ্রেণীর পরীক্ষা করা হয়। বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাগুলি বিনে সাইমন (Binet-Simon)-র বুদ্ধিমাপক প্রশ্ন অবলম্বন করিয়া রচিত হয়। প্রশ্নগুলি ঐ বয়সের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপর প্রয়োগ করিয়া আদর্শীকৃত (Standardised) করা হইয়াছে।

(৩) অন্তঃস্থ ও বহিঃস্থ পরীক্ষা (Internal and External Examination): যখন বিদ্যালয়ে কোন শ্রেণীতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং সেই সকল শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতি ও অবনতির পরিমাপ করা হয়, তখন তাহাকে অন্তঃস্থ পরীক্ষা বলে। বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাষিক, বার্ষিক পরীক্ষাগুলি অন্তঃস্থ পরীক্ষা।

বিদ্যালয়ের বাহিরের কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান বহিঃস্থ পরীক্ষা পরিচালনা করিয়া থাকে।

বহিঃস্থ পরীক্ষা বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় লইয়া থাকে। একটি স্তরের পাঠের শেষে এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। পশ্চিমবাংলায় জেলা বিদ্যালয় পর্ষৎ প্রাথমিক পরীক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষৎ মাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন। শিক্ষার একটি স্তরের শেষেই এই পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করিলে তবে কলেজে প্রবেশের অনুমতি মেলে। ডিগ্রী পরীক্ষা, ডাক্তারী পরীক্ষা, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়া থাকে। এইগুলি সবই বহিঃস্থ পরীক্ষা।

অন্তঃস্থ পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার মান নির্ণীত হয়। এই মান বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন। সেই জন্য অন্তঃস্থ পরীক্ষা দ্বারা বিভিন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক বিচার করা চলে না। কিন্তু বহিঃস্থ পরীক্ষা একটি বিশেষ স্থানের একই স্তরের সকল শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলাফল দ্বারা ঐ স্তরের শিক্ষার্থীদের তুলনামূলক বিচার করা চলে।

আর একপ্রকার বহিঃস্থ পরীক্ষা আছে। উহা প্রতিযোগিতামূলক। চাকরির বা কোন কোন বিশেষ শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এখানে কেবল পাস করিলেই চলিবে না, যে কয়টি আসন আছে বা চাকরি খালি আছে, সেই কয় জনের মধ্যে স্থান লইতে হইবে।

বহিঃস্থ পরীক্ষার ত্রুটি

বিভিন্ন স্তরের শেষে বর্তমানে যে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাহার বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি উঠিয়াছে। যথা—

(১) ইহার জন্য ছাত্রকে এক সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় এবং তাহার ফলে স্বাস্থ্যহানি হয়।

(২) ইহার দ্বারা ভালভাবে উপলব্ধি না করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে অনেক বিষয় শিক্ষার বা মুখস্থ করার (cramming) উৎসাহ দেওয়া হয়।

(৩) ইহার দ্বারা সকল সময়ে প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বিষয়ের ভাল জ্ঞান অর্জন করিয়াও পরীক্ষার সময় সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না, অন্য কেহ কেহ ভালভাবে বিষয়গুলি অধ্যয়ন না করিয়াও নির্বাচিত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা করিয়াই পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

(৪) ইহার ফলে জ্ঞানার্জনের পরিবর্তে পরীক্ষা পাসই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে।

(৫) রচনার আকারে উত্তর দিতে হয় বলিয়া ইহা দ্বারা বিষয়ের জ্ঞান হইতে ভাষাজ্ঞান এবং গুছাইয়া বলিবার ক্ষমতারই অধিকতর পরীক্ষা হয়।

(৬) পরীক্ষকের মতামত, মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ প্রভাবিত হয়। ইহা দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন পরীক্ষক একই উত্তরের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন।

২০ নম্বরের একটি প্রশ্নের একই উত্তরের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষক ৬ হইতে ১৬ নম্বর দিয়াছেন। এমন কি একই পরীক্ষক বিভিন্ন সময়ে একই উত্তরে বিভিন্ন মূল্য নিরূপণ করিয়াছিলেন।

বহিঃস্থ পরীক্ষার সুবিধা

(১) বহিঃস্থ পরীক্ষা এক স্তরের জ্ঞান পরীক্ষার সুযোগ দেয় এবং পরের স্তরের পাঠের জন্য উপযুক্ত কিনা তাহা স্থির করিয়া দেয়।

(২) বহিঃস্থ পরীক্ষার ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহাদের জ্ঞান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুছাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে তাহাদের আত্মবিশ্বাস জন্মে।

(৩) বহুসংখ্যক ছাত্রের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়া ইহা জ্ঞান লাভে ও মানসিক উৎকর্ষ সাধনে প্রবল প্রেরণা দেয়।

(৪) ইহার সাহায্যে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত কর্মী নির্বাচন করা যায়।

প্রতিকারের উপায়

সুতরাং দেখা যায় যে, নানা দোষ সত্ত্বেও বহিঃপরীক্ষার যথেষ্ট সুবিধা বা উপকারিতাও আছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় উহা কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। তবে উহার পূর্ববর্ণিত দোষগুলির প্রতিকারের জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়।

(১) ছাত্রের দৈনন্দিন কাজ এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলির ফল সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে বহিঃপরীক্ষা দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যায়।

(২) নিজে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয় এবং উত্তর খুব দীর্ঘ না হয় এরূপ অনেকগুলি প্রশ্ন করিলে, মুখস্থ করিয়া বা কতিপয় নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর শিক্ষা

করিয়া পরীক্ষা পাসের সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। নূতন পরীক্ষা-প্রণালীতে এইরূপ ছোট ছোট অনেক প্রশ্ন করিতে বলা হইয়াছে।

(৩) শিক্ষাদান-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করিয়াও পরীক্ষার অনেক দোষের প্রতিকার করা যায়। প্রকৃষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া জ্ঞানতৃষ্ণা জাগরিত করিতে পারিলে, ছাত্রগণ পরীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া জ্ঞানার্জনে রত হইবে।

(৪) বিভিন্ন স্তরের শেষ পরীক্ষার সংখ্যা হ্রাস করা যায়। প্রাথমিক স্তরের এবং মাধ্যমিক স্তরের শেষে এক একটা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেই যথেষ্ট হয়।

(৫) সংখ্যার দ্বারা উত্তরের মূল্য নিরূপণ না করিয়া উত্তরগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। এক এক বিষয়ের বিভিন্ন উত্তরের অধিকাংশ যেই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয়ের উত্তরের মূল্য নির্ধারণ করা যায়। যেমন—কোন বিষয়ের ১০টা প্রশ্নের মধ্যে ৬টা প্রশ্নের উত্তর ক শ্রেণীভুক্ত হইলে, সেই বিষয়ের মোট উত্তরই ক-শ্রেণীভুক্ত করা যায়। সেইরূপ আটটি বিষয়ের মধ্যে পাঁচটি বিষয়ে কোন ছাত্র 'ক' পাইলে তাহাকে সেই পরীক্ষায় 'ক' বা ১ম শ্রেণীভুক্ত করা যায়। অথবা বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার ফল বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা যায়। যেমন—বাংলা, ইতিহাস (ক) গণিত, ভূগোল (গ) বিজ্ঞান, অঙ্কন (ঘ)।

(৬) রচনার আকারে উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Subjective Tests) এবং নির্দিষ্ট আকারে সংক্ষিপ্ত উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন (Objective Tests) সমান সমান থাকিলে উভয় প্রকারের পরীক্ষার উপকার পাওয়া যাইতে পারে এবং কুফল নিবারিত হইতে পারে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড (Cumulative Record Card)—বিদ্যালয়ে অন্তঃস্থ পরীক্ষা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রচলিত লিখিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের ত্রুটির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা ভালরূপে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, কোন ছাত্র-ছাত্রী যদি কোন বিষয়ে জ্ঞানলাভে উন্নতি লাভ না করিতে পারিল, তাহা হইলে তাহার কারণও নির্ণয় করা হয় না। তৃতীয়তঃ, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভাল না মন্দ তাহা পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া বিচারও করা হয় না। এইজন্য আধুনিক-কালে বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র রাখিবার ব্যবস্থা থাকে।

প্রগতিপত্র—বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ **প্রগতিপত্র** (Progress report) রাখা হইয়া থাকে। ছাত্র ছাত্রীরা পড়াশুনায় কতটা উন্নতি বা অবনতি করিল, তাহা পিতামাতা-অভিভাবকদিগকে জানাইবার জন্য প্রগতিপত্র ব্যবহার করা হয়। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ে বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া উচু শ্রেণীতে উঠাইয়া দেওয়া হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বর্ষশেষে উন্নতি ও অবনতি পিতামাতা বা অভিভাবকদের জানাইয়া থাকে। এই প্রগতিপত্র ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষালাভে কোনরূপ সহায়তা করে না। তাহা ছাড়া এই প্রগতিপত্র মারফৎ বিদ্যালয় ও পিতামাতা বা অভিভাবকদের সঙ্গে কোনওরূপ যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারে না। ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল ও উন্নতিই হইল প্রগতিপত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সেই উদ্দেশ্য প্রচলিত প্রগতি-পত্রের দ্বারা সাধিত হয় না।

প্রগতিপত্রের মাধ্যমে পিতামাতা বা অভিভাবককে কি জিনিস জানান হইবে, তাহা ামাদের বিবেচনার বিষয়বস্তু। বেশীর ভাগ বিদ্যালয়ই পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ষয়গুলি ছাত্র-ছাত্রীরা কতটা আয়ত্ত করিল তাহাই প্রগতিপত্রে লিখিয়া থাকে। কিন্তু লা বাহুল্য যে, বিষয়ের নম্বর দ্বারাই ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি ও অবনতি রিমাপ করা যায় না। যে সব ছাত্র উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহারা কেন ন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহা পিতামাতা অভিভাবককে জানাইতে হইবে। ারণ নির্ণয়কারী পরীক্ষা (Diagnostic Test) যদি ছাত্রছাত্রীদের লওয়া যায়, তাহা ইলে ছাত্র-ছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানেরও যেমন পরিমাপ হইবে, তেমনই আবার কেন াত্রছাত্রী পড়াশুনায় উন্নতি করিতে পারিতেছে না, তাহা বুঝা যাইবে।

প্রগতিপত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্র সম্বন্ধে লেখা থাকে। সেখানে ভাল বা মন্দ লা হয়। কিন্তু কোন কিছু বিশ্লেষণ করা হয় না।

তাহা ছাড়া প্রগতিপত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি অনুপস্থিতিও লেখা াকে। ইহার প্রয়োজন আছে। শ্রেণীতে অনুপস্থিতির খবর যদি বিদ্যালয় হইতে পতামাতা অভিভাবকদের জানান যায়, তাহা হইলে তাঁহারা ছাত্রছাত্রীর অনুপস্থিতির ারণ অনুসন্ধান করিতে পারেন এবং বিনা কারণে ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে না আসা ন্ধ করিতে পারেন।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড বা ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র—বর্তমানে বদ্যালয়গুলিতে এক বিশিষ্ট ধরণের প্রগতিপত্রের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাকে কউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ড বলা হইয়া থাকে। কিউমিউলেটিভ শব্দটি ইংরেজী, হার অর্থ হইতেছে 'একের উপর অন্য'। এইখানে ছাত্র-ছাত্রীর প্রত্যেকটি বিষয়ে বভিন্ন পরিমাপের কথা লেখা থাকে। ছাত্র-ছাত্রীর একটি পরিমাপের ফলাফল জানিয়া াত্র-ছাত্রী সম্বন্ধে কোনও রূপ সিদ্ধান্তে আসিতে পারি না। কিন্তু যদি প্রত্যেকটি বষয়ের বিভিন্ন পরিমাপের ফলাফল আমরা জানিতে পারি তাহা হইলে আমরা ুঝিতে পারি ছাত্র বা ছাত্রীর উন্নতি বা অবনতি কি হইতেছে।

কিউমিউলেটিভ রেকর্ড কার্ডে ছাত্র-ছাত্রীরা সমগ্র বিদ্যালয়-জীবনে প্রত্যেকটি বষয়ে কতদূর উন্নতি বা অবনতি করিল তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হয়। এমন কি কোন ছাত্র-ছাত্রী যখন একটি বিদ্যালয় ছাড়িয়া অন্য বিদ্যালয়ে চলিয়া যায়, তখন সেই াত্র বা ছাত্রীর কিউমিউলেটিভ রেকর্ড বা ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র নূতন স্কুলে াঠাইয়া দেওয়া হয়।

ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র রাখার উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র রক্ষিত হইলে উহা পরীক্ষা সংস্কারের কাজে লাগিবে। বিশেষ করিয়া াধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে।

ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর প্রত্যেকটি বিষয়ের ফল লিপিবদ্ধ াকে। ইহার ফলে সেই ছাত্র বা ছাত্রীর সামগ্রিক অগ্রগতির পরিমাপ সহজতর হয়।

কেবলমাত্র পরীক্ষাই নয়, ছাত্রছাত্রীরা বিদ্যালয়-জীবনে প্রত্যেকটি বিষয়ে কতদূর ন্নতি বা অবনতি করিয়াছে তাহার ফলাফল ইহাতে লিখিত থাকে।

ধারাবাহিক পরিমাপ পত্রে বিভিন্ন পরীক্ষায় ছাত্রের বিষয় অনুসারে প্রাপ্ত নম্ব
লেখা থাকে, তাহা ছাড়া পাঠ্য-বহির্ভূত (Extra curricular) কাজের হিসাব থাকে
এবং ব্যক্তিগত গুণাগুণ, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র সম্পর্কে পর্যায়ক্রমিক বিবরণ থাকে। এইগুলি
নিম্নলিখিত কাজে লাগে :

(১) ছাত্র বা ছাত্রী ভবিষ্যতে কি বৃত্তি লইবে, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

(২) চাকরির নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই প্রগতিপত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) ছাত্র-ছাত্রীর ত্রুটির সঠিক পরিমাপ ও কারণ নির্দেশ করা থাকে, ফলে
শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্রের পক্ষে সংশোধন করা সহজ হয়।

(৪) অন্তঃস্থ পরীক্ষা সামগ্রিকরূপে ও বহিঃস্থ পরীক্ষার অধিকাংশ ধারাবাহিক
পরিমাপ-পত্রের উপর নির্ভর করা চলে।

(৫) ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কেও ইঙ্গিত থাকে।

সাধারণ প্রগতি-পত্র (progress report) **ও ধারাবাহিক পরিমাপ-প**
(cumulative record card) – সাধারণ প্রগতিপত্র ও ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে
মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। প্রগতিপত্রে বিভিন্ন অন্তঃস্থ পরীক্ষার ফলাফ
লিপিবদ্ধ থাকে। এইগুলি অভিভাবকদের অবগতির জন্য মাঝে মাঝে তাঁহাদে
কাছে পাঠান হয়। ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্র ছাত্রছাত্রীর সামগ্রিক মূল্যায়ন। ইহ
অত্যন্ত গোপনীয়। অভিভাবকদের নিকট পাঠান হয় না। প্রয়োজন বোধ করিলে
অভিভাবক আসিয়া দেখিয়া যাইতে পারেন।

ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রের বিষয়বস্তু

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে কেবল অর্জিত জ্ঞানের
পরিমাপ থাকিবে না, ছাত্র-ছাত্রী সম্বন্ধে বহু বিষয় এই রেকর্ড কার্ডে লিপিব
থাকিবে। যেমন—(১) ছাত্রছাত্রীর নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, পিতামাতা অভিভাবকে
পরিচয়, ভর্তির তারিখ ইত্যাদি ছাত্র-ছাত্রীর সাধারণ পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য রেক
কার্ডে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

২। তাহার পর থাকিবে ছাত্র-ছাত্রীর শারীরিক বিকাশ। ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্য
সম্পর্কিত কোন ত্রুটি আছে কিনা, কোন অসুখ-বিসুখে ভুগিয়াছে কিনা, তাহা
স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা লিপিবদ্ধ থাকিবে। বিদ্যালয়ে শুধু মানসিক বিকাশ হইলে
চলিবে না। ছাত্র-ছাত্রীর শারীরিক বিকাশ কিরূপ হইতেছে তাহাও লিপিব
থাকিবে।

৩। ছাত্র-ছাত্রীদের কতকগুলি অন্তর্নিহিত ক্ষমতা কি ভাবে বিকাশ হইতেছে
তাহা লিপিবদ্ধ রাখা উচিত। এই সমস্ত ক্ষমতাগুলি পরিমাপ করিবার জ
কতকগুলি আদর্শীকৃত পরিমাপ (Standardised Tests) এর ব্যবস্থা আছে
বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্নিহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষার প্রভাব তাহার উপরও পতিত হয়
প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাইলেই বুদ্ধিবৃত্তির বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইলে
বুদ্ধি হয় না।

৪। বিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ একাধিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ধারাবাহিক রিমাপ-পত্রে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৫। ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহ কোন্‌দিকে তাহা ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রে লিপিবদ্ধ কিবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনে এই আগ্রহের মূল্য অত্যন্ত বেশী।

৬। সমাজ ও গৃহ পরিবেশ—পিতামাতা, অভিভাবকের নাম, পেশা শিক্ষাগত ন, সামাজিক স্থান, আর্থিক মান, পারিপার্শ্বিক সমাজ।

৭। শিল্প সামর্থ্য—শিল্পকাজে দক্ষতা, উৎকর্ষ ইত্যাদির পরিমাপ থাকিবে।

৮। বিশেষ নৈপুণ্য ও অসামর্থ্য।

৯। পাঠক্রম-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ—আলোচনা, বক্তৃতা, অভিনয়, আবৃত্তি, না, সমাজসেবা, উৎসব-অনুষ্ঠান, সাফাই ইত্যাদি।

১০। ব্যক্তিত্বের বিকাশ আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন—) শারীরিক শ্রমশীলতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। (খ) সামাজিক—সঙ্গপ্রিয়তা, যোগিতা, শৃঙ্খলাবোধ, দায়িত্ববোধ, রুচিবোধ ইত্যাদি। (গ) বৌদ্ধিক—অধ্যবসায় চারশক্তি, আত্মবিশ্বাস, স্মৃতি ইত্যাদি। (ঘ) চরিত্র—সততা, নিয়মানুবর্তিতা, ভৃত্ব সত্যবাদিতা, দয়া, ধৈর্য প্রভৃতি গুণ।

১১। সমস্যামূলক বা অসামাজিক আচরণ।

পরীক্ষা সংস্কার—বর্তমান সময়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সংখ্যা খুব বেশী। াব একটি প্রধান কারণ হইল পরীক্ষা গ্রহণ করিবার পদ্ধতির ত্রুটি। এই ত্রুটি- লি দূর করিয়া কিভাবে পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে সার্থক করা যায়—আধুনিক কালে নেকে সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন। অনেকের মতে নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা হণ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে:

(১) ছাত্র-ছাত্রীরা যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদের মন হইতে প্রথমতঃ রীক্ষাভীতি দূর করিতে হইবে।

(২) শুধু বাৎসরিক পরীক্ষার ফল দেখিয়াই ছাত্র-ছাত্রীদের বিচার করা চিত নয়। ঘন ঘন পরীক্ষার প্রবর্তন করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ঐ সব রীক্ষা দিতে হইবে। সারা বৎসরের পরীক্ষার ফল হইতে ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইবে অনুত্তীর্ণ হইবে, তাহা বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

(৩) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ও রচনাধর্মী প্রশ্ন উভয়ই থাকা চিত, কারণ নিছক নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন অনেক সময়ই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল করিতে বে না।

(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের শুধু পাঠ্য-বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেই চলিবে । শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু বৌদ্ধিক বিকাশ নয়। শিক্ষার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের াঙ্গীণ বিকাশ হয়। অতএব পরীক্ষার ব্যবস্থা এইরূপ করিতে হইবে যাহাতে ত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পরিমাপ করা যায়। আমরা পূর্বে ধারাবাহিক রিমাপ-পত্রের কথা বলিয়াছি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের এই ধারাবাহিক বরণ রাখিতে হইবে। শুধু পাঠ্য বিষয়ের নম্বরের মধ্যদিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সকল

দিকের বিচার করা যায় না। কর্মের ভিতর দিয়া তাহারা যে শিক্ষা লাভ করি তাহাদের যে সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইল, তাহা সবই পরীক্ষা-পদ্ধতির অন্তর্গত হ প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ও মুদালিয়র কমিশন পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের বিশেষভাবে বলিয়াছেন। মুদালিয়ার কমিশনের প্রস্তাবগুলি হইল :

(১) ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ নির্ণয় করিবার জন্য ধারাবাহিক পরিমা পত্র ও অন্যান্য প্রগতিমূলক রেকর্ডকার্ডের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(২) ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ মূল্যায়নের সময় বিদ্যালয়ের প্রগতিপত্র ও অন্ত পরীক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে।

(৩) বহিঃস্থ পরীক্ষা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে এবং রচনামূলক পরীক্ষ ব্যক্তিমুখী ব্যবস্থাও কমাইতে হইবে। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নসমূহ দ্বারা পরীক্ষার ব্যব করিতে হইবে এবং তাহা ছাড়া প্রশ্নের ধরণও পরিবর্তন করিতে হইবে।

(৪) মূল্যায়নের নম্বর না দিয়া প্রতীকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কমি বলিয়াছেন—"It is indeed difficult to distinguish between two pupil one of whom obtains, say, 45 marks another 46 or 47." আম যদি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব সব সময়ে ওজন করিয়া ন দেওয়া সম্ভব নয়। পরীক্ষক নানা সময়ে নানা রূপ অবস্থায় থাকেন, তাঁহার প ত্রুটিহীন নম্বর বণ্টন সম্ভব নয়। তাই কমিশন বলিয়াছেন, "A simpler an better system is the use of five point scale to which 'A' stands fo excellent, 'B' for good, 'C' for fair and average, 'D' for poor, an 'E' for very poor."

(৫) মাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। "W recommend that there should be only one public examinatio to indicate the completion of the school course."

(৬) শেষ পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের মধ্যে ছাত্র ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ের অভি জ্ঞানের পরিমাপের কথাই শুধু লিখিত থাকিবে না, যে সব অন্তঃস্থ পরীক্ষার বিব রহিয়াছে, তাহার পরিমাপের হিসাবও ঐ সার্টিফিকেটে দেওয়া থাকিবে।

(৭) কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে।

কমিশন আরও বলিয়াছেন যে, শেষ বার্ষিক পরিক্ষাও সকল ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে আবশ্যিক নয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিবে তাহারা বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ও ধারাবাহিক পরিমাপ-পত্রের উপর নির্ভর করিয়া শেষ সার্টিফিকেট লাভ করিতে পারিবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the merits and demerits of external examinations.
2. What are the defects of the existing system of examination? How can they be reformed?
3. Discuss the merits and defects of objective type of examination.
4. Write a note on cumulative record card.

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিক্ষাদানের কৌশল (Teaching Devices)

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু পদ্ধতি অবলম্বন করিলেও পাঠদানে কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। সেই সব কৌশল উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত না হইলে পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না। কৌশলগুলি প্রয়োগ করিবার একটি ধারা আছে। সেই ধারা অনুযায়ী পাঠদান কৌশলগুলি প্রয়োগ করিতে হয়।

১। **বর্ণনা**—মৌখিক শিক্ষাদানের একটা প্রধান অঙ্গ বর্ণনা। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি কোন কোন বিষয়ের পাঠ প্রধানতঃ বর্ণনার সাহায্যেই দিতে হয়। অন্য প্রায় সকল বিষয়ের পাঠের বর্ণনার কিছু-না-কিছু সাহায্য লইতে হয়। বর্ণনা যতই সুন্দর, জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়, পাঠ ততই হৃদয়গ্রাহী হয়। সুতরাং শিক্ষকমাত্রেরই ভাল বর্ণনা দানের ক্ষমতা থাকা দরকার। কিন্তু কেবল উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিলেই ভাল বর্ণনা দেওয়া হয় না। শিক্ষাপ্রদ বর্ণনা দিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে :

(১) শিক্ষকের উচ্চারণ বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট এবং তাঁহার স্বর প্রয়োজন মত উচ্চ হইতে হইবে।

(২) বর্ণনার ভাষা ও ভাব ছাত্রের বয়স ও মানসিক বিকাশের উপযোগী হইতে হইবে। ভাষা সুন্দর, সরল ও প্রাঞ্জল হইতে হইবে।

(৩) বর্ণন জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হইতে হইবে। বর্ণনার ফলে ছাত্রের মানসপটে যেন বিষয়ের জ্বলন্ত ছবি ফুটিয়া উঠে।

(৪) বর্ণনার বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আন্তরিক অনুরাগ থাকিতে হইবে। অন্তরের সহিত কোন কথা না বলিলে তাহা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করে না।

(৫) বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিতে হইবে এবং প্রয়োজন মত শিক্ষকের স্বর পরিবর্তন করিতে হইবে। তাহা না হইলে বর্ণনা একঘেযে হইয়া পড়িবে।

(৬) প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ কথা ও বাক্যের উপর বেশী জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। নতুবা তাহাদের প্রতি ছাত্রগণ প্রয়োজনমত মনোযোগ দিবে না এবং সেইগুলি স্মরণ রাখিবার চেষ্টা করিবে না।

(৭) পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বর্ণনা দিতে হইবে এবং অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা পরিহার করিতে হইবে।

(৮) একটানা দীর্ঘ বর্ণনা দেওয়া উচিত নয়, তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়ে। বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রদীপনের ব্যবহার করিয়া ও মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিয়া বিষয়টি ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দিতে হইবে।

২। **ব্যাখ্যা**—কেবল বর্ণনা করিলেই ছাত্র সকল বিষয় সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহা ছাত্রের বোধগম্য করার জন্য সময় সময় ব্যাখ্যারও প্রয়োজন হয়। কেবল যে ভাষার কাঠিন্য দূর করার জন্যই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তাহা নয়, ভাবের

কাঠিন্য দূর করার জন্য তাহার আরও বেশী প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং কেবল সাহিত্যের পাঠে নয়, সমস্ত বিষয়ের পাঠেই ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে।

ইহা ছাড়া কেবল শব্দের পরিবর্তে শব্দ এবং বাক্যের পরিবর্তে বাক্য ব্যবহার করিলেই ভাল ব্যাখ্যা হয় না। ভাল ব্যাখ্যার জন্য যেমন কঠিন ভাষার পরিবর্তে সহজ ও সরল ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, সেইরূপ ভাবকে বিশ্লেষণ ও বিস্তৃত করিয়া সহজবোধ্য করিতে হয় এবং সম্পর্কযুক্ত সমস্ত তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। সময় সময় উদাহরণ দান ও কার্য-প্রদর্শন (Demonstration) দ্বারাও ব্যাখ্যার কাজ হইতে পারে।

৩। **প্রশ্ন**—শিক্ষাদান-কৌশল বিভিন্ন রকমের আছে। ইহাদের মধ্যে প্রশ্নের স্থান সর্বোচ্চে। প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নের সাহায্য ছাড়া পাঠদান কার্যে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করা যায় না। কোন জিনিস শিক্ষা দিতে হইলে ছাত্রদের মানসিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক সহযোগিতা লাভে প্রশ্ন দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য লাভ করা যায়। প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জাগরিত করা যায়, তাহাদিগকে চিন্তা করিতে এবং পাঠকে ভালভাবে বুঝিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান পরীক্ষা করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছে তাহা প্রয়োগ করিবার সুবিধা প্রশ্নের সাহায্যেই করা হয়। এই সব কারণে প্রশ্ন শিক্ষাদান কার্যের সফলতা লাভে খুব বেশী সাহায্য করিয়া থাকে।

দক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। দক্ষতার সঙ্গে প্রশ্ন করার মধ্যেই শিক্ষাদান কার্যের বীজ সম্পূর্ণভাবে নিহিত রহিয়াছে। প্রশ্ন ভাল না হইলে পাঠদান সাফল্যমণ্ডিত হয় না।

প্রশ্নের উদ্দেশ্য—প্রশ্নের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব হইল ছাত্র-ছাত্রীদিগকে চিন্তা করিতে অনুপ্রাণিত করা। তাহা ছাড়া শিক্ষক অন্য একটি কারণেও প্রশ্নগুলিকে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তিনি প্রশ্নের সাহায্যে জানিতে চান, ছাত্র-ছাত্রীগণ তাহাদের অর্জিত বিদ্যা কতটুকু স্মরণ রাখিতে পারিয়াছে। পক্ষান্তরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন দ্বারা এবং শিক্ষকের প্রশ্নের দ্বারাও বটে, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তার ধারা বুঝিতে পারেন।

শিক্ষক প্রশ্ন করিয়া বুঝিতে পারেন যে, কোন্ ছাত্র পাঠে অমনোযোগী, প্রশ্নের ব্যাখ্যায় অসতর্ক, শব্দ সম্পদে দরিদ্র, ভাবকে সংগঠিত করিয়া বর্ননা দিতে অক্ষম, তুলনামূলক কাজে অপটু, মূল্যায়ন করিতে অপারক। লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নের মধ্য দিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ত্রুটি ধরা পড়ে। মৌখিক প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী যে কোন্ স্তরের অন্তর্গত, তাহা বাহির করিতে পারেন।

শিক্ষক যদি ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ বিষয়ে আগ্রহী তাহা জানিতে চান, তাহা হইলে তিনি সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রশ্ন করিবেন। একটু সাবধানতা অবলম্বন করিয়া প্রশ্ন করিলেই ছাত্র-ছাত্রীরা তাহারা কোন্ জিনিসে আনন্দ পায়, তা

[দ]িয়া দিবে। প্রশ্ন, ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের সন্ধান দেয় এবং আগ্রহ যে শিক্ষার [মূ]লে তাহা সর্বস্বীকৃত।

উত্তম প্রশ্নের লক্ষণ—(১) এরূপ প্রশ্ন করা প্রয়োজন যেন তাহার উত্তর [দ]িতে ছাত্রকে যথেষ্ট মানসিক কাজ করিতে হয়, পর্যবেক্ষণ বা স্মরণ করিতে হয় ও [চি]ন্তা করিতে হয়। (Question should be thought provoking.)

(২) নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিতে হইবে, পাঠ্য-[বি]ষয়ের সহিত প্রশ্নের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা এবং প্রশ্ন শিক্ষাদান-কার্যে সহায়ক হওয়া [প্র]য়োজন। অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর প্রশ্ন করা উচিত নয়। (Question [s]hould be goal directed)

(৩) প্রশ্নের ভাষা এবং অর্থ সরল হইবে এবং উহা যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভাল। [ছ]াত্রকে দ্ব্যর্থবোধক (Equivocal) প্রশ্ন করা উচিত নয় (Question should [b]e in unambiguous language)।

(৪) প্রশ্নের যেন একটা মাত্র উত্তর হয়। কোন প্রশ্নের অনেক উত্তর দেওয়া [স]ম্ভব হইলে শিক্ষক কোন্ উত্তর চাহেন তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া ছাত্রগণ [হ]তবুদ্ধি হইবে অথবা নানা ছাত্র নানা উত্তর দিয়া গোলমালের সৃষ্টি করিবে।

(৫) প্রশ্ন এরূপ কঠিন হইবে যেন ছাত্রকে কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন অতি কঠিন হইলে ছাত্র তাহার উত্তরদানের চেষ্টাও করিবে না।

(৬) উত্তর যেন শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি বা পুনরাবৃত্তি না হয় অথবা 'হাঁ' [ব]া 'না' না হয় সেরূপ প্রশ্ন করিতে হইবে। যথা—আওরঙ্গজেব বলিতেন, "শিবাজী একটা পার্বত্য মূষিক, সে আমার কি করিতে পারে?" ইহার পরই "আওরঙ্গজেব কি বলিতেন" প্রশ্ন করিলে, ছাত্র শিক্ষকের কথার প্রতিধ্বনি করিবে। অথবা "বাবর" কি অত্যন্ত সাহসী ছিলেন" এই প্রশ্ন করিলে ছাত্র 'হাঁ' বা 'না' উত্তর দিবে। [এ]ইরূপ প্রশ্ন করা ভাল নয়।

(৭) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন উত্তর-নির্দেশক (Leading) হওয়া উচিত নয়। যথা—"বাবর" কি সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করেন?" এইরূপ প্রশ্ন করা উচিত নয়। তবে শিক্ষামূলক প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পারে।

(৮) প্রশ্ন ছাত্রের বয়সের ও বিকাশের উপযোগী হইতেই হবে।

(৯) উত্তর যেন বেশী দীর্ঘ না হয় এবং ছাত্রের জ্ঞানের সীমার বাহিরে গিয়া না পড়ে এরূপ প্রশ্ন করা উচিত।

(১০) প্রশ্ন নানা প্রকারের হওয়া উচিত। একই ভাষায় বা একই আকারের প্রশ্ন করিলে তাহা একঘেয়ে হইয়া পড়ে এবং ছাত্রগণ চিন্তা না করিয়া উত্তর দিতে [চে]ষ্টা করে। পুস্তকের ভাষায়ও প্রশ্ন করা উচিত নয়।

(১১) সুস্পষ্ট ও সমস্ত শ্রেণীর শ্রবণযোগ্য উচ্চৈঃস্বরে এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতার সহিত প্রশ্ন করিতে হইবে। ইহা যেন সজীব ও আনন্দদায়ক কথোপকথনের আকার [ধ]ারণ করে। নির্জীব ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া, আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলে ছাত্রগণ তৎপরতার সহিত চিন্তা করিয়া তাহার উত্তর দেওয়ার জন্য উৎসাহিত হয় না।

(১২) শিক্ষামূলক ও পুনরালোচনামূলক প্রশ্নগুলি শ্রেণীবদ্ধ ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। তাহাতে ছাত্রের জ্ঞান শৃঙ্খলাপূর্ণ হয় এবং বিভিন্ন তথ্যগুলি একসূত্রে গাঁথা পড়ে। পাঠানুসরণ করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য যে প্রশ্ন করা হয় তাহা পরস্পর সম্পর্কহীন হইতে পারে।

(১৩) প্রথমে সমস্ত শ্রেণীতে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিতে হইবে এবং তাহার পর ছাত্রবিশেষকে উত্তর দেওয়ার জন্য নির্বাচন করিতে হইবে। কেবল শাসনের জন্য বা পাঠে মনোযোগী করিবার জন্য ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করা যায় (Question to the class, after a pause, ask any one of the student.)

(১৪) প্রশ্ন পাঠ শ্রেণীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হইবে। পাঠের কোন্ অংশে কোন্ প্রশ্ন করিতে হইবে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সহজে উত্তর পাওয়ার লোভে কেবল ভাল ছেলেদের প্রশ্ন না করিয়া যতদূর সম্ভব শ্রেণীর প্রায় সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে প্রশ্ন বিতরণ করিতে হইবে (Question should be evenly distributed)।

উত্তম উত্তর ও তাহা গ্রহণ—(১) উত্তর যতদূর সম্ভব সঠিক হইতে হইবে, তাহা **যেন জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সঠিক জ্ঞানের পরিচয় দেয়।**

(২) **উত্তর সম্পূর্ণ** হইতে হইবে। প্রশ্নে যাহা কিছু চাওয়া হইয়াছে তৎসমুদয় যেন উত্তরের মধ্যে থাকে এবং তাহার প্রত্যেক তথ্য বা ভাব যেন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করা হয়।

(৩) উত্তর সম্পূর্ণ **শুদ্ধ** হইতে হইবে।

(৪) যতদূর সম্ভব **সংক্ষেপে ও সরল ভাষায়** উত্তর দিতে হইবে।

(৫) **নিজ ভাষায় ভালভাবে গুছাইয়া** উত্তর দিতে হইবে। ইহা করিতে পারিলেই বুঝা যাইবে যে, ছাত্র বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছে।

(৬) **তৎপরতার সহিত** উত্তর দিতে হইবে। তবে চিন্তা করিয়া গুছাইয়া বলিবার জন্য সময় দেওয়া প্রয়োজন।

(৭) **সুস্পষ্ট স্বরে** উত্তর দিতে হইবে, যেন শ্রেণীর সকল ছাত্র ও শিক্ষক তাহা পরিষ্কারভাবে শুনিতে পারে।

কোন ছাত্র খুব সন্তোষজনক উত্তর করিলে তাহা প্রশংসার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। সম্পূর্ণ সন্তোষজনক না হইলেও শুদ্ধ উত্তর অনুমোদন করিতে হইবে। কাহারও উত্তর সম্পূর্ণ শুদ্ধ না হইলে সে যদি শুদ্ধ উত্তর দেওয়ার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া থাকে, তবে তাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে, কিন্তু 'বেশ' 'উত্তম' প্রভৃতি একই শব্দ বার বার ব্যবহার করা ভাল নয়।

মন্দ উত্তর ও তাহাদের সংশোধন

(১) সম্পূর্ণ **অশুদ্ধ উত্তর**। তাহা তৎপরতার সহিত ও দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(২) আংশিক **শুদ্ধ উত্তর**। যে অংশ শুদ্ধ হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে হইবে এবং অশুদ্ধ অংশের ভুল দেখাইয়া দিয়া তাহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

(৩) **আনুমানিক উত্তর।** এইরূপ উত্তর দেওয়ার অভ্যাস অত্যন্ত মন্দ। কারণ এই অভ্যাস হইলে ছাত্র কখনও চিন্তা করিয়া শুদ্ধ উত্তর ঠিক করিবার চেষ্টা করিবে না। প্রশ্নটি পুনরাবৃত্তি করাইয়া ও তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিয়া বা অন্য প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অসঙ্গতি বা অসম্ভবতা দেখাইয়া দিলে ছাত্র লজ্জা পাইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহাকে ভর্ৎসনা করার বা কোন শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

(৪) **প্রশ্নের সহিত সম্পর্কশূন্য উত্তর।** ইহাও আনুমানিক উত্তরের ন্যায় সংশোধন করিতে হইবে।

(৫) **চিন্তাহীন অসতর্ক উত্তর।** ভালভাবে চিন্তা না করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে এবং প্রথমেই যে কথা মনে হয় তাহা বলিলে অসতর্ক উত্তর হইবে। প্রশ্নটা পুনরাবৃত্তি করাইয়া ছাত্রকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে উহার সংশোধন হইবে। তাহাতেও সংশোধিত না হইলে তাহার উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া অন্য ছেলেকে চিন্তা করিয়া উত্তর দিতে বলিলে তাহার শিক্ষা হইবে।

(৬) **দাম্ভিক উত্তর।** ছাত্র যেন উত্তর দিতে অসমর্থ হয় এরূপ একটা প্রশ্ন করিলে তাহার গর্ব খর্ব হইবে এবং সে নম্র হইবে।

(৭) **অতিরিক্ত উত্তর।** কোন কোন সময় ছাত্র নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উত্তর দেওয়ার সময় প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয় আনিয়া ফেলে। তাহা করিতে গেলে তাহাকে তখনই থামাইয়া দিতে হইবে এবং সে প্রশ্নের উত্তর ঠিক করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে লজ্জা দিতে হইবে। তাহাতেও তাহার সংশোধন না হইলে তাহাকে উত্তর দিতে না দিয়া অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করিতে হইবে।

(৮) **হাস্যাস্পদ উত্তর।** যদি নির্বুদ্ধিতার জন্য সেরূপ উত্তর দেয় তবে তাহাকে শাস্তি না দিয়া বরং প্রশ্নটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়া ঠিক উত্তর দিতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, কোন ছাত্র শিক্ষককে অপ্রস্তুত করার জন্য সেরূপ উত্তর দিয়াছে, তবে তাহাকেও উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

(৯) **অনেক ছাত্রের একসঙ্গে উত্তর দান** বা তাহার জন্য নির্বাচনের পূর্বে কাহারও উত্তর দান। কোন নূতন শ্রেণীতে পাঠ দিতে হইলে প্রথমেই বলিয়া দিতে হইবে যে, প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে যেন কেহ উত্তর না দেয়; সকলে যেন উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং যে ঠিক উত্তর দিতে পারে সে যেন হাত উঠায়, তাহার পর উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষক যাহাকে নির্বাচন করেন সে-ই উত্তর দিবে। কোন ছাত্র যদি ইহার ব্যতিক্রম করে, তাহাকে সেই দিনের জন্য কোন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। তাহা সত্ত্বেও যদি নির্বাচনের পূর্বে অনেক অনেক ছাত্র একসঙ্গে উত্তর দেয়, তবে তাহাদের সকলের উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া অন্য এক জনকে উত্তর দিতে বলিতে হইবে। তাহার পরও যদি একসঙ্গে উত্তর দিতে চাহে, তবে অবাধ্যতার সামিল হইবে এবং তাহার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

(১০) **শুদ্ধ উত্তর দান করিতে সমস্ত ছাত্রের অকৃতকার্যতা।** যদি

তাহা হয় তবে মনে করিতে হইবে যে শিক্ষকের পাঠদান-কার্যে বিশেষ কোন ভ্রম-ত্রুটি আছে। সুতরাং তাঁহাকে আত্মপরীক্ষা করিতে হইবে এবং নিজের ভ্রম-ত্রুটি সংশোধন করিয়া পুনঃ বিষয়টি বিশদভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তবে যদি দেখা যায় যে, ছাত্রগণ কোন কারণে দলবদ্ধ হইয়া ইচ্ছাপূর্বক উত্তর দিতেছে না, তবে বাছিয়া বাছিয়া কয়েক জনকে খুব সহজ প্রশ্ন করিতে হইবে এবং তাহার উত্তর না দিলে অবাধ্যতার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে।

উত্তর গ্রহণে শিক্ষকের সতর্কতা

(১) **শিক্ষকের চাহিদার আকারে বা ভাষায় প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া শুদ্ধ উত্তর অগ্রাহ্য করা।** ইহা অত্যন্ত গুরুতর ভুল। কারণ ইহাতে ছাত্রকে অন্ধভাবে শিক্ষকের অনুকরণ করিতে উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহা না করিয়া ছাত্র যদি নিজ ভাষায় গুছাইয়া শুদ্ধ উত্তর দিতে পারে, তবে তাহাকে বরং প্রশংসাই করা উচিত।

(২) উত্তর প্রাপ্তির জন্য শিক্ষকের অসহিষ্ণুতা। অনেক শিক্ষক প্রশ্ন করার পর ছাত্রগণকে চিন্তা করিতে কিছুমাত্র সময় না দিয়া তখন তখনই উত্তর আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রশ্নের আবৃত্তি করিতে থাকেন। ইহাও শিক্ষকের ভুল। ইহাতে ছাত্রের চিন্তার ব্যাঘাত হয়।

(৩) অল্প কয়েক জন ছাত্রকেই বার বার উত্তর দানের জন্য নির্বাচন করা।

(৪) ছাত্রের প্রদত্ত উত্তর পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা।

(৫) উত্তর গ্রহণে বা সংশোধনে অত্যধিক সময় নষ্ট করা। অনেক সময় উত্তরের খুঁটিনাটি বিচারে শিক্ষক বেশী সময় নষ্ট করেন, অথবা উত্তর গ্রহণ করিবেন কি অগ্রাহ্য করিবেন ইতস্ততঃ করিয়া সময় নষ্ট করেন। ইহাতে কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট হয় না, পাঠের চিত্তাকর্ষক শক্তিও নষ্ট হয় এবং ছাত্রের নিকট শিক্ষকের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

(৬) ছাত্রগণকে উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিতে দেওয়া। মৌখিক উত্তর দেওয়ার জন্য ছাত্রগণ পরস্পরকে সাহায্য করা এবং পরীক্ষায় এক জন আর এক-জনকে সাহায্য করা সমান অপরাধ। সুতরাং কঠোরতার সহিত এই মন্দ অভ্যাস সংশোধন করিতে হইবে। যে ছাত্র ইঙ্গিত করিতেছে তাহাকে প্রথমে সাবধান করিতে হইবে, একটা কঠিন প্রশ্ন করিয়া লজ্জা দিতে হইবে, স্থানান্তরে বসিতে দিতে হইবে এবং সর্বশেষে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শাস্তিও দিতে হইবে।

(৭) **শিক্ষকের নিজে প্রশ্নের উত্তর করা**—ছাত্র প্রশ্নের উত্তর দিতে কিছু বিলম্ব করিলে কোন কোন শিক্ষক নিজেই প্রশ্নের উত্তর দেন বা উত্তর সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। ইহাও তাঁহাদের অসহিষ্ণুতার পরিচায়ক। কোন প্রশ্ন করিয়া শিক্ষকের নিজে তাহার উত্তর দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। যদি কোন ছাত্রই শুদ্ধ উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পাঠদানই ফলপ্রসূ হয় নাই। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বিষয়টা পুনঃ বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহার উচিত। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, ছাত্রগণ উত্তর জানে কিন্তু গুছাইয়া বলিতে পারিতেছে না, সেই কার্যে শিক্ষক তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন।

(৮) **উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ্য কোনটাই না করা**—কোন কোন শিক্ষক এক জন ছাত্রের উত্তর অনুমোদন বা অগ্রাহ্য না করিয়াই অন্য একজন ছাত্রকে প্রশ্ন করেন। ইহাতে শুদ্ধ উত্তর সম্বন্ধে ছাত্রগণের মনে সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে এবং অশুদ্ধ উত্তরকেও শুদ্ধ উত্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে।

(৯) **নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পায় বলিয়া ভুল উত্তর সংশোধন না করা**—শিক্ষককে যাহাতে এরূপ অবস্থায় পড়িতে না হয় তাহার জন্য পাঠদানের পূর্বে তাহার ভালরূপে প্রস্তুত হওয়া উচিত। তাহা সত্ত্বেও যদি কোন বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ থাকে তবে তাহা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। শ্রেণীতেই অভিধান বা reference পুস্তক দেখিয়া তাঁহার নিজ সন্দেহ দূর করিতে পারেন অথবা পরের দিন সঠিক উত্তর দিবেন বলিতে পারেন। এমন কি নিজের কোন ভ্রমপ্রমাদ হইলে তাহাও সরলভাবে স্বীকার করা উচিত; তাহাতে তাঁহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বাড়িবে বই কমিবে না; বরং তাঁহার ভুল চাপা দিতে গেলেই ছাত্রের শ্রদ্ধা হারাইবেন। শিক্ষকের ভুল না হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ভুল হইলে তাহা সরল ভাবে স্বীকার করা উচিত।

বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্ন—প্রশ্নকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে; যথা—(১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing Questions), (২) শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training Questions) এবং (৩) শাসনমূলক প্রশ্ন (Disciplinary Questions)।

(১) **পরীক্ষামূলক প্রশ্ন**। ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষার জন্যই এই প্রকারের প্রশ্ন করা হয়। ইহার দ্বারা ছাত্রের মনকে পিছন দিকে লইয়া যাওয়া হয় এবং স্মৃতির সাহায্যে তাহার অর্জিত জ্ঞান পুনঃ চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনিয়া তাহা বর্ণনা করিতে বলা হয়। পাঠের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রশ্ন করা হয়। যথা—

(ক) **প্রস্তুতিকরণের প্রশ্ন** (Preparatory Questions)। পাঠদানের প্রথমেই এই প্রকার প্রশ্ন করা হয়। পাঠ্যবিষয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছাত্রের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা এবং তাহার সহিত নূতন পাঠের সম্পর্ক স্থাপন করিয়া মনকে নূতন জ্ঞান গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করাই ইহার কাজ। ইহার ফলে ছাত্রের সমবেক্ষণ-মণ্ডল জাগরিত হয় এবং নূতন জ্ঞান সম্বন্ধে তাহার ঔৎসুক্য জন্মে। যথা—হুমায়ুন সম্বন্ধে পাঠদানের পূর্বে বাবরের রাজত্বকাল সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিতে হইবে এবং সর্বশেষে "তাঁহার মৃত্যুর পর কে দিল্লীর সম্রাট হইলেন?" এই প্রশ্নটি করিলে নূতন পাঠের সম্বন্ধে ছাত্রগণের ঔৎসুক্য জন্মিবে এবং তাহাদের মন তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে।

(খ) **পাঠানুসরণ পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন** (Questions for testing the pupil's comprehension)। কোন বিশেষ শিক্ষা দেওয়ার সময় মধ্যে মধ্যে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়; ইহার দ্বারা ছাত্রগণ পাঠ অনুসরণ করিতেছে কিনা তাহার পরীক্ষা হয় এবং অন্য উদ্দেশ্যও সাধিত হয়। ইহার দ্বারা এক দিকে ছাত্রগণের মনোযোগ ও বোধশক্তির পরীক্ষা হয় এবং তাহাদের ভুল ধারণা সংশোধন ও সন্দেহ দূর করা যায়। অপর দিকে ইহার দ্বারা শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতির কোন দোষ

থাকিলে তাহাও ধরা পড়ে। যদি অনেক ছাত্র পাঠ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া থাকে তবে বুঝিতে হইবে যে, শিক্ষকের পাঠদান-পদ্ধতিতে কোন গুরুতর দোষ আছে। তখন শিক্ষককে আত্মপরীক্ষা করিয়া তাঁহার নিজ দোষ সংশোধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ছাত্রের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়, তাহাদিগকে পাঠে মনোযোগ দিতে বাধ্য করা যায় এবং পাঠের একঘেয়েমিও নষ্ট করা হয়। তবে এই প্রকারের প্রশ্ন খুব বেশী করা উচিত নয়, কারণ তাহাতে ছাত্রগণ বর্ণনার সূত্র হারাইয়া ফেলিতে পারে। একটা জীবন্ত বর্ণনার মাঝখানে আসিয়া প্রশ্ন করিতে গেলে পাঠের চিত্তাকর্ষক প্রভাবও নষ্ট হইবে।

(গ) **পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন** (Recapitulatory Questions)।

প্রত্যেক বিভাগ বা সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে এই প্রকারের প্রশ্ন করিতে হয়। ইহার দ্বারা পাঠদানের ফল নিরূপণ করা যায়, প্রদত্ত জ্ঞান শৃঙ্খলাপূর্ণ করা যায় এবং পুনরাবৃত্তির ফলে প্রযোজনীয় বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায়। প্রশ্নগুলি এরূপ ভাবে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সাজাইতে হইবে যেন তাহাদের উত্তরের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে পাঠের সারাংশ প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া প্রশ্নগুলি এরূপ হওয়া উচিত যেন ছাত্র কেবল শিক্ষকের বর্ণনার পুনরাবৃত্তি করিতে না পারে, তাহাকে নিজে চিন্তা করিয়া ও গুছাইয়া উত্তর দিতে হয়।

(২) **শিক্ষামূলক প্রশ্ন** (Training Questions)

এই প্রকারের প্রশ্ন ছাত্রের মনকে সামনের দিকে চালিত করে (পরীক্ষামূলক প্রশ্নের বিপরীত) এবং ছাত্রকে পূর্বজ্ঞান হইতে নূতন জ্ঞানে পৌছিতে বা নূতন সত্য আবিষ্কার করিতে সাহায্য করে। লক্ষ্য বা গন্তব্যস্থল সামনে রাখিয়া শিক্ষক এইরূপ প্রশ্ন করিবেন যাহাতে ছাত্র অনুসন্ধানের পথ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পায় এবং সেই পথ অবলম্বন করিয়া নিজ চেষ্টায় গন্তব্যস্থলে পৌছিতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষক এই প্রশ্নের দ্বারা ছাত্রকে ঠিকভাবে চিন্তা করিতে ও বিচার করিতে প্রবৃত্ত করিয়া নূতন তথ্য বা সত্য খুঁজিয়া বাহির করিতে সাহায্য করিতে পারেন। যথা—

প্রশ্ন—একটা ভারী জিনিস শূন্যে ছুঁড়িলে কি হয়?

উঃ—তাহা মাটিতে পড়িয়া যায়।

প্রঃ—পাখী কিরূপে শূন্যে উঠে?

উঃ—পাখী উড়িয়া শূন্যে উঠে।

প্রঃ—পাখী মাটিতে পড়িয়া যায় না কেন?

উঃ—পাখী উড়িতে থাকে বলিয়া পড়িয়া যায় না।

প্রঃ—পাখী শূন্যে উঠিয়া থামিয়া থাকে না কেন?

উঃ—থামিলে মাটিতে পড়িয়া যাইবে।

প্রঃ—এখন বল ব্যোমযান কেন মাটিতে পড়িয়া যায় না?

উঃ—পাখীর ন্যায় আকাশে চলিতে থাকে বলিয়া মাটিতে পড়িয়া যায় না।

প্রঃ—ব্যোমযান কতক্ষণ শূন্যে থাকিতে পারে?

উঃ—যতক্ষণ চলিতে থাকে।

যে সকল শিশুর বিচার-শক্তি বিকশিত হয় নাই, শিক্ষামূলক প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন জিনিস বা ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজিয়া বাহির করিতে বা কার্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইহার পর বিশ্লেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে সাহায্য করে এমন প্রশ্ন করা যায়। যথা—কোন অবস্থার বর্ণনা দিয়া তাহার ফল অনুমান করিতে বলা হয়, একটা গল্প বলার সময়ে মাঝে মাঝে থামিয়া ইহার পর নায়ক কি করিবে অনুমান করিতে বলা যায়, অথবা একটা যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়া তাহাতে অমুক সেনাপতি কেন জয়ী হইলেন জিজ্ঞাসা করা যায়।

(৩) **শাসনমূলক প্রশ্ন**। ইহাও পরীক্ষামূলক প্রশ্নের ন্যায়, তবে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রের জ্ঞান পরীক্ষা করা নয়, শ্রেণীর সুশাসন রক্ষা করা। কোন ছাত্রকে পাঠে অমনোযোগী হইতে দেখিলে তাহাকে শাসনের জন্যই বর্ণিত বিষয় সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন করা যাইতে পারে, ইহাতে সে লজ্জিত হইয়া পাঠে মনোযোগী হইবে। এমন কি শ্রেণীর অনেক ছাত্র অমনোযোগী হইলে বা গোলমাল করিলে তাহাদিগকে ভৎর্সনা করার চেয়ে শ্রেণীকে লক্ষ্য করিয়া একটা কঠিন প্রশ্ন করিলে সকলে তাহার উত্তর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবে ও ফলে শ্রেণীর গোলমাল বন্ধ হইবে।

অনেক সময় অনেক দাম্ভিক ছাত্র-ছাত্রী থাকে, শিক্ষক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন প্রশ্ন করিলে তাহার দাম্ভিকতা কমিবে এবং সে শ্রেণীতে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করিবে না এবং পাঠে মনোযোগী হইবে।

পাদপূরণ (Ellipses)—একটা বাক্য বা বর্ণনার মধ্যে একটা বা বেশী শব্দ উহ্য রাখা যায় এবং ছাত্রদিগকে তাহা পূরণ করিতে বলা যায়। ইহাকেই পাদপূরণ বলে। প্রশ্নের ন্যায় ইহা **মৌখিক** এবং **লেখ্য** দুই রকমেই হইতে পারে। পূর্বে কেবল সাহিত্যের পাঠেই ইহার ব্যবহার হইত। বর্তমানে প্রায় সকল পাঠেই ইহার ব্যবহার হয়। পাঠদানের সময় পরীক্ষা ও শিক্ষার জন্য ইহার মৌখিক ব্যবহার হইতে পারে। ইহাও অনেকটা প্রশ্নের সমরূপ, তবে প্রশ্ন হইতে ইহার উত্তর দেওয়া সহজ হয় এবং উত্তরদানকার্যে শিক্ষক সহযোগিতা ও সাহায্য করিতে পারেন; তাই ইহা শিশুগণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

পাদপূরণের উদাহরণ—(১) মানুষ কেবল — পূরণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। (২) ঈশ্বর আমাদিগকে যেমন — করিয়াছেন — করিতেছেন, তেমন — করিতে পারেন। (৩) খ্রী: পূ:—অব্দে — যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার পুরুকে — করেন, তাহার পর তিনি সসৈন্যে — নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন কিন্তু — সম্রাটের — কথা শুনিয়া তাঁহার সৈন্যগণ — — এবং তাহারা — অস্বীকার করে। তখন তিনি — নদী — পর্যন্ত যান। তথা হইতে নদী বাহিয়া — নিকট সমুদ্রোপকূলে পৌঁছিলেন। (৪) ভারতবর্ষের উত্তরপ্রান্তে — পূর্বপার্শ্বে — দক্ষিণপার্শ্বে — ও পশ্চিম-পার্শ্বে —।

পাদপূরণ কৌশলে বিশেষ সুবিধা—

(১) অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ অনেক সময় প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও কি আকারে উত্তর দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। পাদপূরণ কৌশলের সাহায্যে উত্তরের কাঠাম সরবরাহ করিয়া এই অসুবিধা দূর করা যায়।

(২) প্রশ্নের উত্তরদান হইতে অধিকতর তৎপরতার সহিত পাদপূরণ করা যায়। তাই ইহার ব্যবহার করিলে ছাত্রগণকে তৎপরতার সহিত মনোযোগ দিতে হয় ও চিন্তা করিতে হয় এবং তাহারা ইহাতে আনন্দ উপভোগ করে।

(৩) ইহার সাহায্যে দ্রুত অনেক বিষয় ছাত্রের সামনে ধরা যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ও সংক্ষেপে পুনরালোচনা করা যায়।

(৪) ইহাতে ছাত্র সংক্ষেপে ও সম্পূর্ণ আকারে প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং সঠিক-ভাবে সরল ভাষায় মনোভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে।

(৫) ইহাতে সহজে ও সঠিকভাবে উত্তরের মূল্য নিরূপণ করা যায়।

(৬) ইহাদ্বারা ছাত্রকে চিন্তা করিতে ও শিক্ষা করিতে উৎসাহ দেওয়া যায় এবং তাহার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

(৭) শ্রেণীবদ্ধ পাদপূরণের ব্যবহার করিয়া ছাত্রকে বিচার ও সিদ্ধান্ত করার কার্যে সাহায্য করা যায় বা পরিচালিত করা যায়।

(৮) ইহার দ্বারা প্রয়োজনীয় তথ্য ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায়।

(৯) ইহা দ্বারা পাঠে একটা আনন্দদায়ক পরিবর্তন হয়।

পাদপূরণের ব্যবহার সম্বন্ধে সাবধানতা—(১) নিম্ন শ্রেণীতে ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময়ই ইহার বেশী ব্যবহার করা উচিত। উপরের শ্রেণীতে ইহার ব্যবহার ক্রমশঃ হ্রাস করিতে হয়। তবে নূতন প্রণালীতে লেখা পরীক্ষার জন্য উচ্চ শ্রেণীতেও ইহার ব্যবহার করা যায়।

(২) কেবল মাত্র এই কৌশলের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া কঠিন, প্রশ্নের সংযোগেই ইহার ব্যবহার করিতে হয়।

(৩) পাদপূরণ করিতে দিলে অনেক ছাত্রের একসঙ্গে উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা বেশী, অথচ তৎপরতার সহিত উত্তর দিতে না দিলে ইহার মূল্য থাকে না। এই উভয় বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য শিক্ষক ব্ল্যাক-বোর্ডে পাদপূরণের প্রশ্ন লিখিয়া দিতে পারেন এবং শ্রেণীর ছাত্রগণকে তাহা পড়িতে ও চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ সময় দিতে পারেন। তাহার পর তৎপরতার সহিত এক এক ছাত্রকে এক একটা পাদপূরণ করিতে বলিতে পারেন।

(৪) পাদপূরণের উত্তর দেওয়া সহজ হইলেও ইহা ঠিকভাবে তৈয়ার করিবার জন্য শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তা করিতে হয়। সুতরাং পাঠ দেওয়ার পূর্বেই ইহা তৈয়ার করা প্রয়োজন।

সরব পঠন ও নীরব পঠন—পাঠদানের সময় সরব পঠন ও নীরব পঠন উভয়েরই প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু সকল স্থলে উভয়ের সমান উপযোগী নয়, তাই নিম্নে তাহাদের মূল্য ও ব্যবহার সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করা হইল :

সরব পঠনের উপকারিতা—(১) সরব পঠনের দ্বারা ভাল উচ্চারণ শিক্ষা হয় এবং মৌখিক বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বৃদ্ধি পায়। (২) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী লক্ষ্য থাকে এবং শিশুর ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। (৩) ইহার দ্বারা পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগ দানের সাহায্য হয়। কারণ ইহাতে দর্শন, শ্রবণ ও বাক্ এই তিন

ন্দ্রিয়ের যুগপৎ ব্যবহার হয়। সুতরাং ইহা ছোট শিশুগণের বেশী উপযোগী। (৪) বেশী মনোযোগ দান করার ফলে বিষয় স্মরণ রাখারও সাহায্য হয়। বিশেষতঃ অক্ষরশঃ স্মরণ রাখার জন্য ইহা বেশী উপযোগী। (৫) কোন কোন বিষয় আবৃত্তি বা অভিনয়ের আকারে পাঠ করিলে বেশী শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে।

অসুবিধা বা অপকারিতা—(১) ইহাতে কোন বিষয় পাঠের জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়, পাঠোন্নতি কম হয়। (২) ভাব হইতে ভাষার দিকে বেশী লক্ষ্য থাকায় ইহাতে মর্মানুসরণে বাধা হইতে পারে বা ছাত্র মর্মানুসরণ না করিয়াও পড়িতে পারে। (৩) বেশী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিলে মনোযোগ দানের সাহায্য না হইয়া বরং বাধা হইতে পারে এবং ইহাতে ছাত্রের বেশী পরিশ্রম হয়। নিজে শিক্ষা করিবার জন্য পড়িতে হইলে নিজের উচ্চারণ সুস্পষ্টভাবে নিজের কাণে পৌছে এইরূপ স্বরে পড়া ভাল, তাহা হইতে উচ্চ বা নিম্নস্বরে পড়া উচিত নয়। শ্রেণীতে পড়িবার সময় শ্রেণীর সকল ছাত্র শুনিতে পায এইরূপ উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে হয়, কোন সময়েই চেঁচাইয়া পড়া উচিত নয়। (৪) ইহার দ্বারা পরস্পরের পাঠে ব্যাঘাত হয়। তাই বেশী ছাত্র এক স্থানে, এক সঙ্গে পড়িতে পারে না।

নীরব পঠনের উপকারিতা—(১) ইহা মর্মানুসরণের সাহায্য করে। কারণ ইহাতে ভাষা হইতে ভাবের প্রতিই বেশী লক্ষ্য থাকে। (২) ইহার সাহায্যে অল্প সময়ে বেশী বিষয় পাঠ করা যায়। (৩) সরব পঠন হইতে ইহাতে কম পরিশ্রম হয়। (৪) অনেক ছাত্র এক স্থানে বসিয়া নীরবে পাঠ করিতে পারে এবং বিভিন্ন বিষয় পাঠ করিতে পারে। (৫) ইহাদ্বারা ইচ্ছামূলক মনোযোগ দানের শক্তি ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি পায়। কারণ ইহাতে তদুভয়ের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। (৬) ইহাদ্বারা শিশু স্বচেষ্টায় শিক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। (৭) মৌখিক বর্ণনা শ্রবণের বা সরব পঠনের পর নীরব পাঠ করিতে দিলে হিতকারী পরিবর্তন হয়। (৮) ইহার অভ্যাস হইলে শিশু ভবিষ্যৎ জীবনে তাহার সাহায্যে নানা পুস্তক পড়িয়া তাহার জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারে। বস্তুতঃ, বয়স্ক লোক সাধারণতঃ নীরব পঠনের সাহায্যেই জ্ঞানার্জন করে।

অপকারিতা বা অসুবিধা—(১) ইহা ছোট শিশুর পক্ষে উপযোগী নয়। কারণ ইহাতে বেশী ইচ্ছামূলক মনোযোগ দিতে হয় এবং কেবল একটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞানলাভ করিতে হয়। (২) ইহাতে বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা হয় না ও মৌখিক বর্ণনাশক্তি বৃদ্ধি পায় না। (৩) ইহাতে ভাষার প্রতি বেশী মনোযোগ দেওয়া হয় না এবং ফলে ভাল ভাষাজ্ঞান হয় না। (৪) ইহাতে শিশুর ভুলভ্রান্তি ধরা পড়ে না। অল্পবয়স্ক শিশুদের পক্ষে সরব পঠনই বেশী উপযোগী। বস্তুতঃ ইহার সাহায্য ব্যতীত তাহারা জ্ঞানার্জন করিতে পারে না। সুতরাং নিম্ন শ্রেণীতে ইহার বেশী ব্যবহার করিতে হয়। বিশেষতঃ সাহিত্য ও অন্যান্য বর্ণনামূলক পাঠের জন্য সরব পঠনই বেশী উপযোগী, কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রকে নীরব পঠনের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তাই উচ্চ শ্রেণীতে ইহাই বেশী ব্যবহার করা উচিত। বিশেষতঃ, আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে এত বেশী বাচনিক পাঠ দেওয়া হয় যে, সপ্তাহে কয়েক

ঘণ্টা নীরব পঠনের ব্যবস্থা করিলে একটা হিতকারী পরিবর্তন হইবে এবং ছাত্রদের একটা ভাল অভ্যাসও গঠিত হইবে। তবে সাহিত্য পাঠের জন্য সকল স্তরেই সরব পঠন বেশী উপযোগী। গণিত বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় পাঠের জন্য নীরব পঠনই শ্রেষ্ঠ। উচ্চ শ্রেণীতে সাহিত্যের পাঠেও সরব পঠনের পর নীরব পঠনের ব্যবস্থা বিধেয়।

পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা (Repetition and Recapitulation)। পাঠ্যবিষয় ঠিকভাবে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয় না, তাহা তাহাদের মনে গাঁথিয়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা না করিলে পাঠ্যবিষয় বেশী দিন স্মরণ থাকিবে না। ইহার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা যায়, পুনরাবৃত্তি ও পুনরালেচনা তাহাদের মধ্যে দুইটি। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির উপর জোর দিয়া বর্ণনা করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সেইগুলি ২।১ বার পুনরাবৃত্তি করাও প্রয়োজন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের দ্বারাও পুনরাবৃত্তি করাইতে পারা যায়। তাহার পর এক এক সোপানের শেষে এবং পাঠের শেষে প্রশ্নের সাহায্যে বিষয়টি ছাত্রের দ্বারা পুনরালেচনা করাইলে তাহা আরও বেশী স্মরণ থাকে।

কিন্তু দীর্ঘকাল স্মরণ থাকার জন্য ইহাও যথেষ্ট নয়। স্মৃতিশক্তির অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে শিক্ষা করার এক বা দুই দিন পরে তাহার পুনরাবৃত্তি বা পুনরালোচনা করা প্রয়োজন। শ্রেণীতে তাহা করা সম্ভব নয়, সুতরাং ছাত্রকে বাড়ীতেই তাহা করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষক পরের দিন সেই বিষয়ে নূতন পাঠ দেওয়ার পূর্বে কয়েকটি প্রশ্নের সাহায্যে ছাত্রগণের পূর্বপাঠ কতটা স্মরণ আছে পরীক্ষা করিতে পারেন। ইহার পর খুব ছোট শিশুর বেলায় সপ্তাহের শেষে তাহা হইতে বড় ছেলেমেয়ের বেলায় মাসের শেষে এবং আরও বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীর বেলায় এক এক termএর শেষে অধীত বিষয়ের মৌখিক বা লেখ্য পরীক্ষা করিলেও তাহার পুনরালোচনা হইবে। এক এক term-এর ও বৎসরের শেষভাগে সমস্ত অধীত বিষয়ের পুনরালোচনামূলক পাঠ দিলে তাহা আরও দীর্ঘকাল স্মরণ থাকিবে।

ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বিষয়ভেদে পুনরালোচনার আকারও ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করিয়াও তাহার ভাল পুনরালোচনা করা যায়। যথা—গণিতের কোন নিয়মের অঙ্ক করিলে, জ্যামিতির extra করিলে, ভূগোলে কোন দেশের মানচিত্র অঙ্কিত করিলে, সাহিত্যে পাঠ্যবিষয়ক সম্বন্ধে রচনা লিখিলে, ইতিহাসে পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর করিলেও তাহাদের ভাল পুনরালোচনা হইবে।

সারাংশ গঠন—পাঠ্যবিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়ার ইহাও একটা উৎকৃষ্ট উপায়। পাঠের সারাংশে কেবল খুব প্রয়োজনীয় কথা বা তথ্যগুলিই থাকে এবং তাহার দ্বারা সেইগুলির প্রতি বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় এবং সেইগুলি ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে ছাত্রগণ পরেও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতে পারে। পাঠের সারাংশ যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে এবং ছাত্রগণের সহযোগিতায় তাহা গঠন করিতে হইবে। অবশ্য সকল বিষয়ে পাঠের সারাংশ গঠন করার প্রয়োজন

হয় না বা সম্ভব হয় না। যেমন ইতিহাসের পাঠে সারাংশ গঠন করিয়া তাহা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যায় এবং ছাত্রগণকেও লিখিয়া লইতে বলা হয়। প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠেও ইহার প্রয়োজন হয়। অন্যান্য বিষয়ের পাঠে সকল সময় সারাংশ গঠনের প্রয়োজন হয় না। গণিত, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে যে নিয়ম বা সূত্র গঠন করা হয় তাহা লিখাইয়া দিলেই হয়। সাহিত্যের পাঠে কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ, বাক্যের ব্যাখ্যা ইত্যাদি লিখাইয়া দিতে হয়।

ঊনবিংশ অধ্যায়

প্রদীপন

সুষ্ঠুভাবে পাঠদান করিতে হইলে কিছু সাজ-সরঞ্জাম ও প্রস্তুতির প্রয়োজন। কিছু কৌশল আয়ত্ত করিতে হয়। এই কৌশলগুলি আয়ত্ত না হইলে কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে কার্যকর করা যায় না। এই সাজ-সরঞ্জাম ও প্রস্তুতিকে প্রদীপন বলা হইয়া থাকে। কোন নূতন বিষয় বা জ্ঞান উপলব্ধির জন্য সহায়ক হিসাবে তাহার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত যে সব ছবি বা বস্তু প্রদর্শিত হয় বা পূর্বজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহাদের প্রদীপন বলে।

প্রদীপন ব্যবহারের উদ্দেশ্য—

পূর্বেই বলা হইয়াছে, নূতন জ্ঞানকে সহজে উপলব্ধিজাত করিবার জন্য সহায়ক হিসাবে প্রদীপন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রদীপন ব্যবহারের উদ্দেশ্য হইল :—

(১) কঠিন বিষয়কে সহজে উপলব্ধিজাত করে, (২) দৃশ্য প্রদীপনের ব্যবহারে বর্ণিত বিষয়ের মানসিক চিত্রগ্রহণে সাহায্য করে। (৩) প্রদীপন দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের ব্যাখ্যাকে জীবন্ত ও সহজবোধ্য করিয়া তুলে। (৪) বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে। ও (৫) শ্রবণ ও দর্শন দুই ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের ফলে জ্ঞানকে স্থায়ী করে।

প্রদীপনের প্রকারভেদ—প্রকৃতিভেদ অনুযায়ী প্রদীপনকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে : (ক) দৃশ্য-শ্রাব্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা বাস্তব প্রদীপন। (খ) বাচনিক প্রদীপন।

(ক) **দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদীপন**—চোখে দেখা ও কাণে শোনার শিক্ষা-সরঞ্জামের মধ্য দিয়া যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকে শ্রাব্য ও দৃশ্যবস্তুর মাধ্যমে শিক্ষা বলা হয়। আমাদের যত ইন্দ্রিয় আছে তাহার মধ্যে চোখ ও কান দুইটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইটি ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যাহা দেখি বা শুনি তাহা আমাদের মনে বেশী করিয়া গাঁথিয়া থাকে। যাহা আমরা চোখে দেখি তাহা আমরা তাড়াতাড়ি ভুলি না, যাহা আমরা কানে শুনি তাহাও আমরা সহজে বিস্মৃত হই না।

এই কারণে শিক্ষাবিদ্‌গণ এই দুইটির সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছেন। শিক্ষণীয় বস্তু সব সময় চোখে দেখা ও কানে শোনা সম্ভব হয় না, তাই কৃত্রিম উপায়ে বাস্তব জিনিসের অনুরূপ শিক্ষা-সরঞ্জাম উপস্থাপিত করিতে হয়। যথা—ভূগোল শিক্ষাদানের

ক্ষেত্রে শিক্ষকের পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের লইয়া দেশে-বিদেশে ঘুরাইয়া শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। তাই ভূগোল শিক্ষা দিবার সময় প্রচুর ছবি ও মানচিত্র ব্যবহৃত হইলে শিক্ষা অনেকটা বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে। পুস্তক পাঠ ও শিক্ষকের কথা শুনিয়া শিক্ষা লাভ করা অপেক্ষা কিছু শিক্ষা-সরঞ্জামের সাহায্য লইলে পাঠ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চিত্তাকর্ষক হইবে।

শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন ব্যবহারের সুবিধা—

(১) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই ভাল এবং তাহা আমরা সর্বদাই চোখ ও কানের সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা সকল সময়ে লাভ করিতে পারি না এবং অনেক সময় তাহা সহজলভ্য নয়। সে-সব ক্ষেত্রে নমুনা বা মডেল বা ছবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবকে যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করিতে পারিবে।

(২) বহু জিনিস আছে যাহা ঠিক বর্ণনার দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করান যায় না। অনেক বার বলিয়াও যাহা বুঝান যায় না, একবার ছবি দেখাইলে তাহা সহজে বোধগম্য হয়। যথা—চন্দ্রের ও দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি।

(৩) শিক্ষার বিষয়বস্তু বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক বিষয় পাঠ করিতে হয়। তাহাদের পড়ার ভার লাঘব করিবার জন্য শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপনগুলির সাহায্য লওয়া চলে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার ভার কিছুটা লাঘব হয়। ধরা যাক্, ছাত্র-ছাত্রীকে মিশর দেশ পড়িতে হইবে। বার বার পড়াইয়াও শিক্ষক ব্যর্থ হইতেছেন। ছাত্ররা মনে রাখিতে পারিতেছে না। এই অবস্থায় যদি মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিচয় দিয়া একটি ফিল্ম দেখান হয়, তবে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে এ বিষয় মনে রাখিতে পারিবে—ছাত্রের ও শিক্ষকের পরিশ্রমের ভার লাঘব হয়।

(৪) ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপন তৈরী করে, সেখানে তাহাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায়। তাহারা সক্রিয়ভাবে সব জিনিস শিক্ষালাভ করিতে পারে।

দৃশ্য-শ্রাব্য প্রদীপনের উপকারিতা—

(১) শ্রাব্যদৃশ্য শিক্ষা প্রদীপনগুলির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণ এইগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা জোগায়।

(২) শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপনগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে। এইগুলি বিষয় সমূহের শিক্ষার বাস্তব উপাদান, মৌখিক শিক্ষাদানে বিষয়-বস্তুর বাস্তব দিকটা দেখা যায় না। অনেক সময়েই মৌখিক শিক্ষাদান দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয়টি ভালভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করা যায় না, শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপনগুলির সাহায্যে উহা সহজবোধ্য হয়।

(৩) শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপনগুলি বর্ণিত বিষয়ের মানসিক চিত্র গঠনে সাহায্য করে।

(৪) এই শিক্ষা-সরঞ্জামগুলি ছাত্র-ছাত্রীর মনে জ্ঞান দৃঢ়ভিত্তিক করে ও স্মরণ রাখিতে সাহায্য করে।

(৫) এইগুলি পর্যবেক্ষণ ও বোধশক্তি বৃদ্ধির সহায়ক।

শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন ব্যবহারে সতর্কতা—

(১) যে শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন কোন শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তাহা যেন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পার্শ্ববর্তী কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া যদি প্রদীপন ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ঐগুলি জ্ঞানার্জনে বিশেষ সহায়ক হইবে না।

(২) শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপন যেন শিশুর আবেষ্টনীর অন্তর্গত হয়, সেই দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখিবেন। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রী যেন ঐ প্রদীপন দেখিয়া সেগুলিকে সহজেই পরিচিত মাধ্যম বলিয়া চিনিতে পারে, এইরূপ ভাবে সেগুলিকে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

(৩) কোন একটি বিষয়বস্তু বুঝাইতে নানা প্রকারের অনেকগুলি শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপন ব্যবহার না করাই ভাল। তাহা করিলে ছাত্রছাত্রী শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্যকেই হারাইয়া ফেলিবে।

(৪) প্রদীপন অবশ্যই ছাত্রছাত্রীদের বয়সের উপযোগী হইবে। যে প্রদীপনগুলি চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত, তাহা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না।

(৫) দামী ও জটিল প্রদীপনের অপেক্ষা কমদামী, সরল, সহজ প্রদীপন ব্যবহার বেশী কার্যকর।

প্রদীপন যতটা সম্ভব সহজবোধ হইবে। প্রদীপন ব্যবহার কালে বেশী সময় দেওয়া উচিত নয়।

বিভিন্ন প্রকারের প্রদীপন—আজকাল পাশ্চাত্ত্য দেশের মত আমাদের দেশেও নানা রকমের শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিম্নে বিভিন্ন ধরণের প্রদীপনের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

(১) বস্তু, (২) আদর্শ, (৩) চিত্র, (৪) নক্সা, (৫) মানচিত্র ও গ্লোব, (৬) ব্ল্যাকবোর্ড, (৭) ফ্লানেলবোর্ড, (৮) বুলেটিন বোর্ড, (৯) ফ্লাশ কার্ড, (১০) ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, (১১) এপিডায়াস্কোপ, সিনেমা, (১২) রেডিও, গ্রামোফোন, (১৩) টেপরেকর্ডার, (১৪) চার্ট, (১৫) পোস্টার, (১৬) পুতুল-নাচ, (১৭) অভিনয় ইত্যাদি।

(১) **বস্তু**—বস্তু প্রদর্শন না করিয়া পর্যবেক্ষণমূলক পাঠ দেওয়াই যায় না। অন্যান্য বিষয়ের পাঠেও তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বস্তুগুলি ছাত্রগণকে দেখাইতে পারিলে তাহারা সহজে পাঠ অনুসরণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নানারকম জিনিস সংগ্রহ করিয়া রাখা প্রয়োজন।

(২) **আদর্শ**—যখন কোন বস্তু প্রদর্শন সম্ভব হয় না, তখন সেই বস্তুর আদর্শ দেখাইলেও প্রদীপনের কাজ হয়। যথা—শ্রেণীতে হ্রদ, পর্বত প্রভৃতি এবং অনেক জন্তু দেখান যায় না, কিন্তু তাহাদের আদর্শ দেখাইতে পারা যায়।

(৩) **চিত্র**—যখন বস্তু বা আদর্শ কোনটাই দেখাইতে পারা যায় না, তখন বর্ণিত জিনিস বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে হইবে। মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে বর্ণিত

জিনিস বা বিষয়ের ছবি দেখাইলে শিশুগণ সহজে বর্ণনা অনুসরণ করিতে পারে তাহা ছাড়া অল্পবয়স্ক শিশুগণ স্বভাবতঃই ছবি দেখিতে ভালবাসে। সুতরাং ছবি সাহায্যে পাঠদান করিলে শিশুর নিকট তাহা চিত্তাকর্ষক হয় ও তাহাদের বে স্মরণ থাকে। বর্ণনার বস্তু বা বিষয়ের ছবি দেখাইতে পারিলে প্রত্যক্ষকারিণী কল্পনা সাহায্য হয় বলিয়া তাহাতে বিষয় সম্বন্ধে ছাত্রের সঠিক জ্ঞান হয়। এই উদ্দে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট ছবি সংগ্রহ করিয়া রাখা দরকার। কোন জিনিসের ছ সংগ্রহ করা সম্ভব না হইলে শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে তাহাদের ছবি আঁকিয়া দি পারেন।

(৪) **নক্সা**—বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া বা অঙ্কন করা সম্ভব হইলে কাগজে বা ব্ল্যাকবোর্ডে তাহার নক্সা আঁকিয়া দিয়া তাহার সাহায্যে পা দেওয়া যায়।

(৫) **মানচিত্র ও গ্লোব**—ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদির পাঠদা মানচিত্র ও গ্লোব অপরিহার্য। বিশেষ করিয়া ভূগোলের পাঠে মানচিত্র ও গ্লোবে প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

মানচিত্রদ্বারা অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে:

(১) কোন স্থানের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। যেমন—দিল্লী ভারতের কো স্থানে অবস্থিত ম্যাপের দ্বারা বাস্তব জ্ঞান লাভ হয়।

(২) ম্যাপ ব্যবহারের দ্বারা কোন দেশ সম্পর্কে তাহার অবস্থান, অন্য দেশের স তুলনায় তাহার আয়তন, সীমা, নিরক্ষরেখার কত উত্তরে বা দক্ষিণে তাহা বুঝা যায়।

(৩) মানচিত্রের মাধ্যমে কোন দেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, উৎপাদন, জলবা যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। বিভিন্ন ধরণের মানচিত্রের মাধ্যমে কো দেশের সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচয় লাভ ঘটে এবং মানচিত্রের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদে ভূগোল সম্পর্কীয় জ্ঞান বাস্তব হয়।

(৪) ইতিহাস পাঠের সময় এক এক যুগে দেশের সীমার কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, রাজাদের রাজ্যবিস্তার এবং বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানকে বাস্তব করিতে চেষ্টা করে।

(৫) মানচিত্রের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের অধীত জ্ঞানের পরীক্ষা করা যায়। মান-চিত্রের মধ্যে দেশ বা স্থান বাহির করিতে দেওয়া বা কেবল দেশের মানচিত্রের নকল দিয়া নদী, রেলপথ, বন্দর উৎপন্ন-দ্রব্য নির্দেশ করিতে বলা যায়।

মানচিত্রের মতই গ্লোব ভূগোল শিক্ষাদান কার্যে অপরিহার্য। মানচিত্র সমতল কাগজের উপর আঁকা হয়। আর গ্লোব পৃথিবীর আকৃতির একটি ক্ষুদ্র নকল। গোলাকার পদার্থের উপর দেশ, নদনদী, সমুদ্র আঁকা থাকে। কাজেই এইগুলি পাঠের সময় গ্লোব বিশেষ কার্যকর। অক্ষরেখাগুলি বিষুবরেখার সমান্তরাল এবং দ্রাঘিমা রেখাগুলি পরস্পর সমান দূরত্বে রহিয়াছে। কোন্ দেশ কত উত্তরে বা দক্ষিণে অথবা পূর্ব ও পশ্চিমে তাহা কিভাবে বুঝা যায় গ্লোবের সাহায্যে তাহা বুঝান সহজ।

(৬) **ব্ল্যাকবোর্ড**—ভাল পাঠদানের জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার অনেকটা অপরিহার্য। ইহার ব্যবহার না করিয়া গণিত ও অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষাই দেওয়া যায় না, ভূগোল ও ইতিহাসের পাঠে ইহার ব্যবহার না করিয়া পাঠ্য-বিষয় ছাত্রের মনে গাঁথিয়া দেওয়া যায় না। অন্যান্য প্রায় সমস্ত বিষয়ের পাঠেও ইহার কমবেশী ব্যবহার করিতে হয়। বস্তুতঃ, **ব্ল্যাকবোর্ড একেবারে ব্যবহার না করিয়া সফলতার সহিত কোন বিষয়ে পাঠ দেওয়া যায় না।**

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা উপকারিতা

(১) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া মৌখিক বর্ণনার বিষয় ছাত্রদের দর্শনেন্দ্রিয়গোচর করা যায় এবং **শ্রবণ ও দর্শন এই দুই ইন্দ্রিয়ে যুগপৎ ব্যবহারের ফলে** পাঠ্যবিষয় ভাল শিক্ষা হয় ও স্মরণ থাকে।

(২) কঠিন বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া তাহার প্রতি ছাত্রের বিশেষ **মনোযোগ আকর্ষণ** করা যায়।

(৩) নূতন শব্দ, কঠিন শব্দ, নাম, তারিখ ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া ছাত্রদের অনেক **ভুল সংশোধন** করা যায় বা সন্দেহ দূর করা যায়।

(৪) নক্সা, চিত্র, মানচিত্র ইত্যাদি ব্ল্যাকবোর্ডে আঁকিয়া দিয়া পাঠ্যবিষয়ের ভাল **প্রদীপন** করা যায়।

(৫) ব্ল্যাকবোর্ডে ছাত্রের সামনে চিত্র আঁকিয়া দিয়া বা গণিতের অঙ্ক কষিয়া না দেখাইয়া অঙ্কন-বিদ্যা ও গণিত ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না।

(৬) প্রয়োজনমত পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ্যবিষয় স্মরণ রাখিতে ছাত্রকে সাহায্য করা যায়।

(৭) সমরূপ ঘটনা, বাক্য, গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ প্রভৃতি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিয়া পাঠ চিত্তাকর্ষক করা যায়।

(৮) ছাত্রগণের সহযোগিতায় শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে কোন লেখার কাজ করিতে পারেন এবং তাহাতে ছাত্রগণের ভাল শিক্ষা হয়।

(৯) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিয়া তাহাদের **জ্ঞান পরীক্ষা** করা যায়

(১০) ছাত্রগণকে বোর্ডে কোন কাজ করিতে দিলে তাহাদের **সাহস** ও **উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।**

ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেঃ—(১) ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু লেখার পূর্বে তাহা ভালভাবে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে।

(২) ব্ল্যাকবোর্ডের একপাশে দাঁড়াইয়া লিখিতে হইবে, যেন লেখা তাঁহার শরীরের দ্বারা ঢাকা না পড়ে।

(৩) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা বেশ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে।

(৪) ব্ল্যাকবোর্ডে একসঙ্গে দুই বা বহু বিষয়ে লেখা বা দুই বা বহু জিনিবের ছবি

আঁকা ভাল নয়। তাহা করিলে ছাত্রের মনোযোগ কোন একটা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হইবে না।

(৫) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখায় বা কাজে যেন কোন ভুল না হয় সেই সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

(৬) ব্ল্যাকবোর্ডের লেখা সংক্ষিপ্ত হইতে হইবে।

(৭) ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিত বা অঙ্কিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইলে তাহা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে তাহা পুনঃ দেখাইতে হইলে বোর্ড উল্টাইয়া রাখা যায়। তাহা না করিয়া অন্য বিষয়ের বর্ণনা দিতে গেলে ছাত্রগণের মনোযোগ ব্ল্যাকবোডে লেখার বা ছবির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

(৮) ব্ল্যাকবোর্ডে লেখার সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য বার বার শ্রেণীর দিকে ফিরিয়া দেখা ভাল নয়। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া লিখিলেই শ্রেণী-শিক্ষকের দৃষ্টির অন্তরালে যাইবে না। তবে এক এক অংশ লেখা বা আঁকা শেষ করিয়া শ্রেণীর ছাত্রগণ কি করিতেছে দেখা প্রয়োজন।

(৯) ব্ল্যাকবোর্ডে কোন বিষয় লেখার বা কোন চিত্র আঁকার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকেও তাহা নিজ নিজ খাতায় লিখিতে বা আঁকিতে বলা প্রয়োজন। তাহা হইলেই তাহারা কর্মে নিযুক্ত থাকিবে ও শ্রেণীর শৃঙ্খলা নষ্ট করিতে পারিবে না।

(১০) বোর্ডে লেখার সময় কথা বলা ঠিক নয়।

(১১) বোর্ডে লেখার সময় চকের শব্দ না হয়।

(৭) **ফ্লানেল বোর্ড**—ফ্লানেল বোর্ডও শ্রাব্য-দৃশ্য প্রদীপনের মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। শ্রেণীতে শিক্ষাদানকালে যেমন শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তেমনি তিনি ফ্লানেল বোর্ড ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে এই যে, শিক্ষক ব্ল্যাকবোর্ডে প্রয়োজনীয় জিনিস বা ছবি অঙ্কিত করেন, কিন্তু ফ্লানেল বোর্ডে ছক, ছবি, ইত্যাদি আঁটিয়া দেন এবং আবার তুলিয়া নেন। এই বোর্ড নিম্নশ্রেণীর শিশুদের পক্ষে খুব উপযুক্ত—বিভিন্ন ছবি ফ্লানেল বোর্ডে আঁটিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

(৮) **বুলেটিন বোর্ড**—বুলেটিন বোর্ড শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপনের মধ্যে অন্যতম। ব্ল্যাকবোর্ডের যেমন শিক্ষাগত গুরুত্ব রহিয়াছে বুলেটিন বোর্ডেরও সেইরূপ গুরুত্ব শিক্ষাক্ষেত্রে রহিয়াছে। বুলেটিন বোর্ড শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়ে থাকিবে। এই বুলেটিন বোর্ড ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষণীয় বহু বিষয় লিখিত থাকিবে। এই বুলেটিন বোর্ড একটি পত্রিকার কাজ করিবে। পত্রিকাতে ভাল ভাল লেখা থাকে। বুলেটিন বোর্ডে সেইরূপ ভাল ভাল বিষয় সাঁটা অবস্থায় থাকিবে। বুলেটিন বোর্ডে শিক্ষকের নেতৃত্বে ছাত্র-ছাত্রীগণের সৃজনাত্মক লেখার শক্তি বৃদ্ধি পাইবে।

(৯) **ফ্লাশ কার্ড**—কতকগুলি কার্ডে ঘটনা পরম্পরায় ছবি বা লেখা থাকে। পাঠদান কালে শিক্ষক এই কার্ডগুলি ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দেখাইয়া থাকেন। যেখানে সকলে দেখিতে পায় এইরূপ একটি নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র দলের কাছে ফ্লাশ

কার্ডগুলি উপস্থাপিত করা হয়। কার্ডগুলিকে বেশীক্ষণ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ধরিয়া রাখা হইবে না। সমগ্র বিষয়টির বর্ণনায় ফ্লাশ কার্ডগুলি সাহায্য করিবে।

(১০) **ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন**—সাধারণভাবে ছবি দেখানোর বদলে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে ছবি দেখানো বেশী কার্যকর। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে ছবি পর্দার উপর পড়ে এবং উহা বেশী লোক দেখিতে পারে। তাহা ছাড়া ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের স্লাইড দ্বারা একটার পর আর একটা ছবি ঘটনার সঙ্গতি রাখিয়া দেখান যায়।

(১১) **এপিডায়োস্কোপ, সিনেমা**—এপিডায়োস্কোপ অনেকটা ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের মতই। ইহাও শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে বিশেষ উপকারে আসে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সঙ্গে ইহার পার্থক্য এই যে, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নে স্লাইডের সাহায্যে ছবি বড় করিয়া দেখান হয়, কিন্তু এপিডায়োস্কোপ যে কোন পুস্তকের ছবি আরও বড় করিয়া পর্দার উপর ফেলা যায়।

ইহাতে স্লাইডের প্রয়োজন হয় না। তাহা ছাড়া ইহা দ্বারা আর একটি উপকার হইয়া থাকে। শিক্ষক যদি কোন ছবির সীমারেখা বর্ধিত আকারে আঁকিয়া লইতে চান, তাহা হইলে তিনি এপিডায়োস্কোপের সাহায্য লইতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে সিনেমাও উল্লেখযোগ্য।

(১২) **রেডিও, গ্রামোফোন**—শ্রাব্য প্রদীপনগুলির মধ্যে রেডিও অন্যতম। রেডিওর মাধ্যমে নানা চিত্তাকর্ষক ও প্রয়োজনীয় বিষয় সকলের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। জনশিক্ষার পক্ষে ইহা অপেক্ষা ভাল মাধ্যম আর নাই। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানে তাহাদের পাঠ্য-বিষয়েরও আলোচনা হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে গ্রামোফোনও সহায়ক।

(১৩) **টেপ-রেকর্ডার**—শ্রাব্য প্রদীপনের মধ্যে টেপ-রেকর্ডার অন্যতম। ইহা দামী জিনিস। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে বেশী চালু হয় নাই, কিন্তু ইহার শিক্ষা-সম্ভাবনা খুব বেশী। বিদ্যালয়ে ইহা প্রবর্তন করা উচিত। টেপ-রেকর্ডার দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া যায়। সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রেও টেপ-রেকর্ডারের মূল্য কম নয়। টেপ-রেকর্ডারের সুবিধা হইল এই যে, টেপগুলি মুছিয়া আবার সেগুলিতে পুনরায় রেকর্ড করা যায়।

(১৪) **চার্ট** — চার্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা-সরঞ্জাম। এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলি মুখে বুঝানোর চাইতে চার্টে বুঝান সহজ। চার্ট একটি দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন যেখানে কোন কিছুর সঙ্গে তুলনা, সারাংশ, বৈপরীত্য দেখান বা বিষয়-বস্তুকে ভালভাবে বুঝাইবার জন্য অন্য কোনও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়।

চার্ট একটি দৃষ্টি-নির্ভর শিক্ষা-সরঞ্জাম বলিয়া ইহাকে বেশ বড় করিয়া আঁকিতে হইবে যাহাতে শ্রেণীর সকল অংশ হইতেই দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ, চার্টে খুব বেশী লেখা লিখিত থাকিবে না। অল্প কথাতেই জিনিসটির ব্যাখ্যা করিতে হইবে। বিশেষ চার্টগুলি যেন দেখিতে সুন্দর হয়।

চার্টগুলি যদি অন্য কোন দৃশ্যশ্রাব্য প্রদীপনের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়, তবে উহা আরও কার্যকরী হইবে।

(১৫) **পোস্টার**—পোস্টার প্রচারের মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পোস্টার সাধারণতঃ কাগজের উপর ছাপা বা আঁকা হয়। ছবিটি বিশেষ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তখন লেখার সাহায্যে ঐ বিষয়-বস্তুটিকে পরিষ্কার করা হয়।

শ্রেণীতে পোস্টারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন কিছু করণীয় জিনিস আছে, যাহা তাহাদের প্রতিনিয়ত স্মরণ রাখা দরকার। যেমন—দাঁত মাজা, স্বাস্থ্যরক্ষা-পরিচ্ছন্নতা বিধান ইত্যাদি। তাহা ছাড়া দেশ ভ্রমণের পোস্টার দেখাইয়া শিক্ষক ভূগোল বা সমাজ বিদ্যার পাঠ ভালভাবে দিতে পারেন।

(১৬) **পুতুল-নাচ**—পুতুল-নাচ আমাদের দেশে বহুদিন যাবৎ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে উহা কখনও ব্যবহৃত হয় নাই। সিনেমার প্রচলনের ফলে পুতুল-নাচও কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ইহার মূল্য অপরিসীম।

পুতুল-নাচে শ্রেণীর সব ছাত্র-ছাত্রী অংশ লইতে পারে। ইহাতে বহু লোকের প্রয়োজন হয়। কেহ পুতুল বানায়, কেহ পুতুল চালনা করে, আর বাকিরা পুতুলের বক্তব্যগুলি বলে।

পুতুল-নাচের মধ্যদিয়া হাতের কাজ, কলা, ইতিহাস, ভূগোল সমাজবিদ্যা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া যায়। ছোটরা নিজেরাই পুতুল-নাচের পরিকল্পনা করে, পুতুল বানায়, পোশাক তৈরী করে সংলাপ রচনা করে। ইতিহাসের ঘটনার গল্প পুতুল-নাচে খুব ভালভাবে রূপান্বিত করা যায়।

(১৭) **অভিনয়**—প্রদীপন হিসাবে অভিনয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু শিক্ষা করে। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় অভিনয় পদ্ধতিতে ভাল শিক্ষা দেওয়া যায়। তাহা ছাড়া সবচেয়ে বড় গুণ যাহা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিকশিত হয়, তাহা হইল তাহাদের সংগঠন ক্ষমতা। যখন ছাত্রছাত্রীরা কোন নাটক অভিনয়ের প্রজেক্ট গ্রহণ করে, তখন তাহারা নাটকের বিষয়বস্তু স্থির করা হইতে আরম্ভ করিয়া অভিনয়ের পরিকল্পনা, অভিনয় সম্পাদন ও বিচার ইত্যাদি করিয়া থাকে।

অভিনয় অনুষ্ঠান ও আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিষয়বস্তুটি ভালভাবে বুঝিয়া লয়। পরিকল্পনার মধ্যদিয়া ছাত্রছাত্রীরা অনেক গুণের অধিকারী হইয়া থাকে।

বাচনিক প্রদীপন

শ্রাব্যদৃশ্য প্রদীপনের বিষয় পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এইবার বাচনিক প্রদীপনের বিষয় আলোচনা করা হইবে। বাচনিক প্রদীপনের ফলে পাঠ সরস ও সহজবোধ্য হয়। বাচনিক প্রদীপনের মধ্যে বর্ণনা, তুলনা, উদাহরণ, গল্পকথন, সরব ও নীরব পঠন, সাদৃশ্য ও প্রশ্ন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণনা ও প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

(ক) **তুলনা**—কোন নূতন বিষয় পাঠনার সময় পূর্বজ্ঞাত কোন বিষয় বা বস্তুর হিত তাহার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য বর্ণনা করিলে নূতন বিষয়ের জ্ঞান পরিচ্ছন্ন হয়। এবং ইহা দ্বারা পাঠটিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করা যায়।

(খ) **উদাহরণ**—একটি নূতন বিষয় বুঝাইবার সময় বা কোন বিমূর্ত (abstract) বিষয় ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ভালভাবে বুঝাইবার সময় শিক্ষক উদাহরণের সাহায্য লইয়া থাকেন। উদাহরণের দ্বারা অনেক সময় বিষয়টি পরিষ্কার হইয়া যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে পারে।

(গ) **গল্প**—নিম্ন শ্রেণীর পাঠদানে গল্প একটি বিশিষ্ট মাধ্যম। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। শিক্ষক তাঁহার পাঠ গল্পাকারে বলিবার পরিকল্পনা করিবেন। তাঁহার বর্ণনার ভঙ্গী সরল ও সুন্দর হইতে হইবে। গল্প বলার মাঝে মাঝে সময় অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন করিবেন। গল্প বলিবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে :

(১) গল্প শ্রেণীর উপযোগী হইবে। বর্ণনার ভাষাও শ্রেণীর উপযোগী হইবে।

(২) কোন ছবি দেখাইয়া গল্প শুরু করিতে হইবে।

(৩) অর্ধচন্দ্রাকার বৃত্ত রচনা করিয়া ছাত্ররা বসিবে, খালি দিকে ছাত্রদের দিকে মুখ করিয়া শিক্ষক বসিবেন। শিক্ষক যেন প্রতিটি ছাত্রের মুখ দেখিতে পান ও ছাত্রেরাও যেন তাঁহাকে দেখিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৪) প্রয়োজন অনুযায়ী কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটিবে।

(৫) মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করিয়া তাহাদের আগ্রহ বজায় রাখিতে হইবে ও তাহারা অনুসরণ করিতে পারিতেছে কিনা জানিতে হইবে।

(৬) শেষে ছাত্রদের গল্পটি বলিতে দিতে হইবে।

(ঘ) **সাদৃশ্য**—সাদৃশ্য কথা বা বিষয়ের উল্লেখ (Citing of parallel passages instances or thoughts) করিয়া শিক্ষক তাঁহার বিষয়বস্তুকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে পারেন। শিক্ষক ইতিহাস, সমাজবিদ্যা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের সময় সদৃশ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন বা বিষয়টির সমতুল্য কোন বিষয়বস্তু অন্য পুস্তক হইতে বর্ণনা করিতে পারেন। ইহাতে বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হইবে, ছাত্র-ছাত্রীরাও পাঠদান শুনিয়া আনন্দ লাভ করিবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যালয় পরিবেশ

সমাজ তাহার শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক রূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য কতকগুলি প্রতিষ্ঠান তৈয়ার করিয়াছে। এইগুলি হইল বিদ্যালয়। সুকুমারমতি শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইলে বিদ্যালয়টিও উপযুক্ত হইতে হইবে। তবে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া প্রাসাদোপম বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলেই তাহা সকল সময় শিক্ষাদানের উপযোগী হয় না। শিক্ষার প্রয়োজনগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বল্পব্যায়েও ভাল বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা যায়। তাই কি রকম স্থানে ও কি আকারে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করিলে শিক্ষাদানের সুবিধা হয় তাহা এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

(এক) **বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন**—ঘন-বসতিপূর্ণ অঞ্চলে, হাট-বাজারের নিকট, বহুলোক বা গাড়ী চলাচল করে এমন রাস্তার পার্শ্বে বা অন্য কোন জনাকীর্ণ স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। কারণ সেই সকল স্থানে ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানের ব্যাঘাত হয়। জলাভূমি, গোরস্থান, শ্মশান বা জঙ্গলের নিকটও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। সেই সকল স্থানের দূষিত বায়ু সেবনে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। ইহা ছাড়া ছাত্রগণের নৈতিক অবনতিকর প্রভাবপূর্ণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত নয়। নদী ও পুষ্করিণীর তীর, নাত্যুচ্চ পর্বত বা মুক্তপ্রান্তরই বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণে প্রশস্ত স্থান। শহরে বড় রাস্তা হইতে দূরে, পার্ক বা ময়দানের ধারে বা শহরের প্রান্তভাগে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা ভাল। স্থানটি কিছু উচ্চ, শুষ্ক আলো বাতাস-যুক্ত হইতে হইবে এবং তাহার জল-নিকাশের সুবিধা থাকিতে হইবে। বিদ্যালয়-গৃহে চারিপার্শ্বে, বিশেষতঃ দক্ষিণ পার্শ্বে খোলা জায়গা থাকা প্রয়োজন; অন্যথায় বিদ্যালয়-গৃহের বায়ু-চলাচলের ও আলো প্রবেশের ব্যাঘাত হইবে। ইহার চারি দিকের দৃশ্য যত দূর সম্ভব সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্নিকটে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ সম্ভব না হইলে, তাহার সামনে অন্ততঃ মনোরম ফুলের বাগান তৈয়ার করিয়া স্থানটি চিত্তাকর্ষক করা যায়।

(দুই) **বিদ্যালয়-গৃহ**—বঙ্গদেশে সাধারণতঃ দক্ষিণ দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। সুতরাং এই দেশে দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ বিদ্যালয়-গৃহ নির্মাণ করা উচিত। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য বিদ্যালয়-গৃহের দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বে সমান্তরালভাবে যথেষ্ট দরজা ও জানালা থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়-গৃহের ভিত্তি অন্ততঃ দুই ফুট (২′) উচ্চ এবং পাকা হইলেই ভাল হয়। উহার ছাদ ভিত্তি হইতে ৭।৮ হাত উর্ধ্বে থাকা প্রয়োজন, যেন গৃহের অভ্যন্তরে যথেষ্ট বায়ু থাকিবার স্থান হয়। বিদ্যালয়-গৃহের কক্ষগুলি পাশাপাশি থাকা উচিত এবং বিদ্যালয় গৃহের দক্ষিণপার্শ্বে একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রশস্ত আচ্ছাদিত বারান্দা থাকা প্রয়োজন। ইহার সুবিধা এই যে, ছাত্র ও শিক্ষকগণ

কোন কক্ষের ভিতরে প্রবেশ না করিয়া নিজ নিজ শ্রেণীতে যাইতে পারেন। আজকাল স্থান সঙ্কুলানের অভাবে ইংরেজী E ও L অক্ষরের মত বাড়ি তৈয়ার করা হইতেছে।

বিদ্যালয়-গৃহে যাহাতে আলো প্রবেশের এবং বায়ু-চলাচলের কোন বাধা না হয় তাহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অনেকগুলি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকা দীর্ঘ সময়ের জন্য যে-ঘরে আবদ্ধ থাকে তাহাতে আলো প্রবেশের ও বায়ু-চলাচলের ভাল ব্যবস্থা না থাকিলে প্রয়োজনমত অম্লজান সরবরাহের অভাবে তাহারা অল্প মানসিক পরিশ্রমেই অবসাদগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের স্বাস্থ্যহানি হইবে। ভাল আলো-বাতাস পাইবার উদ্দেশ্যে আজকাল কেহ কেহ খোলা জায়গায় শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হইয়াছেন। কিন্তু খোলা স্থানে পাঠে মনোযোগদানের নানা বিঘ্ন হইতে পারে।

(তিন) বিদ্যালয়-গৃহে কক্ষের সংখ্যা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে স্বতন্ত্র শ্রেণী-কামরার প্রয়োজন নাই, এবং তাহাতে সুশাসন বজায় রাখার অসুবিধা হইতে পারে। তবে যত জন শিক্ষক থাকিবে ততটি শ্রেণী-কামরা থাকা প্রয়োজন। অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অপসারণযোগ্য কাঠের বা বাঁশের পর্দা দেওয়া উচিত। কেবল ছাত্রদের বসিবার স্থান পর্দা দিয়া ভাগ করিয়া দিলে একজন শিক্ষক কোন কামরায় বসিয়া পার্শ্বস্থিত দুই কামরার ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবেন, অথচ এক শ্রেণীর ছাত্রগণ অন্য শ্রেণীর ছাত্রগণকে দেখিতে পাইবে না। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষক না থাকিলে এই ব্যবস্থাই শ্রেয়ঃ। শ্রেণীর কামরাগুলি ছাড়াও শিক্ষকগণের বসিবার জন্য এবং অফিসের কাগজপত্র ও পুস্তকাগারের পুস্তক রাখিবার জন্য আরও একটি বা দুইটি কামরা থাকা প্রয়োজন।

উচ্চ-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য স্বতন্ত্র কামরা থাকা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া হেড্‌মাষ্টারের জন্য, শিক্ষকদের জন্য, অফিসের জন্য ও পুস্তকাগারের জন্যও এক একটি স্বতন্ত্র কক্ষ থাকা উচিত। ভাল স্কুলে ভূগোল, প্রকৃতিপাঠ ও বিজ্ঞান-শিক্ষার সরঞ্জাম রাখার জন্য একটা পদার্থাগারও থাকা বাঞ্ছনীয়। একটা ব্যায়ামাগারও না থাকিলে বর্ষার সময় ছাত্রদের ব্যায়াম করার অসুবিধা হয়। সকল বিদ্যালয়েই একটা সম্মেলন-কক্ষ (Assembly Hall) থাকা উচিত। তাহার আয়তন এরূপ হইবে যেন প্রয়োজনমত বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র তথায় সমবেত হইতে পারে। অন্য সময়ে ইহা ছাত্রদের সাধারণ পাঠাগার (Common Room) ভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(চার) শ্রেণী-কক্ষ—শ্রেণী-কক্ষে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য অন্ততঃ ১০ বর্গফুট মেঝে থাকা প্রয়োজন। ইংলণ্ডে প্রত্যেকের জন্য ১৪ বর্গফুট মেঝে রাখা হয়। সুতরাং ছাত্রের সংখ্যানুযায়ী শ্রেণী-কক্ষের আয়তন ছোট-বড় হইবে। সাধারণতঃ উচ্চ-ইংরেজী স্কুলে এক শ্রেণীতে ৪০ জন ছাত্র থাকিতে পারে। সুতরাং তাহার শ্রেণী-কক্ষগুলির আয়তন অন্ততঃ ৪০০ বর্গফুট হইতে হইবে। শ্রেণী-কামরা চৌকোণ (square) না হইয়া আয়তক্ষেত্রের আকারে (rectangular) হওয়া ভাল, অর্থাৎ ৪০ জন ছাত্রের কামরা ২৫ ফুট দীর্ঘ এবং ১৬ ফুট প্রস্থ হইতে পারে।

প্রত্যেক শ্রেণী-কক্ষে একটার বেশী দরজা থাকা উচিত নয়। কারণ তাহা হইলে ছাত্রগণ শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে বাহিরে যাতায়াত করিতে পারে। দরজাটি দক্ষিণ ধারের পূর্ব বা পশ্চিম প্রান্তে থাকা উচিত। ইহা ছাড়া দক্ষিণ ধারে আরও দুইটি জানালা এবং তাহাদের সমান্তরালভাবে উত্তর পার্শ্বেও দুইটি জানালা থাকা প্রয়োজন। দরজাগুলি ৬½ ফুট উচ্চ ও ৪ ফুট প্রস্থ এবং জানালাগুলি ৪ ফুট উচ্চ এবং ৩ ফুট প্রস্থ হওয়া উচিত। প্রত্যেক কামরার দরজা-জানালার ক্ষেত্রফল মেঝের ক্ষেত্রফলের ⅕ হইতে হইবে। ছাত্রগণ বেঞ্চে বসিলে তাহাদের চক্ষু যত উচ্চে থাকে জানালাগুলি ত'হা হইতে কিছু উচ্চে বসিবে। তাহা হইলে বাহিরের কোন বস্তুর প্রতি তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে না। সাধারণতঃ ২ বা ২½ হাত উচ্চে জানালা করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

(পাঁচ) **শ্রেণীকক্ষে বসিবার ব্যবস্থা** (Arrangement of Seats in the Class-room)—শ্রেণীকক্ষের যেই অংশে জানালাগুলি থাকে সেই অংশে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া ছাত্রগণকে বসিতে দিতে হইবে। তাহারা এই ভাবে বসিবে যেন তাহাদের বামপার্শ্ব হইতে আলো আসে। ডান দিক হইতে আলো আসিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই, তাহাতে কেবল লেখার সময় লেখার উপর হাতের ছায়া পড়িতে পারে। পশ্চাৎ হইতে আলো আসিলে তাহাদের দেহের ছায়া পুস্তকের উপর পড়িবে এবং পড়িবার অসুবিধা হইবে। সম্মুখ হহতে আলো আসিলে মনোযোগ-দানের ব্যাঘাত হয় ও চোখের অনিষ্ট হয়। সুতরাং আলোর দিকে মুখ রাখিয়া বসিতে দেওয়া উচিত নয়। তাহারা সকলে শিক্ষকের দিকে মুখ রাখিয়া সারি সারি হইয়া বসিবে। শিক্ষকের দৃষ্টি-বহির্ভূত স্থানে কোন ছাত্রকে বসিতে দেওয়া উচিত নয়।

শ্রেণীকক্ষের যেহ অংশে দরজা থাকে সেই অংশে ছাত্রগণের দিকে মুখ করিয়া শিক্ষক আসন গ্রহণ করিবেন। তাঁহার আসন কিছু উচ্চ হওয়া ভাল। তাহা হইলে তিনি শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার পার্শ্বে দরজার বিপরীত দিকে ব্ল্যাক-বোর্ড স্থাপন করিলে তাহার উপরে যথেষ্ট আলো পড়িবে এবং বোর্ডের লেখা বা চিত্র শ্রেণীর সমস্ত বালক দেখিতে পাইবে। ব্ল্যাক-বোর্ডের পার্শ্বেই ম্যাপ, চিত্র ইত্যাদি টাঙ্গাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

যেখানে বেঞ্চি থাকে না সেইখানে ঘরের মেঝেতে আসন পাতিয়া ছেলে-মেয়েরা বসে। তাহাদের সামনে একটি করিয়া ছোট ডেস্ক থাকে। শিক্ষক মহাশয় একটি টুলের উপর বসিবেন।

(ছয়) **বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র** (Furniture of the school)

১। **শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র—**

ছাত্রদের আসন। আমাদের দেশে পূর্বকালে ফরাসের উপর বা মাদুরের উপর বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ছিল। এখনও অনেক স্থানে তাহা আছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সমীচীন নয়। কেননা, ফরাসের উপর শিশুগণ সোজা হইয়া বসে না, প্রায়ই নুইয়া বা বাঁকা হইয়া বসে। অল্প বয়সে যখন তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল থাকে, তখন নুইয়া বা বাঁকা হইয়া বসিবার অভ্যাস করিলে তাহাদের দেহ

বাঁকা হইতে পারে বা তাহারা বিকলাঙ্গ হইয়া পড়িতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাতে শরীরে রক্ত-সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়। তাই ফরাসের উপর আরাম করিয়া বসিলে শিশুর জড়তা আসে বা সে অলসভাবাপন্ন হয় ও ফলে পাঠে অমনোযোগী হয়। আসন ঠিকমত না হইলে ছেলে-মেয়েরা—(১) যেখানে সেখানে বসিবে, (২) গোলমাল করিবে, (৩) শিক্ষক মহাশয় ঠিকমত পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে পারিবেন না, (৪) বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, এবং (৫) ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং ফরাসের পরিবর্তে বেঞ্চে বসিয়া পড়িবার ব্যবস্থা করাই সমীচীন।

বিভিন্ন প্রকারের আসন—আসন ভিন্ন ভিন্ন আয়তন ও আকারের হইতে পারে। যথা—১ জন বসিবার, ২ জন বসিবার, ৩ বা ৪ জন বসিবার আসন।

এক এক জন বসিবার আসনের সুবিধা—(১) ইহা আরামদায়ক; (২) পরস্পরের কাজে ব্যাঘাত করিবার সম্ভাবনা কম; (৩) স্বাস্থ্যকর, অন্যের নিঃশ্বাস নাকে যাওয়ার বা অন্য হইতে রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা কম; (৪) শিক্ষকের পক্ষে ছাত্রের কাজ পরিদর্শন করা সহজ হয়; (৫) ছাত্র সহজে আসন হইতে উঠিয়া কোন কাজ করিতে পারে; (৬) নকল করা কঠিন হয় এবং (৭) শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার সুবিধা হয়। ইহার মাত্র দুইটি অসুবিধা আছে, যথা—(১) ইহা বেশী ব্যয়সাধ্য ও (২) ইহার জন্য শ্রেণীকক্ষে বেশী স্থানের প্রয়োজন হয়। তবে গোল টুল ব্যবহার করিলে বোধ হয় বেশী খরচ হইবে না এবং বেশী স্থানের প্রয়োজন হইবে না। সুতরাং প্রত্যেক ছাত্রের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করাই সর্বাপেক্ষা ভাল। অনেক উচ্চ বিদ্যালয় ও নার্শারী স্কুলে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য ছোট ছোট চেয়ার ও টেবিল থাকে।

যদি অর্থাভাবে বা স্থানাভাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয় তবে দুই দুই জন ছাত্রের জন্য এক একটি আসনের ব্যবস্থা করা ভাল। ইহা প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা হইতে খারাপ হইলেও বিশেষ ক্ষতিজনক নয়। ইহাও সম্ভব না হইলে চারি জন পর্যন্ত ছাত্রের জন্য একটা আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। তাহার বেশী ছাত্রকে একটা আসনে বা বেঞ্চে বসিতে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। এক আসনে একজনের বেশী ছাত্রের বসিবার ব্যবস্থা হইলে, নম্বর দিয়া বা দাগ দিয়া প্রত্যেকের বসিবার স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া উচিত। তাহা হইলে এক আসনে অনেক ছাত্র বসিবার অসুবিধাগুলির অনেকটা প্রতিকার হইতে পারে।

আসনের পরিসর ও উচ্চতা—ছাত্রের বয়স বা উচ্চতা অনুযায়ী আসন বড়-ছোট বা উচ্চ-নীচ হইবে। আসনের পরিসর উরুর দৈর্ঘ্য হইতে কিছু কম হওয়া উচিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট শিশুর আসনের পরিসর ১০" (ইঞ্চি), মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যমাকৃতি ছাত্রের আসনের পরিসর ১২" (ইঞ্চি) এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের বা কলেজের যুবকের আসনের পরিসর ১৪" (ইঞ্চি) হইলেই ঠিক হয়। আসনের পরিসর ছাত্রের উচ্চতার $\frac{১}{৫}$ হওয়া উচিত। আসনের উচ্চতা ছাত্রের হাঁটুর উচ্চতার সমান হইবে, যাহাতে ছাত্র আসনে বসিলে তাহার পায়ের তলা ঠিক মেঝে পৌছে মাত্র।

২ জন বসিবার বেঞ্চের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৩' (ফুট) এবং ৪ জন বসিবার দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৬' (ফুট) হওয়া আবশ্যক।

আসনের পিছনে ছাত্রের কাঁধের সমান উচ্চ একটা খাড়া পিঠ (back) সংলগ্ন থাকা দরকার। ইহা থাকিলে ছাত্রকে খাড়া হইয়া বসিতে হয়।

পুস্তক রাখিবার জন্য ও লিখিবার জন্য বেঞ্চের সামনে একটা ডেস্ক থাকা প্রয়োজন। ডেস্ক বেঞ্চে সংলগ্ন থাকিতেও পারে, স্বতন্ত্র থাকিতেও পারে। এক আসনে বা বেঞ্চে যত জন ছাত্র বসিবার ব্যবস্থা হয়, একটা ডেস্কও তত জন ছাত্রের ব্যবহারের উপযোগী হইতে হইবে। সুতরাং আসনের দৈর্ঘ্য ও ডেস্কের দৈর্ঘ্য সমান হইবে।

বেঞ্চ হইতে ডেস্কের উচ্চতা এরূপ হইবে যাহাতে ছাত্র খাড়া হইয়া বেঞ্চে বসিলে কনুই ও হাত না তুলিয়া বা নামাইয়া ডেস্কের উপর রাখা যায়। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে, এই উচ্চতা ছাত্রের উচ্চতার প্রায় ১/৬ হয়। ডেস্কের পিছনের প্রান্ত বেঞ্চের সম্মুখ প্রান্তের ঠিক উপর পর্যন্ত পৌছিলে বা বেঞ্চের উপরও কিছু প্রসারিত হইলে লিখিবার সুবিধা হয়।

ডেস্কের পরিসর ১৫" হইতে ১৮" পর্যন্ত হইতে পারে। ডেস্কের উপরিভাগে সম্মুখ অংশে পুস্তক দোয়াত ইত্যাদি রাখিবার জন্য ৩" বা ৪" সমতল থাক প্রয়োজন। লেখার জন্য অবশিষ্ট ১২"—১৪" পর্যন্ত ঢালু হওয়া ভাল। ঢালুর কোণের পরিমাণ ১৫° (ডিগ্রী) হইলেই লিখিবার সুবিধা হয়।

ছাত্রের উচ্চতা অনুযায়ী বেঞ্চ এবং আসনের উচ্চতা ও পরিসর

ছাত্রের উচ্চতা	আসনের উচ্চতা	আসনের পরিসর	আসন হইতে ডেস্কের উচ্চতা
৪	১৩"	১০"	৮"
৪১/২'	১[illegible]"	১১"	৯"
৫'	১[illegible]১/২"	১২"	১০"
[illegible]১/২'	৮"	১৩"	১[illegible]"

২। **শিক্ষকের আসন ও টেবিল**—শিক্ষকের বসিবার জন্য একখানা চেয়ার এবং তাঁহার পুস্তক ও কাগজপত্র রাখিবার জন্য একখানি টেবিল থাকাও প্রয়োজন। এইগুলি প্রায় ১' (ফুট) উচ্চ বেদী বা তক্তপোষের উপর স্থাপন করিলেই ভাল হয়। তাহা হইলে শিক্ষক শ্রেণীর সকল ছাত্রের মুখ দেখিতে পাইবেন। শিক্ষকের চেয়ার হাত-বিহীন হওয়াই ভাল। কারণ পাঠদানের সময় তাঁহাকে বার বার চেয়ার হইতে উঠিতে হয়। টেবিলে একটা ড্রয়ার থাকিলে তাহাতে শ্রেণী-সম্পর্কিত কাগজপত্র

রাখা যায়। যে সব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বসার জন্য শতরঞ্চ ও ডেস্কের ব্যবস্থা আছে সেখানে শিক্ষকের বসার জন্য উঁচু ছোট চৌকি ও একটি ডেস্ক বা টুল রাখিতে হইবে।

৩। **শিক্ষা-সহায়ক আসবাব ঃ**

(ক) **ব্ল্যাক-বোর্ড**—শ্রেণী-শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীতে একটা বা বেশী ব্ল্যাক-বোর্ড থাকা একান্ত প্রয়োজন। ব্ল্যাক-বোর্ড নানা প্রকারের হইতে পারে। যথা—

(১) **ফ্রেমের সহিত আঁটা ব্ল্যাক-বোর্ড**—ইহা সাধারণতঃ চতুষ্কোণ হয়। উপরে ও নীচে, বা দুই পার্শ্বে কেবল দুইটি পেরেক দ্বারাই ইহা ফ্রেমের সহিত আঁটা থাকে। ইহার এপিঠ-ওপিঠ ঘুরাইতে পারা যায় এবং দুই পিঠই ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে এই প্রকারের ব্ল্যাক-বোর্ড থাকে।

(২) **ঝুলান ব্ল্যাক-বোর্ড**—ইহার কোন ফ্রেম থাকে না এবং একটা দড়ি বা তারের সাহায্যে ইহা দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখা যায়। সাধারণতঃ ইহার এক পিঠই ব্যবহার করা হয়। তবে প্রয়োজন হইলে উল্টাইয়া অপর পিঠও ব্যবহার করা যায়। খুব অল্প ব্যয়সাধ্য বলিয়া অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইহাই ব্যবহৃত হয়।

(খ) **প্লাস্টার বোর্ড**—দেওয়ালে প্লাস্টার দিয়া ইহা নির্মিত হয়। ইহা বেশ দীর্ঘ ও বড় হইতে পারে এবং ইহাতে একসঙ্গে অনেক ছবি আঁকা যায় ও সুদীর্ঘ বিষয় লেখা যায়। ইহা বেশী ব্যয়সাধ্য। প্রয়োজন মত ইহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না এবং কেবল পাকা দেওয়ালেই ইহা তৈয়ার করা যায়। সম্ভব হইলে শ্রেণী-কক্ষে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এই রকম ব্ল্যাক-বোর্ডও রাখা ভাল।

(৪) **ইজেলে স্থাপিত ব্ল্যাক-বোর্ড**—ফ্রেমে ইজেল লাগাইয়া তাহার উপর বোর্ড বসাইতে হয়। ইহার অনেক সুবিধা আছে। ইহা প্রয়োজন মত উপরে উঠান বা নীচে নামান যাইতে পারে এবং পিছন দিকে ইচ্ছামত হেলান যাইতে পারে। তাহা ছাড়া ইহাতে একই ফ্রেমে দুই বা ততোধিক বোর্ড পর পর ব্যবহার করা যাইতে পারে। একটু ব্যয়সাধ্য হইলেও সম্ভব হইলে এই আকারের ব্ল্যাক-বোর্ড ব্যবহার করাই ভাল।

(৫) **গ্রাফবোর্ড**—এই ব্ল্যাক-বোর্ডে দাগ কাটা থাকে। ১ ইঞ্চি পর পর খাড়া (Vertical) ও শয়ান (Horizontal) দাগ কাটিয়া সমস্ত বোর্ডখানি এক বর্গ-ইঞ্চি আয়তনের ছোট ছোট বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করা হয়। রেখাচিত্র (Graph) আঁকিবার জন্য বা মাপমত কোন চিত্র, নক্সা বা মানচিত্র আঁকার জন্য এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। নিম্নস্তরের শিক্ষায় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।

(৬) **কাপড়-বোর্ড**—কাপড়ের উপর এক প্রকার আঠাল জিনিস লাগাইয়া ও কাল রং দিয়া এই বোর্ড নির্মিত হয়। দেওয়ালে বা কোন ফ্রেমে আঁটিয়া দিয়া ইহা ব্যবহার করা যায়। ইহার সুবিধা এই যে, ইহা ব্যবহারের পর শ্রেণী হইতে লইয়া যাওয়া যায় এবং শ্রেণীর বাহিরে ইহাতে ছবি, ম্যাপ প্রভৃতি আঁকিয়া শ্রেণীতে আনিয়া দেখান যায়। তবে ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। সম্ভব হইলে কাঠের বোর্ডের অতিরিক্ত এরূপ কয়েকটি কাপড়-বোর্ডও রাখা যাইতে পারে।

অন্যান্য জিনিস। সুন্দর অক্ষরে সারগর্ভ বাক্যলেখা কাগজ কার্ডবোর্ডে আঁটিয়া শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। নানা বিষয়ের চার্ট তৈয়ার করিয়াও দেওয়ালে ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে কতকগুলি সুদৃশ্য ও শিক্ষাপ্রদ ছবি থাকা বাঞ্ছনীয়। মনে রাখিতে হইবে, একই ছবি দীর্ঘদিন থাকিলে ছাত্রদের চোখে ক্লান্তিকর ঠেকিবে।

(ক) **ম্যাপ**—ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিদ্যা ইত্যাদি পাঠের জন্য বিদ্যালয়ে ম্যাপ অনিবার্য। শ্রেণীকক্ষের মধ্যে ম্যাপ স্ট্যাণ্ডে শ্রেণীর উপযোগী ম্যাপগুলি থাকিতে পারে অথবা প্রয়োজনের সময় অফিস হইতে সেইগুলি আনা হইয়া থাকে। দেওয়ালের পেরেকে অথবা বোর্ডের উপর ম্যাপ টাঙাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের দেখান হয়। ম্যাপ দেখাইবার জন্য একটি সরু কাঠি ব্যবহৃত হয়। ইহাকে পয়েণ্টার বলে।

(খ) **ছবি**—শ্রেণী-পাঠনের সময় প্রয়োজনস্থলে ছবি দেখাইবার জন্য কাপড় বোর্ডে অথবা দেওয়ালের পেরেকে টাঙান হইয়া থাকে।

(গ) **চার্ট**—নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের চার্ট মাঝে মাঝে শ্রেণীকক্ষে টাঙান ভাল। ছবির মতই পুরাতন চার্টের বদলে নূতন চার্ট দিতে হয়।

(ঘ) **আলমারী**—সম্ভব হইলে প্রতি শ্রেণীতে একটি করিয়া ছোট আলমারী রাখা ভাল। সেখানে শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক ও শ্রেণীর উপযোগী অন্য সাহায্য পুস্তক রাখা চলে।

৪। **অফিসের আসবাব-পত্র**—প্রাথমিক বা মাধ্যমিক প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অফিসের জন্য কিছু জিনিসপত্রের প্রয়োজন। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ পৃথক্ অফিস থাকে। সে সব ক্ষেত্রে অফিসের চেয়ার, টেবিল, অফিসের বিবিধ সরঞ্জাম থাকে।

৫। **পাঠাগারের আসবাব-পত্র**—প্রায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া পাঠাগার থাকে। যদিও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৃথক্ পাঠাগার থাকে না। পাঠাগারে অনেক উপকরণ লাগে। বই, বই রাখার আলমারী বা র‍্যাক, চেয়ার, টেবিল, স্টক বই, ইস্যু বই ইত্যাদি। পাঠাগারের আলমারার সম্মুখের ভাগ কাঁচের হইবে, যাহাতে বাহির হইতে বই চিনিয়া লওয়া যায়।

৬। **গবেষণাগার, বিজ্ঞানাগার, শিল্প-ভবন প্রভৃতির নানাবিধ সরঞ্জাম**—আদর্শ বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ মাধ্যমিক স্তরে গবেষণাগার থাকা অবশ্য বাঞ্ছনীয়। এইখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী যন্ত্রপাতি থাকিবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে ফলিত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিজ্ঞানাগার (laboratory) থাকিবে। বিদ্যালয়ের মান অনুযায়ী বিজ্ঞান ও ভূগোলের বিবিধ যন্ত্রপাতি ও সংগ্রহ, চার্ট, ছবি, বিজ্ঞানের গবেষণার যন্ত্রপাতি এখানে থাকিবে। এইখানে প্রকৃতিকোণ ও মিউজিয়ম থাকিতে পারে।

বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পৃথক্ শিল্প-ভবন থাকিবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযোগী শিল্পের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ এখানে থাকে।

৭। **মনোবিজ্ঞানমূলক পরীক্ষার যন্ত্রপাতি**—আদর্শ বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য বিবিধ যন্ত্রপাতি থাকে। যেমন—বুদ্ধি, ধৈর্য, স্মৃতি ইত্যাদি পরীক্ষার বিবিধ যন্ত্র।

(সাত) খেলার মাঠ

বিদ্যালয়-গৃহের সামনে কিছু খোলা জায়গা থাকা দরকার। বিদ্যালয়-গৃহে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ইহা রাখার প্রয়োজন হয়। ইহা ছাড়া, ছাত্রগণ ছুটির পর এই স্থানে সমবেত হইয়া সারিবদ্ধ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে পারে।

খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার—প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে বা যত দূর সম্ভব নিকটে একটা খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যানুযায়ী খেলার মাঠের আকার বড়-ছোট হইবে, ইহাতে যেন বিভিন্ন বয়সের অনেক ছাত্র একসঙ্গে নানা খেলা খেলিতে পারে। ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, কপাটি ইত্যাদি ছাড়াও দৌড়াদৌড়ি করা, প্যারেড করিবার মত জায়গা থাকা প্রয়োজন। মেয়েদের খেলাধূলার জন্য ঘেরা মাঠ থাকা দরকার। কিন্তু বিদ্যালয়-সংলগ্ন প্রয়োজনমত বড় খেলার মাঠ না থাকিলে বিদ্যালয়ের এতগুলি ছাত্রের ব্যায়াম বা খেলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না। প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় করিতে পারিলে প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে একটা ব্যায়ামাগারও রাখা ভাল। তাহা হইলে বর্ষার সময় ছাত্রগণের ব্যায়াম করার সুবিধা হয়। ইহার জন্য একটা খোলা ঘরেরই প্রয়োজন। টিনের বা খড়ের ছাউনী দিয়া চারিদিকে খোলা একটা ঘর তৈয়ার করা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নয়। খেলার মাঠ বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর করিয়া তুলে।

(আট) পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা—প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ মধ্যাহ্নকালে ৪।৫ ঘণ্টা সময় জলপান না করিয়া থাকিতে পারে না। বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকিলে নিকটস্থ পুকুর বা ডোবার দূষিত জল পান করিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে। যে স্থানে কলের জল সরবরাহ হয় তথায় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণেই একটা জলের কল রাখা যাইতে পারে। অন্য স্থানে বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে একটি নলকূপ প্রোথিত করিলে বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যাইতে পারে। এই দুইটার কোনটাই সম্ভব না হইলে বিদ্যালয়ে কয়লা-বালির ফিল্টারের সাহায্যে জল পরিষ্কার করিয়া ঢাকা-দেওয়া পাত্রে জমা রাখা যাইতে পারে। একই পাত্র হইতে অনেক ছাত্র জলপান করিলে একজনের মারাত্মক রোগ অন্য ছাত্রের শরীরে সংক্রমিত হওয়ার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং জল খাওয়ার জন্য কোন পাত্র না রাখিয়া ছাত্রগণের অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে জল ঢালিয়া দেওয়া এবং তাহা হইতে জল খাইতে দেওয়াই ভাল। অথবা জলপাত্র মুখে না লাগাইয়া জল খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল।

(নয়) পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান—প্রত্যেক স্কুলের সঙ্গে ছাত্র ও শিক্ষকগণের জন্য স্বতন্ত্র পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান রাখা একান্ত প্রয়োজন। তবে স্কুল-গৃহ হইতে যথেষ্ট দূরে পায়খানা ও প্রস্রাবের স্থান নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন স্কুলগৃহে ইহার দুর্গন্ধ আসিতে না পারে। স্কুল-প্রাঙ্গণের উত্তর-পশ্চিম কোণায় পায়খানা ও

প্রস্রাবের ঘর নির্দিষ্ট করা উচিত। বড় শহরে ফ্লাস (flush)-যুক্ত পায়খানা না হইলে প্রত্যহ উহা পরিষ্কার করার জন্য মেথর নিযুক্ত করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে যেখানে মেথর পাওয়া যায় না, সেখানে কোন স্রোতযুক্ত খালের উপর পায়খানা নির্মাণ করিলেই ভাল হয়।

বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা অনুযায়ী এইগুলির সংখ্যা নিরূপিত হইবে। পায়খানা ও প্রস্রাবখানা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

বিদ্যালয়ের বাড়তি জল ও ময়লা দূরীকরণের জন্য পাকা ড্রেন থাকিবে। দেখা দরকার এই ড্রেনে যেন ময়লা না জমে ও অপরিচ্ছন্ন না থাকে।

বিদ্যালয় পরিবেশ সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। যেখানে সেখানে ছেঁড়া কাগজ, থুথু ইত্যাদি না ফেলিয়া ঐগুলি ফেলিবার জন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি নির্দিষ্ট পাত্র রাখা দরকার।

বিদ্যালয় পরিবেশকে সুন্দর করিতে হইলে তাহাকে যেমন পরিচ্ছন্ন করিতে হইবে অন্যদিকে কিছু গাছপালার ব্যবস্থাও করা দরকার। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও খেলার মাঠের আশে পাশে কিছু ছায়াঘন অথচ ফুলের গাছ লাগাইতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয় ও সমাজ

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে কি রকম সম্পর্ক থাকা উচিত, তাহা অনেক দিন হইতে আলোচিত হইতেছে। শিক্ষা-বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের লোকেরাই নিজেদের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছে। বিদ্যালয়ই আমাদের উত্তরাধিকার হিসাবে পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদিগকে দান করে। এই শিক্ষার পথেই সমাজ স্থিতিলাভ করিতেছে। দিনে দিনে সমাজের প্রতি বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাইতেছে।

আমাদের দেশে সমাজ-জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার ধারা স্থির করা হইয়াছে এবং সেই গণতান্ত্রিক শিক্ষার ধারা সমাজ-জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে।

পরাধীন ভারতে আমাদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে বিদ্যালয়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। স্বাধীনতা উত্তর যুগে সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে।

সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে দুইটি পথ থাকিবে। একটি পথ দিয়া বিদ্যালয় হইতে ভাবধারা সমাজে প্রবেশ করিবে এবং অপরটি দিয়া সমাজ হইতে ভাবধারা বিদ্যালয়ে যাইয়া প্রবেশ করিবে। বিদ্যালয় সমাজের প্রয়োজনকে তাহার পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করিবে, কিন্তু তাহা হইলেও বিদ্যালয় সমাজকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া চলিবে না।

সমাজের কেন্দ্র হিসাবে বিদ্যালয়—মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের একটি উদ্দেশ্য আছে, তাহার ঐতিহ্য আছে, সমাজের অধিবাসী সকলকেই এই উদ্দেশ্য ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রত্যেক সমাজেরই সামাজিক উত্তরাধিকার আছে। বিদ্যালয়, পরিবার বা গৃহ এই উত্তরাধিকার হস্তান্তর করিবার জন্য পরস্পর সহযোগিতা করিয়া থাকে। সক্রিয় শিক্ষাকেন্দ্র বিদ্যালয়ের সাহায্যে সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তরাধিকার বিকীরণ করিবার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

সমাজের কর্তব্য—(১) সমাজে বিভিন্ন রুচি ও প্রবণতার লোক থাকে। এই সব লোকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সমাজের কর্তব্য।

(২) সমাজে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে, যাহাতে সকলে নিজের সামর্থ্য মত শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

(৩) সমাজ শিক্ষার সব ব্যয়ভার বহন করিবে।

বিদ্যালয় মানুষের প্রয়োজন ও সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়া শিক্ষা ব্যবস্থা করিবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন বিদ্যালয়কে সমাজ-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করিবার উপর গুরুত্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "The starting point of educational reforms must be relinking of the school to life and restoring of the intimate relationship between them which has broken down with the development of formal tradition of education."

বিদ্যালয়কে সমাজ-কেন্দ্র করিবার বিভিন্ন উপায় :

(১) বিদ্যালয়কে সমাজ-কেন্দ্র করিবার প্রথম সোপান হইল সমাজের ধ্যান ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া বিদ্যালয়ের কার্যবিধি নির্ধারণ করা।

(২) বিদ্যালয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহার সঙ্গে সমাজের বা বহির্জীবনের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যাহাতে সমাজের সমস্যার সহিত তাহার সম্পর্ক থাকে।

(৩) প্রয়োজনবোধে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইবে।

(৪) নাগরিকদের মিলন-কেন্দ্র হইবে বিদ্যালয়।

(৫) বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার উপযোগী ব্যবস্থা থাকিবে।

(৬) বিদ্যালয় হইবে একটি সমাজ মিলন-কেন্দ্র। এইখানে সর্বস্তরের সামাজিকদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কৃষি, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, সঙ্গীত, হস্তশিল্প ইত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজ মিলন-কেন্দ্রে থাকিবে। এখানে বয়স্ক লোকদের শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিবে।

(৭) শিক্ষক ও অভিভাবকগণ একত্র হইয়া সমাজের বিভিন্ন সমস্যা (যেমন—সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাদান) সম্বন্ধে বন্ধুভাবে আলোচনা করিতে পারেন।

(৮) বিদ্যালয় পাঠাগার বিদ্যালয়ের ছুটির পর স্থানীয় অধিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত থাকিতে পারে।

(৯) সন্ধ্যার সময় বিদ্যালয়-গৃহে বয়স্ক শিক্ষণ ব্যবস্থা চলিতে পারে।

(১০) অপরাহ্নে বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার মাঠ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(১১) বিদ্যালয়ে যখন কোন উৎসব বা বিনোদনের ব্যবস্থা হয়, তখন সমাজের সকলকে সেইখানে আমন্ত্রণ করিতে হইবে। তাহাতে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে নিগূঢ় সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

(১২) বিদ্যালয়ের সকল কাজে পিতামাতা ও অভিভাবকদের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিয়া বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে বিদ্যালয়ের কাজ দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। ইহাতে অভিভাবকদের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে। তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য বেশী আগ্রহান্বিত হইবেন।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি (Parent Teacher Association)

বিদ্যালয় প্রতিটি ছাত্রের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং রুচিগত গুণাবলীর বিকাশে সচেষ্ট। অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহিত জড়িত। এই কাজের জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয় একক দায়িত্ব নিয়া চলিতে পারে না, পিতামাতার সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে। নিম্নলিখিত উপায়ে শিক্ষক অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করিবেন :

(১) শিক্ষক পিতামাতা ও অভিভাবককে সর্বদা ছাত্র সম্বন্ধে অবহিত রাখিবেন।

(২) শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা—খেলার প্রতি আসক্তি অনাসক্তি—অর্থাৎ শারীরিক বিকাশ সম্পর্কেও অভিভাবককে জানাইবেন।

(৩) ছাত্রদের নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কেও পিতামাতা শিক্ষকের নিকট জানিয়া লইবেন। বিদ্যালয় ও গৃহ সমবেতভাবে ছাত্রদের অবাঞ্ছিত প্রবণতা দূর করিতে চেষ্টা করিবে। ছাত্রদের চরিত্রগঠনে উভয়ের সমবেত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির সহযোগিতার উপায়

(ক) **অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি**—বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি বিধানের জন্য অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির গুরুত্ব খুব বেশী। অভিভাবকগণের মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে যাওয়াই সমস্যা সমাধানের উপায় নয়। অভিভাবক ও শিক্ষকদের একটি স্থায়ী সমিতি গঠন করিতে হইবে। শিক্ষক সমিতি ও অভিভাবক সমিতি পৃথকভাবে কাজ করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যোগাযোগ থাকিবে।

পূর্বে এই ধরনের সমিতি না থাকিলেও শিক্ষক ও অভিভাবকদের সম্পর্ক মধুর ছিল। শিক্ষকরা মাঝে মাঝে ছাত্রের বাড়ি গিয়া খোঁজ লইতেন। ছাত্র-শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে একটি স্নেহ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। এখন দিনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন শিক্ষক চাকরি করেন, ছাত্র বেতন দিয়া পড়ে। সেখানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কোথায়? ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলতা বাসা বাঁধিয়াছে—সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের সমবেত প্রচেষ্টায় অবস্থার পরিবর্তন হইতে পারে।

(খ) **শিক্ষক সমিতি**—শিক্ষকরা নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ হইয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্পর্কে যেমন আলোচনা করিবেন তেমনি শিক্ষার্থীদের কিভাবে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা অভিভাবক সমিতির সঙ্গে আলোচনা করিবেন।

(গ) **অভিভাবক সমিতি**—অভিভাবক সমিতি প্রতিমাসে একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমিতির সঙ্গে মিলিত হইবেন এবং শিশুদের ঘরের পড়াশোনা ও আচরণ সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করাইবেন। মনে রাখিতে হইবে ছাত্র বিদ্যালয়ে থাকে মাত্র ৫/৫½ ঘণ্টা, আর বাকি সময় থাকে গৃহে। অতএব অনেক অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা গৃহ পরিবেশ হইতে গ্রহণ করে। যদি অপ্রত্যক্ষ শিক্ষা অবাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে ছাত্র বিদ্যালয়ে যত উত্তম শিক্ষা পাক, তাহার শিক্ষা কার্যকর হইবে না। সেইজন্য ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যাপারে অভিভাবকদের সতর্ক থাকা প্রয়োজন। তাঁহারা ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে সর্বদা শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিবেন।

বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা থাকিতে পারে। যেমন, গৃহসমস্যা, আসবাবপত্র, খেলার সরঞ্জামের অপ্রাচুর্য ইত্যাদি। শিক্ষক সমিতি এ বিষয়ে অভিভাবক সমিতির সঙ্গে কথা বলিতে পারেন। উভয়ের প্রচেষ্টায় অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

(ঘ) **অভিভাবক দিবস**—প্রতি বিদ্যালয়ে অভিভাবক দিবস থাকা বাঞ্ছনীয়। বৎসরের নির্দ্দিষ্ট দিনে অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করিয়া বিদ্যালয়ে আনা কর্তব্য।

(১) বিদ্যালয়ে যখন কোন সহ-পাঠ্যক্রমিক শিক্ষার প্রদর্শনী হয়, যেমন, পারিতোষিক বিতরণ উৎসব, নাটক অভিনয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরস্বতী পূজা—সেই সময় অভিভাবকদের বিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ করা উচিত। অভিভাবকগণ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের কর্মক্ষমতা ও বিদ্যালয়ের কর্মদ্যোগ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন।

(২) ইহার মাধ্যমে অভিভাবকগণ তাঁহাদের সন্তানদের সৃজন ক্ষমতা ও পরিচালনা সম্পর্কে অবহিত হইবেন।

(৩) সে সময় শিক্ষকগণ অভিভাবকগণকে অনুরোধ করিবেন, তাঁহারা যেন বিদ্যালয়ে ছাত্ররা যাহা শিখিতেছে তাহাতে উৎসাহ দেন এবং অনুশীলন করিবার সুযোগ দেন।

(৪) অভিভাবকগণ নূতন শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে জানিবেন এবং বর্তমান জগতের সঙ্গে সমতা রাখিয়া ছাত্রদের শিক্ষাদানে সাহায্য করিবেন।

(৫) পিতামাতা ও অভিভাবকগণকে বৎসরের নির্দিষ্ট দিনে বিদ্যালয়ের কাজ-কর্ম দেখিতে দিতে হইবে।

(ঙ) **বিদ্যালয়ের প্রদর্শনী**—বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ দিন উপলক্ষে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীরা শিল্পকাজ করে, সাহিত্য রচনা করে, ছবি আঁকে, নানা জিনিস সংগ্রহ করে। এই সব জিনিস দিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যায়। অভিভাবকগণকে এই উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রদর্শনী দেখান যাইতে পারে। বিদ্যালয়ে স্থায়ী প্রদর্শনীও থাকিতে পারে। অভিভাবকগণ বিদ্যালয়ে গেলে ছাত্র-ছাত্রীগণ অত্যন্ত যত্ন করিয়া তাঁহাদিগকে নিজেদের হাতের কাজগুলির ব্যাখ্যা করিয়া বিবরণ দিবে। এভাবে দুই পক্ষেরই উৎসাহ বৃদ্ধি পাইবে।

(চ) **বিদ্যালয় সমিতি**—বিদ্যালয় সমাজের সৃষ্টি এবং সমাজের জন্ম সৃষ্টি। অতএব বিদ্যালয় পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে বিদ্যালয় সমিতিতে অভিভাবকগণের নির্বাচিত ব্যক্তি থাকিবেন। ইহাতে বিদ্যালয় ও অভিভাবকগণের মধ্যে একটা সক্রিয় সংযোগ থাকিবে।

(ছ) **শিক্ষাসংক্রান্ত আলোচনাচক্র**—অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা-বিভাগের স্থানীয় কমচারীদের লইয়া বিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে শিক্ষা সংক্রান্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মাঝে মাঝে এইরূপ আলোচনার ফলে অনেকেই হয়ত শিক্ষার ধারা সম্বন্ধে কিছুটা অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের উন্নতি বা সাধারণভাবে শিক্ষা নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিতে পারিবেন।

অভিভাবক-শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ কার্য হইবে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে আলোচনা করা। বিদ্যালয় হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে Progress Report যাইবে—এই হইল নিয়ম। কিন্তু শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের সম্পর্কে পূর্বাহ্নে আলোচনা করেন তাহা হইলে ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ সম্পর্কিত অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিম্নরূপ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন:

বিদ্যালয়কে সমাজের সহযোগিতা লাভ করিতে হইবে। যদি বিভিন্ন শিক্ষার ক্ষেত্র, যেমন—গৃহ, বিদ্যালয়, পরিবেশ, সমাজ, ধর্মপ্রতিষ্ঠান, সরকার একযোগে সহযোগিতা না করে এবং তাহাদের শিক্ষা সমস্যা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গী এক না হয় এবং তাহারা যদি বিভিন্নমুখী হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের একার পক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হইবে না। বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রী জীবনে শিক্ষালাভ করে না, সমাজও তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে। এই জন্যই বিদ্যালয় ও অভিভাবকের মধ্যে পরস্পর যোগাযোগ থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কমিশন আরও বলিয়াছেন যে অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি শুধু দুই পক্ষের অভিযোগ শুনিবার জন্যই সৃষ্ট হইবে না, কিম্বা তাঁহাদের কার্যের ঐখানেই সমাপ্তি হইবে না, অভিভাবক ও শিক্ষকের মধ্যে একটা সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং একে অন্যকে নানাভাবে সাহায্য করিয়া ছাত্রছাত্রীদের মঙ্গল সাধন করিবেন।

অভিভাবকদের কর্তব্য—কেবল শিক্ষক বা বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবকের অনেক কর্তব্য রহিয়াছে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতার ব্যাপারে অভিভাবকও সক্রিয় থাকিবেন। কয়েকটি কাজের মাধ্যমে অভিভাবক শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব পালন করিতে পারেন ও শিক্ষক-অভিভাবক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিতে পারেন।

(১) শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে ও শিক্ষককে যোগ্য মর্যাদা দিতে হইবে। কখনও শিশুর শ্রবণ সীমার মধ্যে অভিভাবক শিক্ষকের সমালোচনা করিবেন না। বিদ্যালয় বা

কোন শিক্ষক সম্পর্কে তাঁহার অভিযোগ থাকিলে তিনি শিক্ষকের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করিবেন বা সেই বিষয়ে পত্রালাপ করিবেন।

(২) ছাত্র সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া। অভিভাবক মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ে গিয়া শিক্ষকের কাছ হইতে তাঁহার পুত্র কন্যার শিক্ষা সম্পর্কে খোঁজ লইতে পারেন। ইহার দ্বারা ঘরের কাজ ও ব্যবহার যেমন পরিচালনা করা যায় অন্যদিকে শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কও ভাল হয়।

(৩) গৃহ-শিক্ষক না রাখা। গৃহ-শিক্ষক রাখিলে শিশু তাঁহার উপরই বেশী নির্ভরশীল হইয়া পড়ে এবং অভিভাবকেরও বিদ্যালয়ের উপর বেশী আস্থা গড়িয়া উঠে না। অভিভাবক শ্রেণী-শিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গৃহকাজের রুটিন ঠিক করিবেন ও তাঁহার পরামর্শমত শিশুকে পরিচালনা করিবার চেষ্টা করিবেন।

(৪) ছাত্রের পুষ্টি ও আচরণ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখা। ছাত্র বিদ্যালয়ের বাহিরে গৃহ ও সামাজিক পরিবেশেই বেশীক্ষণ থাকে। কাজেই দেখিতে হইবে সে যেন কুসঙ্গে মিশিয়া খারাপ না হয় এবং তাহার শারীরিক পুষ্টির অভাব না ঘটে।

(৫) সম্ভব হইলে আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি ও নীতি সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখা। অনেক সময় বিদ্যালয়ের কাজকর্ম অভিভাবকের মনঃপুত হয় না। তাঁহারা কঠোর সমালোচনা করেন। অভিভাবকের উচিত শিক্ষকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা প্রায়ই অভিযোগ করেন, তাঁহাদের কাজকর্ম অভিভাবকেরা সুনজরে দেখেন না। সাফাই করা, বাগান করা, শিল্পকাজ, উৎসব অনুষ্ঠান, ইত্যাদি কাজে তাঁহারা শিশুদের নিয়োগকে সময় ও শক্তির অপচয় বলিয়া মনে করেন।

আসলে অভিভাবকেরা শিল্প ও কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদী পাঠ্যক্রম জানেন না বলিয়াই বিরূপতা করেন। প্রগতিশীল শিক্ষা সম্পর্কেও অভিভাবকদের কিছু জ্ঞান থাকা ভাল।

বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন (Corporate life in School)

আদর্শ সামাজিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের আবির্ভাব। ইহাও একটি আদর্শ সমাজ। কিন্তু বহিঃস্থ সমাজের মত পূর্ণাঙ্গ নয়। এই সমাজ বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্ট—তাই কৃত্রিম। বিদ্যালয়ে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া ও কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া এই কৃত্রিমতা পরিহার করা যাইতে পারে।

যতক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক সকলে পরস্পরের সহিত স্নেহ-ভক্তি-ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না হয়, একসঙ্গে কাজ করিতে, একসঙ্গে আমোদ-উৎসব করিতে, একসঙ্গে খেলা করিতে, পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করিতে, বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের স্বার্থ ও সম্মানকে নিজের স্বার্থ ও সম্মান বলিয়া বিবেচনা করিতে না শিখে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাকে আদর্শ বিদ্যালয় বলা যায় না। বস্তুতঃ, প্রকৃত বিদ্যালয় একটি দ্বিতীয় পরিবারে পরিণত হয়, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণকে ছাত্রের পিতামাতার স্থান অধিকার করিতে হয় এবং ছাত্রগণকে পরস্পরকে বড় বা ছোট ভাইয়ের মত

দেখিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে স্কুল-জীবনটাকে আনন্দদায়ক করিবারও চেষ্টা করিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র-শিক্ষক সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহাদের সামাজিক জীবন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে।

এইরূপ মনোভাব জাগাইবার জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা যায়:—

(১) পূর্ব বর্ণনানুযায়ী দলগত প্রতিযোগিতার জন্য ছাত্রগণকে লইয়া কতকগুলি House গঠন করিলে এইরূপ সামাজিক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হয়।

(২) বিদ্যালয়ের **সমস্ত ছাত্রকে মিলিত হইয়া কতকগুলি কাজ করিতে দিলেও সংহতি-বোধ জাগে।** যেমন,—

(ক) **স্কুলের প্রারম্ভে ও শেষে প্রার্থনার** জন্য সকল ছাত্রের একস্থানে সমবেত হইবার ব্যবস্থা।

(খ) **দলবদ্ধ সঙ্গীত বা আবৃত্তি** (Mass-Singing)

প্রতিদিন সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া সমস্বরে ধর্ম, নীতি বা দেশপ্রেম সম্বন্ধীয় কোন গান করিতে পারে বা কোন কবিতা আবৃত্তি করিতে পারে।

(গ) **দলবদ্ধ নৃত্য।** ব্রতচারী নৃত্যের ন্যায় দলবদ্ধ নৃত্যের ব্যবস্থা হইতে পারে।

(ঘ) **দলবদ্ধ ব্যায়াম** (Mass-Drill)। সমস্ত ছাত্র খেলার মাঠে সমবেত হইয়া একসঙ্গে Drill বা কোন ব্যায়াম করিতে পারে।

(ঙ) **পতাকা অভিনন্দন।** সকল ছাত্র সমবেত হইয়া বিদ্যালয়ের পতাকা ও জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন দেখাইতে পারে।

(৩) বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের **এক প্রকার পোশাক** (Uniform) **ব্যবহার** করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়। ইহা সম্ভব না হইলে অন্ততঃ সকল ছাত্রকে **কোন প্রকার পরিচয়-চিহ্ন** (Badge) **ব্যবহার** করিতে দেওয়া যাইতে পারে। এমনকি শিক্ষকেরাও বিদ্যালয়ের কোন পরিচয়-চিহ্ন ব্যবহার করিতে পারেন।

(৪) বৎসরের বিভিন্ন ভাগে **বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা** করিলেও বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন পুষ্ট হয়। যেমন—

(ক) প্রত্যেক বৎসর বিদ্যালয়-স্থাপনের দিনে সমারোহপূর্ণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(খ) পুরস্কার-বিতরণী সভা আহ্বান এবং সমারোহের সহিত বৎসরে একবার পুরাতন ছাত্রদের নিমন্ত্রণ করিয়া মিলনোৎসবের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(গ) মধ্যে মধ্যে সামাজিক মিলনের ব্যবস্থা করা যায়। সেই উপলক্ষ্যে সঙ্গীত, আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন হইতে পারে।

(৫) **সেবাসংঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার স্থাপন।** আমোদ-উৎসবে সকলের অংশ গ্রহণ করা যেমন সামাজিক জীবনের অঙ্গ, তেমনি পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগরিত করিয়া আপদে বিপদে পরস্পরের সাহায্য করিতে এবং পরস্পরের অভাব পূরণের চেষ্টা করিতে শিক্ষা দিলেও বিদ্যালয়ের ছাত্র-

শিক্ষকদের মধ্যে হৃদয়-বন্ধন স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের সেবা-সঙ্ঘ ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য সাহায্য-ভাণ্ডার গঠন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রগণকে এই সুযোগ দেওয়া যায়।

(৬) **অন্য বিদ্যালয়ের সহিত নানা বিষয়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।** এক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যখন অন্য বিদ্যালয়ের ছাত্রের সহিত কোন প্রতিযোগিতা-মূলক খেলা (Competitive Matches) খেলে, তখন বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্র তাহার বিদ্যালয়ের খেলোয়াড়-দলের সহিত সম্পূর্ণ এক বলিয়া অনুভব করে। সেরূপ আমোদ-উৎসব, সেবা, পরীক্ষায় কৃতকার্যতা প্রভৃতি বিষয়েও অন্য বিদ্যালয়ের সহিত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিতে পারিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সামাজিক মনোবৃত্তি জাগরিত হয়।

(৭) **শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে বিদ্যালয় সম্বন্ধে উচ্চ আদর্শ স্থাপন** এবং তাহার জন্য সকলকে গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা-দান। বিদ্যালয়ের যাহা কিছু গৌরবের বিষয় আছে তাহা শিক্ষক ও ছাত্রের সামনে স্থাপন করিতে হইবে। যেমন,—যে সকল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি বা পুরস্কার লাভ করিয়াছে এবং যে-সকল পূর্বতন ছাত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহাদের তালিকা বিদ্যালয়ের সভা-ঘরের দেওয়ালে বা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিদ্যালয়ের পূর্বতন ছাত্রদের মধ্যে যাঁহারা নানাক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া যশস্বী ও সম্মানার্হ হইয়াছেন, তাঁহাদের ছবিও সভাগৃহের দেওয়ালে সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া খেলা, ব্রতচারী, স্কাউট প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাফল্যের বিবরণ একটা বোর্ডে লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অপরদিকে, সুযোগ হইলেই বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ছাত্রদের সামনে ধরিতে হইবে এবং বিদ্যালয়ের সম্মান রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে সকলকে উৎসাহ দিতে হইবে। ছাত্রগণকে সর্বদা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, তাহারা যেন তাহাদের বাক্যে, কার্যে ও ব্যবহারে বিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখে। ইহা গেল পরিবেশ রচনার বহিরঙ্গ মাত্র। সুস্থ পরিবেশ রচনা বিদ্যালয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। বাইরের গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ জাগ্রত করিতে হইলে বিদ্যালয় পরিচালনাও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে নিম্নোক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে :

(১) ছাত্র-ছাত্র সম্পর্ক। (২) ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক। (৩) শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক।

(১) **ছাত্র-ছাত্র সম্পর্ক**—বিদ্যালয়ে একই উদ্দেশ্যে অনেক ছাত্র সমাগত হয়। প্রত্যেকের রুচি, বুদ্ধি, প্রবণতা আলাদা। বিদ্যালয়-গতিকে সহজ করিবার জন্য ছাত্র-ছাত্র সম্পর্ক সহজ করিতে হইবে। এইজন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুশীলন অত্যন্ত কার্যকর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যেমন ছাত্ররা নিজেদের কাজকর্ম নিজেরাই করে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজেরাই পরিচালনা করিয়া থাকে।

(২) **ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক**—শিক্ষকও ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়। একদল গুরু, অপর দল শিষ্য। একপক্ষ দাতা, অন্যদল গ্রহীতা। ফলে একপক্ষ পান শ্রদ্ধা, অন্যদল

অনুকম্পা। ইহা আদর্শ সমাজের অনুকূল নয়। বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষক সমান মূল্যবান। প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে।

শিক্ষক বলিয়াই তাঁহারা ছাত্রদের অনুকম্পা প্রদর্শন করিবেন না। ছাত্রদের ব্যক্তিত্বতে যথোচিত মর্যাদা দিবেন, শ্রদ্ধা করিবেন। অযথা তাহার কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ছাত্ররাও শিক্ষককে শ্রদ্ধা করিবে, মর্যাদা দিবে। পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে বিদ্যালয়ের কাজ সুচারুভাবে চলিবে।

(৩) **শিক্ষক-শিক্ষক সম্পর্ক**—শিক্ষক হইলেন ছাত্রদের আদর্শ, কাজেই তাঁহাদের আচার ব্যবহার আদর্শ হইবে। তাঁহাদের পারস্পরিক সম্পর্কও সহযোগিতা-পূর্ণ ও প্রীতিময় হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে ভাবের বিরোধ বিদ্যালয় সমাজে অনর্থ আনিতে পারে।

আসল কথা বিদ্যালয় সমাজকে যতদূর সম্ভব সহজ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কৃত্রিমতার অভিযোগ ইহার সঙ্কীর্ণ পরিধির জন্য নয়, বাস্তবতার সম্পর্কশূন্য কৃত্রিম বিধি ব্যবস্থার জন্য।

বিদ্যালয় সমাজকে বাস্তব ও স্বাভাবিক করিবার জন্য অনেকে বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত সে সবেরও প্রকৃষ্ট শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। সহশিক্ষাবিহীন বিদ্যালয়ে আদর্শ ব্যবহার শিক্ষা সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। সমাজে যেহেতু স্ত্রী-পুরুষ একত্রে বাস করে বিদ্যালয়ের পাঠেও স্ত্রী-পুরুষের একত্র অবস্থান বিধেয়। এই নীতি কিন্তু সর্বজন গ্রাহ্য নয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সহশিক্ষা চলিলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে সহ শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমনকি বিদেশেও অধুনাতম কালে সহশিক্ষার বিরুদ্ধে মত সোচ্চার হইয়া উঠিতেছে। সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অতি প্রগতিবাদী না হওয়াই সঙ্গত।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষক

শিক্ষাদান কার্যে শিশুর পরেই শিক্ষকের স্থান। এই পর্যন্ত কেবল শিশু সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছে। এইক্ষণে সুশিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা ও গুণাবলী আলোচনা করা যাইতেছে।

শিশু এই পৃথিবীতে নূতন আগন্তুক। সুতরাং সে তাহার পরিবেষ্টনীর জ্ঞান লাভের জন্য ব্যগ্র। অপর দিকে জ্ঞান অনন্ত. এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানের ভাণ্ডার। কিন্তু শিশুর চারিদিকে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সজ্জিত থাকিলেও তাহার দ্বার যেন অর্গলবদ্ধ। অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে এই জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া জ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারে না ও তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে না। কারণ অন্য পশু-শাবকের ন্যায় মানব-শিশু জন্মের পরই আপনার পায়ে দাঁড়াইতে পারে

না এবং আত্ম-চেষ্টায় জীবনধারণ করিতে পারে না। অপর দিকে **অন্য পশু-শাবক হইতে তাহার অধিকতর বিকাশ বা উন্নতি সম্ভবপর।** সুতরাং শৈশবে তাহাকে যত্নের সহিত লালন-পালনের জন্য ও তাহার সর্বতোমুখী বিকাশ-সাধনের জন্য সুদক্ষ পরিচালকের প্রয়োজন। এই গুরুতর কাজের দায়িত্ব স্বভাবতঃই তাহার পিতামাতার উপরই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তাই মনীষী রুশো বলিয়াছেন, **পিতাকেই শিক্ষক হইতে হইবে।** অনেক সময় পিতামাতার প্রয়োজনীয় অবসর বা যোগ্যতা থাকে না বলিয়া **শিক্ষকের উপরেই এই গুরুতর দায়িত্বভার অর্পিত হয়।** কিন্তু বিশেষ কোন গুণের অধিকারী না হইয়া এবং বিশেষভাবে প্রস্তুত না হইয়া সকলেই কি শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত? শিক্ষার অর্থ ও লক্ষ্য এবং শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যে আলোচনা হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে **শিক্ষাদান অত্যন্ত জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য।** ইহা একটা অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ (highly technical) কার্য। ঠিক ভাবে শিক্ষাদানের উপর শিশুর বিকাশ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বস্তুতঃ **শিক্ষকই শিশুর ভবিষ্যৎ প্রস্তুত করিতেও পারে, ধ্বংস করিতেও পারে।** সুতরাং নিপুণতার সহিত এরূপ জটিল, গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলপূর্ণ কার্য সম্পাদনের জন্য খুব সুদক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন। তাই সুশিক্ষক হওয়ার জন্য কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাই এস্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

সুশিক্ষকের গুণাবলী—স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "তিনিই হইতেছেন সুশিক্ষক যিনি ছাত্রদের স্তরে নামিয়া আসিতে পারেন এবং তাঁহার নিজের আত্মার বাণী ছাত্রদের মর্মস্থলে পৌঁছাইয়া দিতে পারেন এবং ছাত্রদের অন্তরকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারেন।"

Mr. Percival Wren অতি সুন্দর ভাষায় আদর্শ শিক্ষকের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, **শিক্ষক কেবল খবরের উৎস বা ভাণ্ডার নহেন, কিংবা শিশুকে প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার খবর সরবরাহকারী নহেন; শিক্ষক শিশুর বন্ধু, পরিচালক ও বিজ্ঞ উপদেষ্টা, তিনি তাহার সুদক্ষ শরীর গঠনকারী, মনের বিকাশ সাধনকারী ও চরিত্র গঠনকারী।**

সুশিক্ষকের **গুণাবলীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত** করা যায়। যেমন—**স্বাভাবিক গুণাবলী ও অর্জিত গুণাবলী।**

স্বাভাবিক গুণাবলী—যে কেহ সুশিক্ষক হইতে ইচ্ছা করেন **তাঁহার শরীর সুস্থ, সবল ও কষ্টসহিষ্ণু** হইতে হইবে এবং তাঁহাকে উদ্যমশীল ও অধ্যবসায়ী হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি উদ্যম সহকারে কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারিবেন না। শিক্ষক অলস বা দুর্বল হইলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ জীবন্ত (lively) ও ফলপ্রসূ (effective) হয় না। **তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রখর স্মৃতিশক্তি, প্রবল কল্পনাশক্তি, উচ্চ বিচারশক্তি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকিতে** হইবে। ছাত্রদের হইতে তিনি অধিকতর বুদ্ধিমান না হইলে বা তিনি কথায় কথায় ভুল করিলে তাহারা

তাঁহাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিবে না। যে-কোন জটিল প্রশ্নের নিজে বিচার করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্ত করিতে না পারিলে তিনি ছাত্রদের পরিচালিত করিতে পারিবেন না।

তাঁহার অফুরন্ত ধৈর্য থাকিতে হইবে এবং তাঁহার মেজাজ শান্ত হইতে হইবে। নতুবা তিনি শিশুগণের স্বাভাবিক চঞ্চলতা ও অক্ষমতা উপেক্ষা করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহাদের বিকাশসাধনে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

সরল, অমায়িক, প্রফুল্লচিত্ত ও সহানুভূতিসম্পন্ন না হইলে তিনি শিশুর হৃদয় জয় করিতে পারিবেন না। তাঁহার শিশুর অন্তঃকরণ থাকিতে হইবে এবং শিশুকে ভালবাসিতে হইবে। নিজ বাল্যজীবনের কথা স্মরণ করিয়া তাহার সাহায্যেই তাঁহাকে শিশুর মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে এবং আন্তরিক সহানুভূতির সহিত তাহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। তাঁহার বাল্যের চঞ্চলতার কথা ভাবিয়া দেখিলে তিনি শিশুর চঞ্চলতা স্বাভাবিক বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।

তাঁহার সমস্ত মুদ্রাদোষ পরিহার করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, শিশু খুব অনুকরণপ্রিয় ও কঠোর সমালোচক। প্রত্যেক কথা বলিতে তিনি যদি কোন শব্দ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করেন বা কোন হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী করেন, তাহা হইলে শিশুগণ তাহার অনুকরণ কবিবে ও তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে উৎসাহিত হইবে।

তাঁহার ভাল বর্ণনা দেওয়ার শক্তি বা বাগ্মিতা থাকা প্রয়োজন। তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ এবং স্বর সুস্পষ্ট, মিষ্ট ও প্রয়োজনমত উচ্চ হইতে হইবে।

তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কিছু মৌলিকতা থাকিতে হইবে। তাঁহাকে শ্রেণীতে বসিয়াই অনেক কঠিন সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এবং অবস্থোপযোগী কর্তব্য নির্ধারণ করিতে হইবে।

তাঁহার আত্মবিশ্বাস না থাকিলে তিনি তাঁহার শক্তি ও জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং ছাত্রেরা তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে চাহিবে না।

শিক্ষক মাত্রেরই কিছু রসজ্ঞান (Humour) **থাকা প্রয়োজন।** তাহা না থাকিলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ সরস ও চিত্তাকর্ষক হইবে না।

শিক্ষক **উচ্চ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ়চিত্ত** না হইলে চঞ্চলমতি শিশুগণকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে রাখিতে পারিবেন না। তিনি আন্তরিক সহানুভূতির সহিত ছাত্রদের সমস্ত অভাব-অভিযোগ শ্রবণ করিবেন, কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত করিয়া কোন আদেশ দিলে দৃঢ়তার সহিত ছাত্রগণকে তদনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য করিবেন।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার **কর্মচতুরতা** (Tact) **না থাকিলে তিনি নির্বিবাদে ছাত্রদের চালাইতে পারিবেন না** বা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে পারিবেন না। সমস্ত অবস্থা ভালরূপে বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ফলাফল চিন্তা করিয়া তৎপরতা ও সতর্কতার সহিত অবস্থার উপযোগী উপায় নির্ধারণ করা এবং দৃঢ়তার সহিত তদনুযায়ী কাজ করাকেই কর্মকৌশল বা কর্ম-চতুরতা বলে।

বস্তুতঃ, যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাই কর্ম-চাতুর্য্যতা। কিন্তু সংঘর্ষের ভয়ে কর্তব্য অবহেলা করাকে কোন মতে কর্ম-চাতুর্য্যতা বলা যায় না।

সর্বোপরি শিক্ষককে চরিত্রবান্ হইতে হইবে। সত্যবাদী, অকপট-চিত্ত, ন্যায়পরায়ণ, কর্তব্যপরায়ণ ও সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য না হইলে শিক্ষক ছাত্রের শ্রদ্ধালাভ করিতে পারিবেন না। মুখে যাহা উপদেশ দেন নিজে কার্যতঃ তাহার অনুসরণ না করিলে ছাত্রের নিকট তাঁহার উপদেশের কোন মূল্য থাকিবে না। তাঁহার নিকট সর্বদা সুবিচার পাইবে বলিয়া বিশ্বাস না থাকিলে অন্তরের সহিত তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে না।

অর্জিত গুণাবলী

(১) **উচ্চশিক্ষা**—শিক্ষকমাত্রেরই যতদূর সম্ভব উচ্চশিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন। কারণ অনেক সময় একটি ছোট শিশুকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্যও সেই বিষয়ের অতি উচ্চ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। কেবল পাঠ্যপুস্তকের পুনরাবৃত্তি করিলে পাঠ চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হয় না। পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষকের যথেষ্ট অধিকার না থাকিলে তিনি তাহা ঠিকভাবে ছাত্রের সামনে উপস্থিত করিতে পারেন না। অপর দিকে যে বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে কেবল সেই বিষয়ের উচ্চজ্ঞানই সুশিক্ষা দানের জন্য যথেষ্ট নহে। কেননা, শিক্ষণীয় বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এক বিষয় ভালরূপে শিক্ষা দিতে হইলে তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং **সুশিক্ষক হইতে হইলে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা দেন, সে-সকল বিষয়ে তাঁহার উচ্চজ্ঞান এবং অন্যান্য স্কুলপাঠ্য বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান থাকা দরকার।**

(২) **কতিপয় বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান।** পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে শিক্ষার সহিত মনোবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সুতরাং সুশিক্ষা দানের জন্য **মনোবিজ্ঞানের** জ্ঞান একান্ত অপরিহার্য। **শিশু-মনোবিজ্ঞানের** সহিত সুপরিচিত না হইয়া শিশুকে ঠিকভাবে শিক্ষা দেওয়া কঠিন। ইহা ছাড়া শরীরিক শিক্ষাদানের জন্য **স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান** (Hygiene) ও **শরীর-তত্ত্বের** (Physiology) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নৈতিক শিক্ষাদানের জন্য **নীতি-বিজ্ঞানের** (Ethics) সহিত সুপরিচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সেইরূপ **সমাজ-বিজ্ঞান** ও **রাষ্ট্র-বিজ্ঞান** সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া কেহ নাগরিক-শিক্ষা দিতে পারে না। অবশ্য একই শিক্ষককে এই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে না। **তিনি যে বিষয় শিক্ষা দেন তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের বা বিষয়গুলির প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকিলেই হইবে। তবে সকল শিক্ষককে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সহিত সুপরিচিত হইতে হইবে।** মুদালীয়র কমিশনের মতে "Any method good or bad, links up the teacher and his pupils into an organic relationship with constant mutual reaction, it reacts not only on the minds of the students, but on the entire personality, their standards of work and judgements, their intellectual and emotional

equipments their attitudes and values. Good methods which are psychological and socially sound may raise the quality of their life, bad methods may debase it."

(৩) **শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর কার্যত: জ্ঞানলাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জন** (Training of Teachers)।

কোন বিষয়ের উচ্চজ্ঞান থাকিলেই যে সে-বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় তাহা নহে। কি প্রণালীতে ও আকারে শিক্ষা দিলে তাহা ছাত্রের সম্পূর্ণ বোধগম্য হইবে এবং তাহার দ্বারা ছাত্রের মানসিক বিকাশের ও চরিত্র গঠনের সাহায্য হইবে তাহা অবগত না থাকিলে অতি উচ্চজ্ঞান লইয়াও কোন বিষয় ভাল শিক্ষা দেওয়া যায় না। সুতরাং সকল শিক্ষকের পক্ষে ট্রেনিং পাওয়া বাঞ্ছনীয়।

যদি কাহারও পক্ষে ট্রেনিং পাওয়ার সুযোগ না ঘটে, তবে তিনি অন্তত: ভাল পুস্তক পড়িয়া শিক্ষাবিজ্ঞান ও শিক্ষাদান-প্রণালীর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন এবং কার্যক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ করিয়া শিক্ষাদানের কৌশলগুলি আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। ইহাও না করিয়া শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী হওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। কেননা তাঁহার অজ্ঞতা ও ভুলত্রুটির জন্য শিশুর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইতে পারে এবং তাহার ভবিষ্যৎ নষ্ট হইতে পারে। হুমায়ুন কবীর বলিয়াছেন, "যে শিক্ষকের জ্ঞান অল্প তিনি কখনও শিক্ষার্থীর মনকে জাগ্রত করিতে পারিবেন না। অতএব শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজন নিজেকে যথার্থ শিক্ষক হিসাবে গড়িয়া তোলা।"

(৪) **অধ্যয়নের অভ্যাস**। পূর্বেই বলা হইয়াছে, কোন বিষয়ে ভালরূপে শিক্ষাদানের জন্য সেই বিষয়ের জ্ঞান এবং তাহার সহিত সম্পর্কযুক্ত অনেক অনেক বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান থাকিতে হইবে ; ইহার জন্য সুশিক্ষককে মনোবিজ্ঞান, স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রভৃতির সহিতও সুপরিচিত হইতে হইবে। ছাত্রজীবনে এতগুলি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করিয়া শিক্ষকতা ব্যবসায় অবলম্বন করার সৌভাগ্য খুব কম শিক্ষকের হয়। কিন্তু সুশিক্ষাদানের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিলে সকলেই ছাত্রজীবনের পরও নিজ চেষ্টায় সেই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত জ্ঞানপিপাসুর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা-জীবন শেষ হয় না, তখনই তাহার বৃহত্তর শিক্ষা-জীবন আরম্ভ হয়। বিশেষত: সুশিক্ষককে আজীবন ছাত্র থাকিতে হয়। কারণ জ্ঞান কখনই চরম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। দিনের পর দিন জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে। জ্ঞানের এই ক্রমবিস্তারের সহিত পা মিলাইয়া চলিতে না শিখিলে শিক্ষককে পিছাইয়া পড়িতে হইবে এবং সম্পূর্ণ বর্তমান আকারে জ্ঞানদানের যোগ্যতা হারাইতে হইবে।

(৫) **সুশাসনের ক্ষমতা। সুশাসক মাত্রেই সুশিক্ষক না হইলেও সকল সুশিক্ষককেই সুশাসক হইতে হয়।** ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে বিদ্যালয়ের সুশাসন রক্ষা না করিয়া সুশিক্ষা দান করা কিছুতেই সম্ভব নহে। শিক্ষক

যতই বিদ্বান হউন বা শিক্ষাদান-কার্যে তাঁহার যতই আগ্রহ থাকুক, শ্রেণীতে শাসন বজায় রাখিতে না পারিলে তাঁহার প্রদত্ত পাঠ ফলপ্রসূ হইতে পারে না, এমন কি তাঁহার পক্ষে পাঠ দেওয়াও সম্ভব হয় না। সুতরাং সুশিক্ষক মাত্রেরই সুশাসক হওয়া প্রয়োজন। সুশিক্ষকের ন্যায় সুশাসককেও অনেক স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইতে হয়।

(৬) **শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ**। সর্বোপরি শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না। শিক্ষকের আন্তরিকতার অভাব হইলে শিক্ষাদান-কার্য জীবনহীন যন্ত্রের কাজের আকার ধারণ করে এবং জীবনহীন শিক্ষাদান কখনই চিত্তাকর্ষক হইতে পারে না। ইহা ছাড়া ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষককে নিজে চিন্তা করিয়া অবস্থোপযোগী নূতন নূতন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষাদান-কার্যে আন্তরিক আগ্রহ না থাকিলে তিনি তাহা করিতে পারেন না। সুশিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ সর্বগুণসম্পন্ন শিক্ষক খুব বিরল। কিন্তু সকলেই আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যম সহকারে শিক্ষাদান-কার্যে ব্রতী হইতে পারেন। আগ্রহ সহকারে শিক্ষাদান-কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক স্বাভাবিক গুণের বিকাশ পাইবে এবং যে-সকল গুণলাভে তিনি বঞ্চিত তাহাদের অভাব অনেকটা পূরণ করাও সম্ভব হইবে। কেননা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার ক্ষমতা অনেকটা সীমাহীন। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব হইলে সমস্ত স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইয়াও কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না। সুতরাং সুশিক্ষক হইতে হইলে শিশুকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে হইবে; তাহার বিকাশ-সাধনের জন্য আন্তরিক আগ্রহ থাকিতে হইবে, শিক্ষাদান-কার্যে আনন্দ পাইতে হইবে এবং তাহাকে সম্মানের চোখে দেখিতে হইবে, ইহাকে কেবল জীবিকার্জনের একটা উপায় মনে না করিয়া দেশসেবা ও মানবজাতির সেবা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর বিকাশ সাধন করিয়া যে স্বর্গীয় আনন্দ বা সন্তোষ উপভোগ করা যায় তাহাকেই শিক্ষকের বড় পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আশাবাদী মনোভাব—শিক্ষক সর্বদা আশাবাদী মনোভাব সম্পন্ন হইবেন। এই আশাবাদী মনোভাবের দ্বারা ছাত্রগণও আকৃষ্ট হইবে এবং তাহাদের জীবনেও কোন বিষয়ে নিরুৎসাহ না হইবার মত গুণ বর্তাইবে।

সমদর্শিতা—শিক্ষক পক্ষপাতশূন্য এবং সমদর্শী হইবেন। তাঁহার সমস্ত কার্যের মধ্যে এই গুণটি প্রতিফলিত হইবে, তবেই তিনি ছাত্র এবং সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সক্ষম হইবেন।

আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-সমালোচনা—শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস থাকিবে। তাহা ছাড়া শিক্ষক আত্ম-সমালোচনা করিবেন।

সামাজিক-গুণ—শিক্ষকের সামাজিক-গুণ থাকিবে। তাঁহাকে সমাজের নেতা হইতে হইবে। তিনি সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিবেন এবং সমাজের সব ত্রুটি নিরসনের চেষ্টা করিবেন।

দেশপ্রেম—শিক্ষকের দেশপ্রেম থাকা অতীব বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষক জন্মগ্রহণ করে, না তৈয়ার হয়? (Are teachers born or made)?

সুশিক্ষক হওয়ার জন্য অনেকগুলি স্বাভাবিক গুণের প্রয়োজন হয় বলিয়া অনেকের মত যে কবির ন্যায় শিক্ষক জন্মগ্রহণ করেন, শিক্ষককে তৈয়ার করা যায় না (Teachers like poets are born, not made)। এই উক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে-সকল লোক সুশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক গুণাবলীর অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা শিক্ষক হইয়াই জন্মিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে খুব বেশী লোক শিক্ষকের সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করে না। অল্প কয়েকজন কবি জন্মিলেই পৃথিবীর অভাব মিটিতে পারে, কিন্তু মানবজাতির শিক্ষার জন্য অগণিত শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং যাঁহারা ঠিক শিক্ষক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই তাঁহাদিগকেও অনেক সময় শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করিতে হয়। অপর দিকে মানবের অপরিস্ফুট স্বাভাবিক শক্তি (Undeveloped Natural Potentialities) এবং অবস্থোপযোগী হওয়ার ক্ষমতা (Adaptability) অনেকটা সীমাহীন বলা যায়। এমন কোন মানুষ নাই যাহার মধ্যে কোন স্বাভাবিক গুণ বা প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলা যায়। সুতরাং ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যম থাকিলে অনেকেই প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক গুণাবলীর যথাসম্ভব বিকাশ-সাধন করিয়া বা অন্য গুণের দ্বারা তাহাদের অভাব যতটা সম্ভব পূরণ করিয়া নিজেদের শিক্ষকতা কাজের উপযোগী করিয়া লইতে পারে। ইহা ছাড়া কেবল স্বাভাবিক গুণাবলী থাকিলেই কেহ সুশিক্ষক হইতে পারে না। তাহার জন্য অনেক অর্জিত গুণেরও প্রয়োজন হয়। শিক্ষকেরা সমস্ত স্বাভাবিক গুণের অধিকারী হইলেও অনেক বিষয়ের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকিলে কেহই সুশিক্ষক হইতে পারে না। সুতরাং **শিক্ষক জন্মগ্রহণও করে এবং তৈয়ারও হয় বলিলেই** ঠিক কথা বলা যায়।

বিদ্যালয় পরিচালনা (School management)

সুপরিচালনার উপরেই বিদ্যালয়ে প্রদত্ত শিক্ষার সফলতা বা নিষ্ফলতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত স্থানে বহু ব্যয়ে প্রাসাদোপম গৃহ নির্মিত হইতে পারে, তাহাতে যথেষ্ট ছাত্র থাকিতে পারে, তাহার জন্য প্রচুর আসবাবপত্র ও সরঞ্জাম সংগৃহীত হইতে পারে, এমন কি অনেক বিদ্বান্ শিক্ষকও নিযুক্ত হইতে পারে। তথাপি সুপরিচালনার অভাবে সমস্ত ব্যর্থ হইতে পারে এবং বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদানকার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত অগণিত সাহসী সৈনিক লইয়া গঠিত বিপুল সৈন্যবাহিনীও সুপরিচালিত না হইলে কোন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না, অথবা যেমন অপর্যাপ্ত মালমশলা থাকিলেও নিপুণ শিল্পীর নির্মাণকৌশলের অভাবে সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হইতে পারে না, সেইরূপ সুপরিচলনার অভাব হইলে কোন বিদ্যালয় সুশিক্ষাদান করিতে পারে না, বা ছাত্রগণকে ঠিক ভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে না। কারণ সুপরিচালিত না হইলে

বিদ্যালয়ের সুশাসন বজায় থাকিবে না, সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম থাকিবে না। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না, প্রত্যেকে কর্তব্য করিবার সুযোগ পাইবে না। এরূপ অবস্থায় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা হওয়ার বা সুশিক্ষাদানের আশা করা বাতুলতা নহে কি?

বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য তাহার শিক্ষকগণই একা বা সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী। তাঁহারাই বিদ্যালয়কে ঠিকভাবে তৈয়ার করতেও পারেন, ধ্বংস করিতেও পারেন। বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের সমস্ত অভাব দূর করিয়া তথায় সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার সুযোগ দিতে পারেন মাত্র, শিক্ষকগণই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া সুশিক্ষা দিতে পারেন। কিন্তু খুব উপযুক্ত এবং আগ্রহশীল শিক্ষকগণ এক একজন এক একভাবে কাজ করিলে তাঁহাদের দ্বারা বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিয়া সুশিক্ষাদানরূপ কঠিন কার্যে সফলতা অর্জন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে একজন উপযুক্ত নেতার অধীনে কাজ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের প্রধান-শিক্ষকই এই নেতার স্থান গ্রহণ করিতে পারেন। সুতরাং শিক্ষকগণের নেতা হিসাবে বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য প্রধান-শিক্ষকের দায়িত্ব ও গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। তাঁহাকে বিদ্যালয়রূপ ঘটিকাযন্ত্রের প্রধান স্প্রীং বলা যায়। তিনি উপযুক্ত না হইলে বা ঠিকভাবে কাজ না করিলে বিদ্যালয়-ঘটিকা একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। অথবা তাঁহাকে বিদ্যালয়স্বরূপ জাহাজের কর্ণধার বলা যায়। তিনি ঠিকপথে না চালাইলে বা চালাইতে না পারিলে অন্য শিক্ষক-নাবিকগণের প্রাণান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও বিদ্যালয়-জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌছিবে না। বস্তুতঃ প্রধান-শিক্ষক উপযুক্ত, উদ্যমশীল, কর্তব্যপরায়ণ এবং উচ্চ আদর্শবাদী হইলে বিদ্যালয় সুপরিচালিত হয়, অন্যথা বিদ্যালয় সুপরিচালনার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

প্রধান শিক্ষক

প্রধান শিক্ষক হইতেছেন বিদ্যালয়ের কর্ণধার, যেমন, ক্যাপ্টেন জাহাজের কর্ণধার। ('The Headmaster holds the key position in a school as the captain of a ship holds a key position in a ship.'—Ryburn). প্রধান শিক্ষককে একজন প্রগতিশীল নেতা হিসাবে কাজ করিতে হইবে, তিনি অন্যান্য শিক্ষকবর্গ ও কর্মীদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের আদর্শ রূপায়ণ করিবেন। তিনিই বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম, নীতি ও আদর্শের জন্য দায়ী। বিদ্যালয়ের সমস্ত কর্ম-পরিকল্পনাই তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং তিনি ছাত্রদের প্রয়োজন ও বিকাশকে লক্ষ্যভূত রাখিয়া কাজ করিয়া থাকেন।

প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী—প্রধান শিক্ষকের বিভিন্ন গুণাবলী থাকা প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিচালনার মূল দায়িত্ব প্রধান শিক্ষকের। অতএব তাঁহাকে বিভিন্ন গুণ-সম্পন্ন না হইলে চলিবে না। প্রধান শিক্ষকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা আবশ্যক :

(১) বিদ্যালয় সমাজের নেতা। (২) সুপরিচালক ও সুসংগঠক। (৩) উচ্চ শিক্ষিত ও জিজ্ঞাসু। (৪) বন্ধুভাবাপন্ন ও সংবেদনশীল মনোভাবসম্পন্ন। (৫) গণ-

তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন। (৬) আদর্শ চরিত্র। (৭) নিরপেক্ষ মনোভাব। (৮) সুবক্তা। (৯) আত্মবিশ্বাস ও আত্মসংযম। (১০) কর্তব্যবোধ। (১১) সময়ানুবর্তিতা। (১২) প্রভাববিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব।

দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে **প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষক, সুশাসক, সুব্যবস্থাপক (Good Organiser) ও উপযুক্ত নেতা হইতে হইবে**। কেহ কেহ বলেন যে, সুশিক্ষক না হইয়াও একজন সুদক্ষ প্রধান-শিক্ষক হইতে পারেন। ইহা নিতান্ত ভুল ধারণা। কারণ নিজে সুশিক্ষক না হইয়া তিনি কিরূপে অন্য শিক্ষকগণের শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধান করিতে পারেন? নিজে সুশিক্ষক না হইয়া তিনি অন্য শিক্ষককে পরিচালিত করিতে গেলে একজন অন্ধ অন্য একজন অন্ধকে চালাইবার ফল ভোগ করিতে হইবে, অথবা তিনি তাঁহার অধীনস্থ সুশিক্ষকগণের কার্যে অনিষ্টজনক বাধার সৃষ্টি করিবেন। সুতরাং **প্রধান-শিক্ষককে সুশিক্ষকের অধিকাংশ স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী হইতে হইবে**। শুধু তাহা নহে, **শিক্ষাদান-কার্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকাও দরকার**। তাহা না হইলে তিনি তাঁহার অধীনস্থ শিক্ষকগণকে সহানুভূতির সহিত ও দক্ষতার সহিত চালাইতে পারেন না। বরং তাঁহার অনভিজ্ঞতার ফলে অধীনস্থ অভিজ্ঞ শিক্ষকের কার্যে বাধার সৃষ্টি করিতে পারেন। অপরদিকে শিক্ষাদান-কার্যে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাই প্রধান-শিক্ষক হইবার জন্য একমাত্র গুণ বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত নহে। কারণ শিক্ষাদান-কার্য ও বিদ্যালয় পরিচালনা-কার্য সম্পূর্ণ এক নহে। শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনার অভিজ্ঞতা না হইতেও পারে। তাহা ছাড়া কৃতিত্বের সহিত প্রধান-শিক্ষকের কর্তব্য সম্পাদন করিতে হইলে যে উদ্যম, উৎসাহ, নূতন কার্যারম্ভের ক্ষমতা (Power of Initiative), উদ্ভাবন-ক্ষমতা ও কর্মশক্তি থাকা প্রয়োজন, তাহা খুব বেশী বয়সে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজনীয় স্বাভাবিক ও অর্জিত গুণের অধিকারী শিক্ষককে ৫ বৎসরের মধ্যে সহকারী প্রধান শিক্ষকভাবে নিযুক্ত করা উচিত এবং ৪।৫ বৎসর সহকারী প্রধান শিক্ষকভাবে কাজ করার পরই প্রধান-শিক্ষকের পদে প্রমোশন দেওয়া উচিত।

কেবল সুশিক্ষক হইলেই যে সুদক্ষ হেডমাষ্টার হইবেন তাহা নহে। **তিনি সুশাসক না হইলে বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিবে না** এবং তাহার অভাবে সুশিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। ইহা ছাড়া তাঁহারা **সুব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা** (Power of Organisation), **কাজ আরম্ভ করিবার ক্ষমতা** (Power of Initiative) থাকিতে হইবে এবং তাঁহাকে কিছু **আদর্শবাদী** (Idealist) হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতে ও তাহার উন্নতি-সাধন করিতে পারিবেন না। সর্বোপরি **তাঁহাকে একজন ভাল নেতা হইতে হইবে**। কারণ সমস্ত শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তিনি বিদ্যালয় ঠিকভাবে চালাইতে পারেন না। বস্তুতঃ নিজে কাজ করা হইতেও অন্যকে দিয়া কাজ করাইবার বা **অন্যকে চালাইবার**

ক্ষমতাই প্রধান শিক্ষকের বড় গুণ। তবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, সেনাপতির সৈন্য-পরিচালনা এবং হেডমাষ্টারের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে পরিচালনা এক নয়। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রগণকে কেবল তাঁহার আদেশ পালন করাইতে পারিলেই চলিবে না। তাঁহাদিগের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করিতে না পারিলে তিনি বিদ্যালয় ঠিকভাবে চালাইতে বা তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবেন না; সুতরাং তাঁহার এরূপ জ্ঞান, কর্মশক্তি, উদ্যম, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রবল থাকিতে হইবে যাহাতে অধীনস্থ শিক্ষক ও ছাত্র তাঁহাকে কেবল উর্ধ্বতন কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরের সহিত অনুভব করে। তিনিও অন্য শিক্ষকগণকে কেবল অধীনস্থ কর্মচারীভাবে না দেখিয়া তাঁহাদিগকে সহযোগী মনে করিলে ও তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতা পাইবেন। ইহা ছাড়া সমস্ত কাজে নিজে অগ্রণী হইয়াই তিনি শিক্ষকগণকে উৎসাহের সহিত নিজ নিজ কর্তব্য-সাধনে নিযুক্ত করিতে পারেন। তিনি **নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই শিক্ষক ও ছাত্রগণকে নিয়মানুগ করিতে পারেন।** শিক্ষক ও ছাত্রের সকল ভাল কাজে **সহানুভূতি** দেখাইতে ও তাহাদের প্রতি **সস্নেহ সদয় ও অমায়িক ব্যবহার** করিয়াই তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারেন। তাঁহার **সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও পক্ষপাতশূন্যতায়** গভীর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেই শিক্ষক ও ছাত্রগণ তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নির্ভর-চিত্তে আগ্রহের সহিত তাঁহার নির্দেশমত নিজ নিজ কর্তব্য-সাধনে রত হইবে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে **শিক্ষক ও ছাত্রগণের ক্ষমতাশালী প্রভু না সাজিয়া তাহাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ও সুযোগ্য নেতার স্থান গ্রহণ করিলেই তিনি শিক্ষক ও ছাত্রগণকে ঠিকভাবে চালাইতে পারিবেন।** ইহা বলা বাহুল্য যে, **সহৃদয়তার সহিত তাহার চিত্তের দৃঢ়তা থাকাও একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজনমত শাসনের ক্ষমতা** না থাকিলে তাঁহার সহৃদয়তাকে অনেকে দুর্বলতা বলিয়াই মনে করিবে এবং তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইতস্ততঃ করিবে না।

কেহ কেহ হেডমাষ্টারের কর্মকুশলতাকেই (tact) সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দিয়া থাকেন। পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, যতদূর সম্ভব সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করাকেই কর্মকৌশল বলে এবং প্রত্যেক হেডমাষ্টারের তাহা কিছু পরিমাণে হইলেও থাকা প্রয়োজন। অধীনস্থ লোকের প্রতি সহৃদয় সহানুভূতিপূর্ণ ও পক্ষপাতশূন্য ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বড় কর্মকৌশল বলা যায়। কেননা তাহার দ্বারাই সংঘর্ষের মূলোৎপাটিত হয়। ইহা ছাড়া অবস্থোপযোগী অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া সংঘর্ষ এড়াইয়া কর্তব্য করা হেডমাষ্টার কেন প্রত্যেক দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত লোকের কর্তব্য। কিন্তু সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য কর্তব্য-অবহেলা করাকে কর্মকৌশল না বলিয়া কর্তব্যজ্ঞান-হীনতা বলাই ঠিক।

প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রধান শিক্ষকের গুণাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহাকে হইতে হইবে উত্তম শিক্ষক, দক্ষ পরিচালক, সুযোগ্য নেতা, সংবেদনশীল অথচ নিয়মানুগ পরিদর্শক এবং সমাজের সঙ্গে যোগরক্ষাকারী। তাঁহার কাজ হইল : (১) শিক্ষাদান (২) পরিদর্শন (৩) শিক্ষক ও ছাত্রের সঙ্গে কাজ (৪) বহির্বিষয়ক (৫) বিভিন্ন বিষয়ে তদারকি ও অন্যান্য দায়িত্ব।

"He has the duties that are related to the State Department of Education, the High School Examination Board, the School Secretary, the Local Community (including parents), the School Staff and finally the Children attending the school. Thus he has to deal with both the external and internal agencies controlling the connecting link between the two." [1]

(১) **শ্রেণী পাঠনা**—হেডমাষ্টার নিজে প্রত্যহ অন্তত: ২।৩ ঘণ্টা শ্রেণীতে পাঠ দিবেন। ইহা ছাড়া অন্যান্য শিক্ষকের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীতে মধ্যে মধ্যে পাঠ দিলে সকল শ্রেণীর শিক্ষাদান সম্বন্ধে তিনি সম্যক্ অবগত থাকিবেন। বস্তুত:, **শিক্ষাদান-কার্যে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া হেডমাষ্টারের পক্ষে মহা ভুল।** কারণ তাহা করিলে শিক্ষকগণের সুবিধা-অসুবিধা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না এবং তাহাদিগকে কার্যত: পথ প্রদর্শন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার পক্ষে খুব বেশী সময় শিক্ষাদান-কার্যে ব্যয় করাও ঠিক নয়। কারণ তাহা হইলে তিনি অন্য শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য তত্ত্বধান এবং বিদ্যালয় পরিচালনার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিবার সময় পাইবেন না।

(২) **শিক্ষকগণের কাজের তত্ত্বাবধান করাই হেডমাষ্টারের সর্বপ্রধান কর্তব্য** এবং দক্ষতার সহিত তাহা সম্পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শিক্ষকগণের কাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই ভাবেই তত্ত্বাবধান করিতে পারেন।

পরোক্ষ তত্ত্বাবধান :—(ক) শিক্ষকগণের পাঠ্যতালিকা, পাঠটীকা, নোট, পাঠোন্নতির রেজিষ্টার ইত্যাদি নিয়মমত পরীক্ষা করা ; (খ) হেডমাষ্টার নিজে প্রশ্ন করিয়া বা অন্য কোন শিক্ষকের দ্বারা প্রশ্ন করাইয়া শ্রেণী পরীক্ষা করা, এবং খুব ভাল, মধ্যম ও খুব খারাপ ছেলের কাগজগুলি নিজে পড়িয়া দেখা বা সহকারী প্রধান-শিক্ষক বা বিষয়-শিক্ষককে পড়িয়া মন্তব্য করিতে দেওয়া ; (গ) শ্রেণী পরিদর্শন ও ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া শিক্ষকের শিক্ষাদানের ফল নিরূপণ।

প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান :—(ক) হেডমাষ্টার সময় সময় বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইবেন এবং কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ কাজ চলিতেছে লক্ষ্য করিবেন। কোন শ্রেণীতে বিশৃঙ্খলা হইয়াছে বা শিক্ষক কর্তব্য অবহেলা করিতেছে দেখিলে শিক্ষকের

1 Dr. S. N. Mukherjee—Secondary School Administration.

সহিত কোন কথা বলিবার ছলনায় শ্রেণীতে ঢুকিয়া পড়িতে পারেন এবং ২।৩ মিনিট দেখিয়া চলিয়া আসিতে পারেন।

(খ) প্রয়োজন মনে হইলে কোন শ্রেণীতে সমস্ত ঘণ্টা থাকিয়া শিক্ষকের পাঠদান-কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেও পারেন। কেবল অনভিজ্ঞ শিক্ষকের কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য, বিশেষতঃ পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ফলে তাঁহার কাজ সন্তোষজনক নয় বলিয়া মনে হইলে, এই উপায় অবলম্বনীয়। তবে শ্রেণীতে শিক্ষকের সহিত সর্বদা সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে এবং তাঁহাকে উৎসাহ দেওয়া বা প্রশংসা করা ছাড়া তাঁহার কাজের কিছুমাত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা করা উচিত নয়।

পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের পর শিক্ষকের কাজ সম্বন্ধে হেডমাষ্টারের মন্তব্য ও শিক্ষকের সংশোধনের জন্য তাঁহার প্রস্তাব একটা খাতায় লিখিয়া রাখা দরকার এবং তাঁহাকে ডাকিয়া গোপনে তাহা দেখান উচিত। একজন শিক্ষকের কার্য সম্বন্ধে মন্তব্য অন্য শিক্ষকদের জানিতে দেওয়া উচিত নয়। যদি দেখা যায় যে, অনেক শিক্ষকই একই রকম ভুল করিতেছেন, তখন কোন শিক্ষকের নামোল্লেখ না করিয়া সমস্ত শিক্ষকের সংশোধনের জন্য লিখিত উপদেশ দিতে পারেন।

শিক্ষকগণের কার্য তত্ত্বাবধান ছাড়াও হেডমাষ্টারকে স্কুল পরিচালনার জন্য অনেক কাজ করিতে হয়। যথা—**শ্রেণী গঠন, সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করা,** বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজনমত আসবাব-পত্র স্থাপন, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য **পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন, বিদ্যালয় শাসন ও পরিচালনার জন্য নিয়ম প্রণয়ন,** বৎসরে বিভিন্ন অংশের জন্য **পাঠ-তালিকা অনুমোদন,** বিদ্যালয়ে **সুশাসন রক্ষা,** বিদ্যালয়-গৃহে ও তাহার চারিদিকে স্বাস্থ্যের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, স্কুলের **আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখা,** আফিসের জন্য খাতাপত্র প্রস্তুত রাখা, গ্রন্থাগারের পুস্তক ব্যবহারের ব্যবস্থা করা, ছাত্রদের খেলার বন্দোবস্ত করা, বিদ্যালয়-গৃহের কোন পরিবর্তন বা বিদ্যালয়ের কোন প্রকার উন্নতি সাধনের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাব করা, ছাত্রগণের কাজ এবং ব্যবহার সম্বন্ধে অভিভাবকগণকে অবগত রাখা, শিক্ষাবিভাগের সহিত পত্র-ব্যবহার (correspondence) করা ইত্যাদি। ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, হেডমাষ্টার নিজে একা এতগুলি কাজ করিতে পারেন না। ইহার জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে সহকারী প্রধান-শিক্ষকের সাহায্য লইতে হইবে এবং তাঁহার উপর কোন কোন বিষয়ের ভার দিতে হইবে। তাহা ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেক কাজ বণ্টন করিয়া দিতে পারেন। কোন্ শিক্ষক কোন্ কাজের উপযুক্ত তাহা বাছিয়া লইয়া **উপযুক্ততা অনুযায়ী তাহাদের মধ্যে স্কুল পরিচালনার কাজ বণ্টন** করাও প্রধান-শিক্ষকের একটা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য। কিন্তু সকল বিষয়ে **শেষ মীমাংসার ক্ষমতা তাহার নিজ হস্তে রাখিতে হইবে।**

সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক

বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রধান-শিক্ষকের পরেই সহকারী প্রধান-শিক্ষকের স্থান। অন্যান্য শিক্ষক হইতে তাঁহার ক্ষমতা যেমন বেশী, দায়িত্বও তেমনি বেশি। কারণ

তাঁহাকে হেড্মাষ্টারের ক্ষমতা ও দায়িত্ব উভয়েরই ভাগ লইতে হয়। যে সমস্ত কার্য-নির্বাহের ভার তাঁহার উপর দেওয়া হয় সেই সমস্ত কাজ তাঁহাকে এরূপভাবে করিতে হইবে যেন তিনিই প্রধান-শিক্ষক। যে-সমস্ত কাজের ভার অন্য শিক্ষকের উপর দেওয়া হয় সেগুলি সুসম্পন্ন হইতেছে কিনা তাহার দিকেও তাঁহার দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন বিষয়ের বিশৃঙ্খলা হইতে দেখিলে সম্ভব হইলে তিনি নিজে তাহার প্রতিকার করিবেন অথবা হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। বিশেষতঃ বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজ নিয়মমত সম্পন্ন হওয়া এবং বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখার প্রতি তাঁহাকে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে **তিনি প্রধান-শিক্ষকের দক্ষিণ হস্ত বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিবেন।** তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, **বিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য হেডমাষ্টারের পরে তিনিই সর্বাপেক্ষা বেশী দায়ী।** অন্য দিকে সহকারী শিক্ষকদের সহিত তাঁহাকে খোলাখুলিভাবে মিশিতে হইবে, সহানুভূতির সহিত তাঁহাদের অভাব অসুবিধার খোঁজ লইতে হইবে এবং তাহাদের প্রতি হেডমাষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এক কথায় তাঁহাকে শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবেও কাজ করিতে হইবে।

সহকারী শিক্ষক। ইহা বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও সুশিক্ষক এবং সুশাসক হইতে হইবে। কেননা তাহাদিগকে নিজ নিজ শ্রেণীতে সুশিক্ষাদান করিতে হইবে এবং সুশাসন বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু কেবল দক্ষতার সহিত তাহা সম্পাদন করিলেই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ হইবে না। বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবেও তাঁহাদিগকে কতকগুলি কাজ করিতে হইবে। এই হিসাবে সহকারী শিক্ষকগণের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাঁহাদের উপর যে যে কাজের ভার দেওয়া হয়, তাহা আগ্রহ ও বিশ্বস্ততার সহিত সম্পন্ন করা। **শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসনের অভাব হইলে ছাত্রদের মধ্যে সুশাসন বজায় রাখা বা সুশৃঙ্খলার সহিত বিদ্যালয় পরিচালনা কিছুতেই সম্ভব নয়।** ইহাও বলা প্রয়োজন যে, কেবল যন্ত্রের ন্যায় নির্দিষ্ট কাজ করিয়া গেলেই সহকারী শিক্ষকের কর্তব্য করা হয় না। কারণ সৈনিকের কাজ ও কেরাণীর কাজ ও শিক্ষকের কাজ এক রকম নয়। সর্বনিম্নতম শিক্ষককেও অনেক সময় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অবস্থোপযোগী ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং **আন্তরিক আগ্রহের সহিত কর্তব্য না করিলে কোন শিক্ষকের কাজ সন্তোষজনক বা ফলদায়ক হইতে পারে না।** অপর দিকে অনেক সহকারী শিক্ষক মনে করেন যে, সময়-পত্রিকায় তাঁহাকে যে কাজ দেওয়া হইয়াছে ঠিক সময়ে তাঁহার শক্তিমত সেই কাজ সম্পাদন করিলেই হইল, ইহার বেশী তাঁহার কোন কর্তব্য বা দায়িত্ব নাই; ইহা নিতান্ত ভুল। **তাঁহার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রত্যেক সহকারী শিক্ষককেও বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বের অংশ লইতে হইবে** এবং বিদ্যালয়ের ভালমন্দের জন্য নিজেকেও দায়ী মনে করিতে হইবে। কারণ সহকারী শিক্ষক কেবল একজন দায়িত্বহীন অধস্তন কর্মচারী নন, তিনি **বিদ্যালয় পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত**

শিক্ষক-সংঘের এক জন দায়িত্বশীল সদস্য। প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক উভয়েই সর্বদা এই কথা স্মরণ রাখিয়া কাজ করিলে তাঁহাদের মধ্যে প্রভু-দাস সম্বন্ধ স্থাপিত না হইয়া **নেতা ও সহকর্মীর** সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে; প্রধান শিক্ষক ইহা বিস্মৃত হইলে তিনি সহকারী শিক্ষকগণের আন্তরিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হইবেন। **সহকারী শিক্ষকগণ ইহা বিস্মৃত হইলে তাঁহারা নিজেদের হীন অধস্তন কর্মচারীতে পরিণত করিবেন,** প্রধান-শিক্ষকের সহকর্মী বা শিক্ষক-সংঘের দায়িত্বশীল সদস্য-পদলাভের অযোগ্য হইবেন।

শিক্ষকগণের সভা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত কোন বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রধান-শিক্ষক আদেশ দিবেন এবং সহকারী শিক্ষকগণ কেবল আদেশ পালন করিবেন, এই ব্যবস্থা হইলে দুই পক্ষের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতা হইতে পারে না। প্রকৃত সহযোগিতার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রয়োজন। সহকারী শিক্ষকগণকেও বিদ্যালয়ের কাজ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা শিক্ষকগণের সভা গঠন করা দরকার এবং মাসে অন্ততঃ একবার এই সভার অধিবেশন হওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যে কোন সময়ে ইহার বিশেষ অধিবেশন হইতে পারে। প্রধান-শিক্ষকই তাঁহার পদের দাবীতে (Ex-officio) ইহার সভাপতি হইবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহকারী প্রধান-শিক্ষকই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রধান-শিক্ষক শিক্ষকদের মধ্য হইতে একজনকে ইহার কর্মসচিব মনোনীত করিবেন।

শিক্ষকগণের এই সভায় তাঁহারা বিদ্যালয়-সম্পর্কিত যে-কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে পারেন, সকল বিষয়ে তাঁহাদের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে পারেন, এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি-সাধনের জন্য যে-কোন প্রস্তাব করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহাদের সাধারণ (Common) অভাব-অভিযোগ থাকিলে সে সম্বন্ধেও এই সভায় আলোচনা হইতে পারে। ব্যক্তিগত অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হওয়া উচিত নয়, ব্যক্তিগতভাবেই জানাইতে হয় এবং প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হয়। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা একটি **পরামর্শ সভা** (Advisory Committee) এবং বিদ্যালয় পরিচালনা সম্বন্ধে হেডমাষ্টারকে পরামর্শ দেওয়াই ইহার প্রধান বা একমাত্র কাজ। সুতরাং বিদ্যালয় সুপরিচালনার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই ইহাতে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে। প্রধান-শিক্ষক সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে ইহাতে **ভোট দিয়া কোন প্রস্তাব গৃহীত বা অগ্রাহ্য হইবে না।** শিক্ষকগণের স্বাধীন মতামত শুনিয়া হেডমাষ্টার তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করিবেন। সহকারী শিক্ষকগণের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত এবং বিদ্যালয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হইলে, তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, না হইলে তিনি তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারেন। তবে উভয় পক্ষের মতামত এই সভার বিবরণীতে ঠিকভাবে লিখিতে হইবে, যাহাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বা ইন্স্পেক্টার ইহা পাঠ করিয়া শিক্ষকদের প্রস্তাবের মূল্য

বা শিক্ষাদান-কার্যের ভাল তত্ত্বাবধানের সুব্যবস্থা করা কঠিন। কারণ প্রধান-শিক্ষক বা সহকারী প্রধান-শিক্ষকের পক্ষে সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। যে সকল বিষয়ে তাঁহাদের বিশেষ অধিকার নাই, তাঁহারা সেই সকল শিক্ষাদান-কার্য তত্ত্বাবধানের ভার বিষয়-শিক্ষকের উপর দিতে পারেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, **একজন শিক্ষককে কেবল এক বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত** এবং তাঁহাকে যত বেশী শ্রেণীতে সম্ভব সেই বিষয় শিক্ষাদানের ভার দেওয়া উচিত। অবশ্য সেই বিষয়ের অতিরিক্ত অন্য ২।১ বিষয় শিক্ষাদানের কার্যও তাঁহাকে দিতে হয় এবং তাঁহার কাজের একঘেয়েমী নষ্ট করার জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়।

বিষয়-শিক্ষকের কর্তব্য। বিষয়-শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয় ও তাহার শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব উচ্চজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা। দ্বিতীয় কর্তব্য সমস্ত বিদ্যালয়ে তাঁহার বিশেষ-বিষয় শিক্ষাদান-কার্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা ও তাহার উন্নতি-সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। এই দ্বিতীয় কর্তব্য সাধনের জন্য তিনি হেডমাষ্টারকে বলিয়া সেই বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তক ও শিক্ষা-সরঞ্জাম সংগ্রহ করিবেন; বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্য বা তত্ত্বাবধান করিয়া তাহার উন্নতিসাধনের জন্য উপদেশ দিতে পারেন; মাঝে মাঝে তাঁহার বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণের সভা আহ্বান করিয়া বিভিন্ন শ্রেণীতে সেই বিষয় শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহা ছাড়া বিষয়-শিক্ষকগণ সময় সময় নিজ নিজ বিষয়ে আদর্শ পাঠ দিতে পারেন এবং তাহার দ্বারা সেই সেই বিষয় শিক্ষাদানকারী শিক্ষকগণকে কার্যতঃ পথ প্রদর্শন করিতে পারেন। দক্ষতার সহিত এই সকল কর্তব্য করার জন্য যে শিক্ষক যে বিষয়ে বেশী শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ তাঁহাকেই সেই বিষয়ের বিষয়-শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত।

বস্তুতঃ, এই দুইটি প্রথার কোন একটি প্রথাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাহার জন্য দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাই বিধেয়।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণী-শিক্ষক পাঠদান করিতে পারেন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণীর পরে যেখানে বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে, সেইখান হইতে বিষয় শিক্ষার প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

চতুর্থ অধ্যায়

সময়-পত্রিকা

সময়-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব। প্রাচীন কালে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত বলিয়া সময়-পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। বর্তমান সময়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শ্রেণী-পাঠনার ব্যবস্থা হওয়ায় অনেক শ্রেণীতে শত শত ছাত্রকে একই সময়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং এখন সময়-পত্রিকা ব্যতীত সুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নয়। সময়-পত্রিকা বিদ্যালয়ের সমস্ত কাজের প্রতিচ্ছবি, শিক্ষকের দৈনিক কাজের পরিকল্পনা (plan) এবং ছাত্রের বিভিন্ন বিষয় পাঠের পূর্বকল্পিত কর্মসূচী। সেনাপতির পক্ষে যেমন যুদ্ধের পরিকল্পনা, নাবিকের পক্ষে যেমন সমুদ্র-পথের মানচিত্র, শিক্ষকের পক্ষে তেমন সময়-পত্রিকা। সময়-পত্রিকার সাহায্যে এক দিকে শিক্ষকদিগের মধ্যে কার্যবিভাগ হয়, অপর দিকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনমত সময় বণ্টন করা হয়। ইহা প্রত্যেক পাঠ্য বিষয়ের প্রতি শিক্ষকের আবশ্যকমত মনোযোগ দান সুনিশ্চিত করে; কখন কি কাজ করিতে হইবে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ইহা সময় ও ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার নিবারণ করে। সমস্ত স্কুল-সময়ের জন্য ছাত্রগণের কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া এবং তাহাদিগকে সমস্ত সময় কার্যরত রাখিয়া ইহা বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে; সর্বোপরি নিয়মানুবর্তিতা এবং সঙ্কল্প-সাধনে অবিচলিত থাকিবার অভ্যাস গঠন করিয়া ইহা ছাত্রের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করে। বস্তুতঃ, সময়-পত্রিকা ব্যতীত সুশৃঙ্খলার সহিত কোন বিদ্যালয় পরিচালনা সম্ভব নয়।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সময়-তালিকার নিম্নলিখিত উপযোগিতা উল্লেখ করিতে পারি: (১) সময়-তালিকা থাকার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শেষ করা সম্ভব হয়। (২) সময়-তালিকা নির্দিষ্ট থাকিবার ফলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠের পরিকল্পনা করা সহজ হয়। সময় ও শক্তির অপচয় হয় না। (৩) শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হয়। কোন্ দিন্ কখন কোন্ বিষয় আলোচিত হইবে তাহারা জানিতে পারে। গৃহকাজ ও পাঠ-প্রস্তুতিতেও তাহাদের সুবিধা হয়। (৪) বিদ্যালয় পরিচালনার কাজও সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইতে পারে। সময়-তালিকা নির্দিষ্ট থাকিলে শিক্ষকদের কর্মবণ্টন, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিষয়-পাঠের সমন্বয় প্রভৃতি ভালভাবে হইতে পারে। (৫) পাঠদানের মান (standard) উন্নয়ন সম্ভব হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহযোগিতা সম্ভব হয়। (৬) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা সহজ হয়। (৭) বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা করা ও পাঠদান করা যায়।

সময়-তালিকা রচনার মৌলিক নীতি

(১) **সমস্ত পাঠ্য-বিষয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা**—সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে প্রথমে দেখিতে হইবে যেন নির্দিষ্ট স্তরে শিক্ষণীয় প্রত্যেক বিষয়

শিক্ষাদানের প্রয়োজনমত ব্যবস্থা হয়। সুতরাং পাঠ্য-বিষয়ের তালিকা সামনে রাখিয়াই সময়-পত্রিকা প্রস্তুতির কার্য আরম্ভ করিতে হয়।

(২) **সমস্ত শ্রেণীগুলিকে কার্যে নিযুক্ত রাখার ব্যবস্থা**—প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কার্য নির্দিষ্ট করিতে হয়, যেন ছাত্রগণ সর্বদা কোন না কোন কার্যে নিযুক্ত থাকে। একটা শ্রেণীতে কাজ দিতে ভুলিয়া গেলে তাহারা সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা নষ্ট করিবে।

(৩) **শিক্ষকগণের মধ্যে কর্ম বিতরণ**—শিক্ষকগণের মধ্যে কে কতদূর শিক্ষালাভ করিয়াছেন, কাহার কি পরিমাণ অভিজ্ঞতা আছে, কাহার কোন্ বিষয়ে বিশেষ অধিকার বা অনুরাগ আছে ও কাহার কিরূপ ব্যক্তিত্ব, কর্মশক্তি ও শাসনক্ষমতা আছে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের কার্য বণ্টন করিতে হয়। দক্ষতার সহিত শিক্ষকগণের মধ্যে এই কর্মবিতরণের উপর বিদ্যালয়ের সুশিক্ষাদানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৪) **বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সময় বণ্টন**—এক সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রেণীতে কত ঘণ্টা পাঠ দেওয়া যাইতে পারে হিসাব করিয়া বিষয়ের গুরুত্ব, কাঠিন্য ও পরিমাণানুযায়ী তাহাদের মধ্যে সময় বণ্টন করিতে হয় বা বিভিন্ন বিষয়ে পাঠের সংখ্যা নির্দিষ্ট করিতে হয়। তাহার পর সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই দিবসে একই বিষয়ে একটার অধিক পাঠ দেওয়া যায় না। অপর দিকে একই বিষয়ে দুইটি পাঠের মধ্যে এত বেশী সময়ের ব্যবধান থাকা উচিত নয় যাহাতে ছাত্রগণ পূর্বপাঠের বিষয় সম্পূর্ণ ভুলিয়া যাইতে পারে।

কোন বিষয়ের ২।৩টা শাখা থাকিতে পারে। যথা—গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত অঙ্কেরই ৩টি শাখা। প্রত্যেক সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে (alternately) ইহার বিভিন্ন শাখা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাকে Spiral System বলে। অথবা প্রত্যেক শাখাকে বিভিন্ন অংশে (units) ভাগ করিয়া এক এক অংশের শিক্ষাদান শেষ হইলে অন্য শাখার এক অংশের শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। যথা—৩।৪টা পাঠে গণিতের ঐকিক নিয়ম শিক্ষা দেওয়ার পর বীজগণিতের Factorisation শিক্ষাদান-কার্য আরম্ভ করা যায়। এই শেষোক্ত ব্যবস্থাকে সময়-পত্রিকার Block System বলে এবং ইহাই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত। কেননা Spiral System-এ কোন শাখার এক অংশ শিক্ষাদান সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই অন্য শাখার পাঠ দিতে হইতে পারে; Block System-এ এই দোষের প্রতিকৃতি হয়।

(৫) **পাঠের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ**—ছাত্রের বয়স, পাঠ্য-বিষয়ের প্রকৃতি, দিবসের কোন্ ভাগে পাঠ দিতে হইবে ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পাঠের দৈর্ঘ্য নিধারণ করিতে হয়। পরীক্ষার ফলে স্থির হইয়াছে যে, বিভিন্ন বয়সের ছাত্রগণ নির্দিষ্ট সময়ের বেশী একটানা মনোযোগ রাখিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের পাঠের দৈর্ঘ্যও তাহার বেশী হওয়া উচিত নয়।

ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রত্যেক স্তরের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের বালক-বালিকা অধ্যয়ন করে। কিন্তু বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকার বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করা যায় না, সর্বাপেক্ষা অধিক-বয়স্ক ছাত্রের উপযোগী পাঠের দৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট করিতে হয়। তবে পাঠ দেওয়ার সময় শিক্ষকগণ ছাত্রের বয়সানুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠের দৈর্ঘ্যের তারতম্য করিতে পারেন। অবশিষ্ট সময় পাঠের সহিত সংশ্লিষ্ট ছবি-প্রদর্শন, কবিতা পাঠ, হাতের কাজ বা শ্রেণী-ড্রিল প্রভৃতি কাজে ব্যয় করিতে পারেন। উক্ত ভাবে কাজ করিলে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ের সময়-পত্রিকার পাঠের দৈর্ঘ্য নিম্নলিখিত পরিমাণ করা যাইতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—	২০।২৫ মিনিট
মধ্য বাঙ্গলা বিদ্যালয়—	৩০।৩৫ মিনিট
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়—	৪০।৪৫ মিনিট

তবে দিবসের প্রথম ভাগ হইতে শেষ পাঠের দৈর্ঘ্য অন্ততঃ ৫ মিনিট কম হওয়া উচিত। কারণ দিবসের শেষ ভাগে শিশুর মন অবসাদগ্রস্ত হয় বলিয়া সে পাঠ্য-বিষয়ে বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখিতে পারে না।

(৬) **পাঠের পর্যায়** (Succession of Lessons)—

(ক) দিবসের প্রথম ভাগে ছাত্রের মন খুব সতেজ থাকে। প্রথমে তাহার মন স্থির করিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, ২য় ঘণ্টায় সে খুব ভাল মানসিক কাজ করিতে পারে, ৩য় ঘণ্টার পর সে অবসাদগ্রস্ত হইতে আরম্ভ করে। সুতরাং অঙ্ক, বিদেশী ভাষা, প্রাচীন ভাষা প্রভৃতি যে রকম বিষয়-পাঠে অধিক মানসিক পরিশ্রম হয়, সে সকল বিষয়ে দিবসের প্রথম ভাগে বা মধ্যাহ্ন-অবসরের পরে পাঠ দেওয়া উচিত। এইগুলি দিবসের শেষ ভাগে শিক্ষা দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। মাতৃ ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, বয়নবিদ্যা, হস্তশিল্প প্রভৃতি কম অবসাদকর বিষয়গুলি দিবসের শেষ ভাগে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(খ) একাদিক্রমে অবসাদকর বিষয়ের পাঠ দেওয়া উচিত নয়। একটা কঠিন বিষয়ের পাঠ দেওয়ার পর একটা সহজ বিষয় শিক্ষা দেওয়া ভাল। যেমন—গণিত বা ইংরেজী পাঠের পর মাতৃভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির পাঠ দেওয়া যায়।

(গ) ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ, ইন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তির ব্যবহার হয়, এমন বিষয়ের পাঠ্য পর্যায়ক্রমে দেওয়া উচিত। যথা—পড়ার কাজের পর লেখার কাজ, চোখের কাজের পর শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাজ, স্মৃতিশক্তির কাজের পর কল্পনা-শক্তির কাজ ইত্যাদি পর্যায়-ক্রমে পাঠের ও লেখার বা হাতের কাজের বন্দোবস্ত করিতে পারিলেই খুব ভাল হয়।

(ঘ) বিদ্যালয় বসিবার পরই ড্রইং, হস্তলিপি বা অন্য হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়া ভাল নয়। তখন শিশুর শরীর চঞ্চল থাকে বলিয়া হাতের কাজ ভাল করিতে পারে না।

(ঙ) রবিবার বিশ্রাম করার পর সপ্তাহের প্রথম ভাগে শিশুর মন সতেজ থাকে। সপ্তাহের শেষের দিকে তাহার মন পুনঃ অবসাদগ্রস্ত হয়। সুতরাং সপ্তাহের প্রথম ভাগেই কঠিন বিষয়গুলি বেশী শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

(চ) উপর্যুপরি মৌখিক বর্ণনামূলক পাঠ দিতে হইলে শিক্ষক বেশী পরিশ্রান্ত হন। সুতরাং তাঁহাকে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে পাঠ দেওয়ার পূর্বে বা পরে গণিত, ব্যাকরণ, ভূগোল, পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ইত্যাদির পাঠ দিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৭) **শ্রেণী-শিক্ষক ও বিষয়-শিক্ষকের কাজ**। শ্রেণী-শিক্ষকের তাঁহার শ্রেণীতে যত বেশী সম্ভব কাজ দেওয়া ভাল। তাহা হইলে তিনি শ্রেণীর সমস্ত ছাত্রকে ভালভাবে জানিতে পারিবেন। অপর দিকে, বিষয়-শিক্ষককে তাঁহার নির্দিষ্ট বিষয়ে যত বেশী সম্ভব পাঠদানের সুযোগ দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই তিনি সেই বিষয় শিক্ষাদান-কার্যে বেশী মনোযোগ দিতে পারিবেন ও তাহার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। অবশ্য শ্রেণী-শিক্ষককে অন্য শ্রেণীতে এবং বিষয় শিক্ষককে অন্য বিষয়ে কিছু পাঠ দেওয়া আবশ্যক। নতুবা তাঁহাদের কাজ একঘেয়ে হইয়া পড়িবে।

(৮) **শিক্ষক ও ছাত্রের অবসর**। ছাত্রগণ তিন ঘণ্টার বেশী একটানা মানসিক পরিশ্রম করিতে পারে না। সুতরাং তিন ঘণ্টা পাঠের পর তাহাদিগকে ৩০ মিনিট অবসর দেওয়া উচিত। ইহা ছাড়া প্রত্যেক ঘণ্টার পর ৫ মিনিট অবসর দানের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা হইলে প্রতেক ঘণ্টা কাজের ফলে যে মানসিক অবসাদ আসে তাহা দূর হইতে পারে এবং এক বিষয় পাঠের জন্য ছাত্রদের মন তৈয়ার হইতে পারে। অবশ্য এই ৫ মিনিট অবসর নির্দেশের জন্য স্বতন্ত্র ঘণ্টা দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন ও অসুবিধাজনক। একটা পাঠ শেষ হওয়ার ৫ মিনিট পরে ২য় পাঠ আরম্ভ করিলেই এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

প্রত্যেক শিক্ষককে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা অবসর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন শিক্ষকই এক দিবসে ৩।৪ ঘণ্টার বেশী উদ্যমের সহিত পাঠ দিতে পারেন না। তবে অবশিষ্ট সময়ে মৌখিক পাঠদানের পরিবর্তে অন্য রকম পাঠদান বা কাজ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তাহা হইলেও সকল শিক্ষককে প্রত্যহ অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ণ অবসর দিতেই হইবে।

শ্রেণীর সময়-পত্রিকা ও শিক্ষকের সময়-পত্রিকা

সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে বিভিন্ন ঘণ্টায় এক এক শ্রেণীর কাজ নির্দেশ করিয়া শ্রেণীর সময়-পত্রিকা তৈয়ার করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে এরূপ একটা শ্রেণী-সময়-পত্রিকা রাখিতে হইবে।

যেরূপ সপ্তাহের বিভিন্ন দিবসে ও বিভিন্ন ঘণ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজ দেখাইয়া শিক্ষকের সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করা যায়। হেডমাষ্টারের কামরায় এক এক শিক্ষকের সময়-পত্রিকা রাখিতে হয়।

সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করিবার জন্য কতিপয় কার্যকরী ইঙ্গিত
(Practical Hints)

(১) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে সপ্তাহে কতকগুলি পাঠ দিতে হইবে, শ্রেণীগুলির নামের পার্শ্বে তাহা লিখিয়া লইবেন।

(২) বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কোন বিষয়ে বিশেষ অধিকার, অনুরাগ প্রভৃতি বিষয় লিখিয়া লইবেন।

(৩) তাহার পর দুইখানি বড় কাগজে প্রয়োজনীয় দাগ কাটিয়া লইবেন। একখানির বামধারে সমস্ত শিক্ষকের নাম অন্যখানির বামধারে সমস্ত শ্রেণীর নাম লিখিতে হইবে।

(৪) এক্ষণে একজন শিক্ষক শ্রেণীর নামের পার্শ্বে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে, বিভিন্ন ঘণ্টায়, বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ লিখিবেন। আর একজন শিক্ষক সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষকের নামের পার্শ্বে অনুরূপ দিবসে ও ঘণ্টায় সেই সকল শ্রেণী ও সেই সকল পাঠ লিখিয়া ফেলিবেন।

(৫) এইভাবে দুই কাগজেই সপ্তাহের সমস্ত কাজ নির্দেশ করা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক পাঠ দেওয়া হইয়াছে কিনা এবং সকল শ্রেণীকে প্রত্যেক ঘণ্টায় কোন কোন কাজ দেওয়া হইয়াছে কিনা, অপর দিকে সকল শিক্ষককে সপ্তাহে নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ দেওয়া ও প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পরিমাণ অবসর রাখা হইয়াছে কিনা। ইহা বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীতে পাঠ নির্দেশ করার সময়ে এবং শিক্ষকদের মধ্যে সেই কাজ বণ্টন করার সময়ে পূর্ববর্ণিত পাঠের পর্যায়, পাঠের দৈর্ঘ্য, পাঠ-বিষয়ে সময়বণ্টন, শিক্ষকদের মধ্যে কার্যবণ্টন, প্রভৃতি নিয়মগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে এবং সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার পর সেইগুলির সাহায্যে তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজনমত পরিবর্তন করিতে হইবে।

সময়-পত্রের অসুবিধা—বর্তমান সময়ে কড়াকড়িভাবে সমস্ত স্কুল-সময়ের জন্য ছাত্রদের কাজ নির্দিষ্ট করিয়া সময়-পত্রিকা প্রস্তুত করার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন। ইহাতে ব্যক্তিগত বৈষম্য-নীতি অনুসৃত হয় না। তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে ছাত্রগণের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকে না এবং তাহারা নিজেদের রুচি, শক্তি বা প্রয়োজনানুযায়ী কোন বিষয় অধ্যয়নে বেশী বা কম সময় দিতে পারে না। ফলে মেধাবী ছাত্রকে অল্পমেধা ছাত্রদের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং অল্পমেধা ছাত্রকে মেধাবী ছাত্রের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিতে হয় বা সেই চেষ্টা ত্যাগ করিতে হয়। তাই ডল্টন লেবরেটরী পদ্ধতিতে সময়-পত্রিকা তৈয়ার করিবার প্রথা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সময়-পত্রিকার সাহায্য ব্যতীত বহু ছাত্র, শ্রেণী ও শিক্ষক লইয়া গঠিত বিদ্যালয়গুলিতে সুশৃঙ্খলার সহিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাই সম্ভব নয়। সুতরাং সময়-পত্রিকা তুলিয়া না দিয়া পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলির প্রতিকারের চেষ্টা করিতে হইবে।

সময়-তালিকার সংস্কার—শ্রেণীর গড়পড়তা মেধাবী ছাত্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষা দিলে এবং যতটা সম্ভব একই বয়সের ও সমান জ্ঞানের ছাত্র লইয়া শ্রেণী-গঠন করিলে পূর্বোক্ত অসুবিধাগুলি অনেকটা দূর হইবে। ইহা ছাড়া ছাত্রদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত পাঠের সুযোগ দেওয়ার জন্য সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে

২।৩ ঘণ্টা সময় স্বতন্ত্র রাখা যাইতে পারে। সেই সময় তাহারা শ্রেণীতে বসিয়া বা পুস্তকাগারে গিয়া যে বিষয়ে তাহাদের বিশেষ অনুরাগ বা অভাব আছে তাহা পাঠ করিতে পারে। শ্রেণী-পাঠনার অনুপূরকভাবে ডল্টন-প্রণালী, কার্যসমস্যা-প্রণালী প্রভৃতি অনুযায়ী শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করিলে পূর্বোক্ত দোষের প্রতিকার হইবে।

আদর্শ সময়-তালিকাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করিয়া ইহার ত্রুটি নিরসন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। পাঠ্য-বিষয়গুলি সময়-তালিকায় এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে সেইগুলি ছাত্রদের কাছে একঘেয়ে মনে না হয়। সেইজন্য একই বিষয়ের বার বার পঠনের ব্যবস্থা না করা এবং আকর্ষণীয় বিষয়গুলি শক্ত বিষয়গুলির মাঝে স্থান দেওয়া উচিত। শিক্ষকদের কাজের দিকেও বৈচিত্র্য থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন শিক্ষককে যাহাতে পর পর সব ক্লাসে একই বিষয় না পড়াইতে হয় তাহাও দেখা কর্তব্য। মাঝে মাঝে অন্য বিষয় পাঠনার ব্যবস্থা থাকা ভাল।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তাহার ব্যবহার

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটা ভাল গ্রন্থাগার থাকা একান্ত প্রয়োজন। ইহাকে বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ বলা যায়। কারণ কেবল শ্রেণী-পাঠ্যপুস্তক পড়িয়া বা শিক্ষক-প্রদত্ত পাঠ গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে ছাত্রের জ্ঞান সম্পূর্ণ হইতে পারে না। তাহার জ্ঞান-বিস্তারের জন্য সেই বিষয়ে আরও পুস্তক পাঠ করা দরকার। বস্তুতঃ, স্কুল-কলেজে কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞানদান অপেক্ষা সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভের আগ্রহ সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাই বেশী। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের জ্ঞানতৃষ্ণা তৃপ্তিরও সুযোগ দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগার থাকিলেই ছাত্রগণ তাহাদের জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাইবার সুযোগ পাইতে পারে। স্কুল-কলেজে পড়িবার সময়ে জ্ঞানার্জনে অভ্যাস হইলেই ছাত্রগণ পাঠ্য জীবনের পরেও স্বচেষ্টায় জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়াস পাইতে পারে। অপর দিকে শিক্ষকদের জন্যও গ্রন্থগারের প্রয়োজনীয়তা কম নয়। কেবল পাঠ্য-পুস্তক পড়িয়া কোন শিক্ষকই ভাল পাঠ দিতে পারেন না। পাঠ্য-জীবনে তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে উচ্চজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই পরে যে সে-সকল বিষয় সম্বন্ধে আর কোন বই পড়িবার প্রয়োজন নাই তাহা নয়। ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, জ্ঞান-স্রোত কখনও নিশ্চল থাকে না। আজ যাহা কোন বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, কিছুকাল পরে তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইতে পারে এবং নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। জ্ঞানের এই ক্রমবিকাশের সহিত মিল রাখিয়া না চলিলে শিক্ষকগণ জ্ঞানক্ষেত্রে পিছনে পড়িয়া যাইবেন এবং দক্ষতার সহিত নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিতে অসমর্থ হইবেন। তাই প্রকৃত শিক্ষককে

আজীবন ছাত্র থাকিতে হয়। বিদ্যালয়ে ভাল গ্রন্থাগার থাকিলেই শিক্ষকগণ পূর্বলব্ধ জ্ঞানস্মৃতি জাগ্রত রাখিবার ও নূতন নূতন জ্ঞানার্জনের সুযোগ পাইতে পারেন।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা—(১) গ্রন্থাগারে থাকে বিভিন্ন ধরণের পুস্তক যাহাতে আমাদের পিতৃপুরুষদের অভিজ্ঞতা বিধৃত আছে। আমরা যখন বিদ্যালয়ে আমাদের কৃষ্টিমূলক উত্তরাধিকারের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া থাকি, তখন গ্রন্থাগারে যে সব পুস্তক রহিয়াছে, সেই পুস্তকসমূহ আমাদের আরও সুস্পষ্ট জ্ঞানের সন্ধান দিয়া থাকে।

(২) গ্রন্থাগারের পুস্তকসমূহ বিদ্যালয়ে আহরিত জ্ঞানের পরিপূরক হিসাবে কাজ করে। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়ও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রেণী-পাঠনায় সেই সব বিষয় বিস্তৃতি ও গভীরতা অনুযায়ী পাঠ দেওয়া সম্ভব হয় না। ঐ সব বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে পাঠাগারে পুস্তকপাঠ অপরিহার্য হইয়া উঠে।

(৩) শুধু যে শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার হইতে উপকৃত হয় তাহা নয়। শিক্ষকগণ পাঠাগার দ্বারা সমৃদ্ধ হন। তাঁহারা যখন শ্রেণীতে পাঠ দান করিতে যান, তখন তাঁহাদের পূর্বতন অভিজ্ঞতা ও শ্রেণী-পুস্তক তাঁহাদিগকে বক্তব্য বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হয়ত সাহায্য করিতে পারে না, তখন তাঁহাদের প্রয়োজন হয় গ্রন্থাগার হইতে সেই বিষয়ে অধিকতর জ্ঞানলাভ করা।

(৪) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বচেষ্টায় যতটা সুষ্ঠুভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে পাঠ গ্রহণের মধ্য দিয়া এতটা শিক্ষালাভ করিতে পারে না। এ বিষয়ে মাধ্যমিক কমিশন বলিয়াছেন, "Individual work, the pursuit of group projecets, many academic hobbies and many co-curicular activities, postulate the existence of a good, efficiently managed library."

(৫) শ্রেণী-পাঠনায় অনেক সময় ব্যক্তি-বৈষম্য নীতিকে মানিয়া চলা হয় না। ইহাতে উন্নত ধী-সম্পন্ন ছাত্রদের অসুবিধা হয়, কারণ সাধারণতঃ মাঝারি ধী-সম্পন্নদের উপযুক্ত পাঠনাই দেওয়া হইয়া থাকে। গ্রন্থাগারে উন্নত ধী-সম্পন্ন ছাত্ররা নিজেদের জ্ঞানস্পৃহা মিটাইবার সুবিধা পায়।

(৬) আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে যেখানে শ্রেণী-পাঠনা থাকে না, সেই সব ক্ষেত্রে ছাত্রদের ব্যক্তিগত উৎকর্ষের জন্য গ্রন্থাগার অপরিহার্য।

(৭) গ্রন্থাগার স্বয়ং শিক্ষাকে সাহায্য করিয়া থাকে। গ্রন্থাগারে স্বয়ংপাঠে ছাত্রদের শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কোন ছাত্রের পক্ষে বিদ্যালয়ের সব উপযুক্ত পুস্তক ক্রয় করা সম্ভব নয়। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারই হইতেছে একটি স্থান যেখানে সকল ছাত্র যাইয়া নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতে পারে। গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার ফলে ছাত্রদের বাহিরের জ্ঞানলাভে স্পৃহা জন্মে।

(৮) গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা সহ-পাঠ্যক্রামক বিষয়গুলি সম্পর্কে জানিতে পারে।

(৯) অবসরকালে গ্রন্থাগারের পুস্তকই ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ বন্ধুর কাজ করে। অবসর সময়ে তাহারা গ্রন্থাগারে যাইয়া পড়াশুনা করে। ফলে তাহাদের কুসঙ্গে মিশিয়া খারাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

(১০) ভাল গ্রন্থাগারে নানাবিধ সদগ্রন্থ থাকে, যেমন, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, সাহসিকতামূলক কাজের বিবরণ, জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীগণ সেই সব পুস্তক পাঠ করিবার ফলে নিজ নিজ চরিত্র গঠন করিতে পারে।

(১১) পাঠাগারে পড়িতে হইলে নীরবে পড়িতে হয়। তাহা ছাড়া অন্যের অসুবিধার দিকে লক্ষ্য দিতে হয়। ইহার ফলে তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠে।

(১২) গ্রন্থাগার ছাত্র-ছাত্রীদের সময়ের মূল্য শিক্ষা দেয়। কারণ তাহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ে পুস্তক ফেরৎ দিতে হয়।

অতএব বলা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। ইহা পুস্তক-তালিকা, গ্রন্থপঞ্জী, ইনডেক্স ও রেফারেন্স পুস্তক ইত্যাদির সাহায্যে তাহাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করিয়া থাকে। কাজেই গ্রন্থাগার সম্পর্কে সহজেই বলা চলে, "The library is thus a common platfarm, upon which all students meet on a common level with equal opportunities for all to grow and develop their intellectual capacities. It is the nucleus of the school environment, the centre of intellectual activities of the school". (Giand and Sharma)

গ্রন্থাগারের ত্রুটি—মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন আমাদের বর্তমান বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার-সমূহের অনেক ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছেন। কমিশনের মতে ইহার অনেকগুলিই গ্রন্থাগার নামের অনুপযুক্ত; তাই এইগুলি ছাত্রদের মনে পাঠের জন্য আগ্রহ সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। গ্রন্থাগারের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি আলোচনার যোগ্য:

(১) বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির সংগঠনই এইরূপ যে, উহা ছাত্র ও শিক্ষক কাহারও উপকারে আসিতেছে না। গ্রন্থাগারগুলি অত্যন্ত অবিন্যস্ত। শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাব। এই কারণে এইগুলি ঠিক মত ছাত্রদের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিতেছে না। সাধারণতঃ গ্রন্থাগারগুলি বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা কেরানীর উপর ন্যস্ত থাকে এবং তাঁহারাও তাঁহাদের নিজেদের কাজের উপর নূতন চাপ সৃষ্টি হওয়ায় গ্রন্থাগারের উপর বিশেষ নজর দেন না।

(২) গ্রন্থাগারে নূতন পুস্তকের সমাবেশ কম, ফলে পুরাতন পুস্তকের জন্য ছাত্রগণও গ্রন্থাগারের প্রতি কোন আগ্রহ প্রকাশ করে না।

(৩) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিশুদের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব সুপ্রকট। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের আকৃষ্ট করিবার মত বিষয়বস্তুর সেইখানে অত্যন্ত অভাব।

(৪) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কেবল শিক্ষকের প্রয়োজনেই পুস্তক ক্রয় করা হইয়া থাকে। এই পুস্তকসমূহ ছাত্রদের আগ্রহ সৃষ্টি করে না।

(৫) অনেক বিদ্যালয়ে এমন কোন স্থান থাকে না যেখানে গ্রন্থাগার স্থাপিত হইতে পারে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র একটি ছোট ঘরে গ্রন্থাগার স্থাপিত।

বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার সংগঠন

(১) **শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ**—বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করিতে হইলে পূর্ণ সময়ের জন্য একজন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করিতে হইবে। কোন শিক্ষকের উপর এই অতিরিক্ত দায়িত্ব দিলে চলিবে না। একমাত্র গ্রন্থাগারিকই ইহাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। গ্রন্থাগারিক ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বন্ধু মনোভাবাপন্ন হইবেন এবং তাহাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সম্বন্ধেও অবহিত হইবেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যপূর্ণ পাঠে উদ্বুদ্ধ করিবেন।

(২) **গ্রন্থাগারের জন্য স্থান নির্বাচন**—বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ কক্ষে গ্রন্থাগার স্থাপিত হাওয়া বাঞ্ছনীয়। কক্ষটি হইবে আলোবাতাস-যুক্ত এবং ইহার দেওয়ালে থাকিবে সুন্দর সুন্দর ছবি, মনীষীদের আলোকচিত্র এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্য-সম্বলিত ছবি।

গ্রন্থাগারে আসবাব-পত্র হিসাবে থাকিবে আলমারী, সেলফ, চেয়ার ইত্যাদি। অনেকে খোলা আলমারী বা open shelf system-এ বই রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বইগুলি খোলা আলমারিতে শ্রেণী ও বিষয় অনুসারে সাজান থাকিবে। ছাত্ররা নিজ ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিয়া নানা বই দেখিয়া পুস্তক নির্বাচন করিতে পারিবে। ইহাতে প্রথম দিকে অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু বেশী উপকার হইবে। ছাত্রগণ একটি পুস্তক নির্বাচন কালে অনেক পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত হইবে।

(৩) **পুস্তক নির্বাচন**—বিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের জন্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা এবং উহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে কি পরিমাণে আকর্ষণ করিতে পারে তাহার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকিবে:

(ক) বিভিন্ন ধরণের পুস্তক থাকিবে। (খ) বিভিন্ন বয়স ও রুচিসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে এমন সব পুস্তকের সমাবেশ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন করিতে হইবে। (গ) পুস্তকসমূহ সুন্দর সুন্দর চিত্র ও নক্সা-সম্বলিত হইবে। (ঘ) পুস্তকগুলি ছাত্রদের শ্রেণীপুস্তকের পরিপূরক হইবে। (ঙ) শিক্ষকদের জন্য রেফারেন্স পুস্তক, বা যেসব পুস্তক হইতে তাঁহারা সমৃদ্ধ হইবেন, এমন সব পুস্তক-গ্রন্থাগারে থাকিবে। (চ) কৃষ্টি ও কলা সম্বন্ধীয় পুস্তক ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী। সেই সব পুস্তক গ্রন্থাগারে যথেষ্ট পরিমাণে থাকিবে। এমন সব গল্প, জীবনী ও কথিকা সম্বলিত পুস্তক গ্রন্থাগারে থাকিবে, যাহা পড়িয়া শিশুদের মন সুগঠিত হয়। (ছ) বিভিন্ন দেশের নামকরা লেখকদের অনুবাদ গ্রন্থ গ্রন্থাগারে থাকিবে। তাহাছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা যাহা আমাদের দেশের কৃষ্টির ধারক ও বাহক, তাহাও পাঠাগারে থাকা আবশ্যক। গ্রন্থাগারে দৈনিক সংবাদ-পত্রও থাকিবে। (জ) যে সব পুস্তক বিশেষ প্রয়োজন তাহার একাধিক কপি গ্রন্থাগারে রাখিতে হইবে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে শিক্ষকের আগ্রহ—গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্পর্কে শিক্ষকদের পরিচয় থাকিবে। কারণ ছাত্রগণ প্রথমে তাঁহাদের কাছে পুস্তক পাঠ সম্পর্কে জানিতে চাহিবে। শিক্ষকগণকে পুস্তক নির্বাচন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দিতে হইবে—কোন্ পুস্তক পড়িতে হইবে, কোন্ পুস্তক সম্প্রতি পড়িবার প্রয়োজন নাই, পরে পড়িতে পারে। অতএব শিক্ষকদের জানিতে হইবে গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক ছাত্র-ছাত্রীদের পরে পড়িতে হইবে। শ্রেণীতে পাঠদানকালে পরিপূরক পাঠহিসাবে, কোন্ পুস্তক হইতে আরও বিষয়বস্তু গ্রহণ করিতে হইবে—শিক্ষক তাহা ছাত্রদের বলিয়া দিবেন।

কি ভাবে গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করা যায়—অনেক বিদ্যালয়ে বহু আলমারীপূর্ণ ভাল ভাল পুস্তক থাকিলেও তাহাদের যথেষ্ট ব্যবহার হয় না। ছাত্র ও শিক্ষকগণ গ্রন্থাগারের যথেষ্ট পুস্তক পাঠ না করিলে গ্রন্থাগারের কোন মূল্যই থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীগণকে গ্রন্থাগারে পুস্তক পড়িবার উৎসাহ দিবার জন্য লিখিত উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে।

(১) গ্রন্থাগারিক প্রতি শ্রেণীতে যাইয়া ছাত্রদিগকে গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে উপদেশ দিবেন। (২) শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে গ্রন্থাগারে যাইয়া বিভিন্ন রেফারেন্স বই দেখিবার জন্য উৎসাহিত করিবেন। (৩) গ্রন্থাগারে খোলা আলমারীর (open shelves) ব্যবস্থা থাকিবে। ইহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে নিজেদের রুচি অনুযায়ী পুস্তক বাহির করিয়া পড়া সহজ হইবে। (৪) প্রতি ছাত্র গ্রন্থাগারে কি কি পুস্তক পড়িল তাহা তাহার দিন-লিপিতে লিখিয়া রাখিবার জন্য উৎসাহ দিতে হইবে। বইটি তাহার কেমন লাগিল, সে সম্বন্ধে তাহার মতামত দিবে। এইরূপ লিখিতে চেষ্টা করিলে তাহার অন্তর্দৃষ্টি বৃদ্ধি পাইবে। এ বিষয়ে একজন শিক্ষাবিদের কথায় "Such a diary, maintained throughout the school years, will provide a fascinating map of his intellectual development and literary growth which will not only be of values to him here and now but may be of interest even in later life." (৫) পাঠাগারের সম্মুখের বুলেটিন বোর্ডে যদি নূতন আনীত পুস্তকের ছবি টাঙান থাকে এবং ঐ বিষয়ে কয়েকটি কথা লিখিত থাকে, তবে তাহা ছাত্রদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে। (৬) প্রত্যেক-শ্রেণীর সময়-পত্রিকায় সপ্তাহে দু-এক ঘণ্টা গ্রন্থাগারে গিয়া পুস্তক পড়িবার জন্য নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। (৭) শ্রেণী-লাইব্রেরীতে রাখিয়া কোন ছাত্রকে পুস্তক ধার দিবার ভার দিলে ছাত্ররা সহজে পুস্তক পাইতে পারে ও অধিকতর সংখ্যক পড়িতে উৎসাহিত হয়। (৮) গ্রন্থাগারে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুস্তক পড়িবার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার—কোন বিদ্যালয়ে নিম্নলিখিত ধরণের গ্রন্থাগার সংগঠন করা চলে—

(১) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Central Library).

(২) শ্রেণী গ্রন্থাগার (Class Library).

(৩) শিক্ষকদের গ্রন্থাগার (Teachers' Library).

(৪) বিষয়-গ্রন্থাগার (Subject Library).

(১) **কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার**—বিদ্যালয়ে সর্বাপেক্ষা বড় গ্রন্থাগার হইল কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। এই গ্রন্থাগারটি সকল ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য খোলা থাকিবে। সব রকমের পুস্তক এই গ্রন্থাগারে থাকিবে। শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই এই গ্রন্থাগার হইতে সমৃদ্ধ হইতে পারিবে।

(২) **শ্রেণী গ্রন্থাগার**—সকল শ্রেণীর ছাত্রদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গিয়া পছন্দমত পুস্তক নির্বাচন করা সব সময় সম্ভব হয় না। এই জন্য শ্রেণী গ্রন্থাগার থাকা উচিত। গ্রন্থাগারে ঐ শ্রেণীর উপযুক্ত পুস্তক থাকিবে। তাহা ছাড়া শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্য-পুস্তকের পরিপূরক, এমন সব পুস্তকই শ্রেণী-গ্রন্থাগারে থাকিবে। শ্রেণী-শিক্ষক শ্রেণী-গ্রন্থাগার পরিচালনা করিবেন। শ্রেণী-শিক্ষক অবশ্য এই দায়িত্বটি গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত ছাত্রের উপর ন্যস্ত করিতে পারেন। এই গ্রন্থাগারটি হইতে ছাত্রগণ যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিতে পারে।

(৩) **শিক্ষকদের জন্য গ্রন্থাগার**—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে কেবল শিক্ষকদের জন্য একটি সেকসন বা আলাদা পাঠ-কক্ষ থাকিতে পারে। ঐ সেকসন হইতে কেবল শিক্ষকগণই পুস্তক লইতে পারিবেন। শিক্ষকদের জন্য উপযুক্ত রেফারেন্স পুস্তক এই স্থানে সমাবেশ থাকিবে। শিক্ষকগণ এই স্থানে বসিয়া পড়িতে পারেন এমন ব্যবস্থাও থাকিবে।

(৪) **বিষয়-সম্পর্কিত গ্রন্থাগার**—এই জাতীয় গ্রন্থাগার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের পক্ষে বিশেষ কার্যকর। এই গ্রন্থাগারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের পুস্তক একটি পৃথক্ আলমারীতে রাখা হয় এবং ঐ বিষয়ের পুস্তকসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞের অধীন থাকে। ছাত্র-ছাত্রীগণ এই জাতীয় গ্রন্থাগার হইতে বিশেষ বিষয় সম্পর্কিত বহু তথ্য সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে।

গ্রন্থাগারের খাতাপত্র—গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নলিখিত খাতাপত্র রাখিতে হয়—

(১) পুস্তক জমা বই (Stock Register)

(২) শ্রেণী-বিভাগযুক্ত পুস্তক-তালিকা (Classified Catalogue)

(৩) লেখক-সূচী অনুযায়ী পুস্তক-তালিকা (Authors' Catalogue)

(৪) শ্রেণী-লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা।

(৫) শিক্ষককে পুস্তক ধার দিবার খাতা (Teachers' Book issue Register)

(৬) ছাত্রদের পুস্তক ধার দিবার খাতা (Students' Book issue Register)

(৭) গ্রন্থাগারের জমা-খরচ বই (Account Book)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদ্যালয় পরিদর্শন

(School Inspection)

সংজ্ঞা—শিক্ষা-ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির জন্য যেমন শিক্ষকদের দায়িত্ব আছে তেমনি প্রতিষ্ঠানের বাইরের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঝে মাঝে তাহার মূল্যায়ন প্রয়োজন। বাইরের যোগ্য কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সে সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন এবং পরিচালনা সম্পর্কে কি সুপারিশ করেন, বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পর্যবেক্ষণ পরীক্ষা ও মূল্যায়নের নামই পরিদর্শন। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইল তত্ত্বাবধান, পথনির্দেশ, পরিচালনা ও শাসন।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পরিদর্শক গতানুগতিক ভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ করিয়া দীর্ঘ পরিদর্শন মন্তব্য লিখিয়া যান। কিন্তু পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য তাহা নয়। স্বাস্থ্যকর পরিদর্শন প্রত্যেকটি কর্মীর মনে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে, কাজে প্রেরণা পাইবে এবং আরও সুন্দর ভাবে কাজ করিবার চেষ্টা করিবে।

পরিদর্শনের উদ্দেশ্য—ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে তিন রকমের বিদ্যালয় আছে, যথা—সরকারী, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ও অসাহায্য প্রাপ্ত—তাহারা সরকারের নিকট হইতে কোন না কোন সাহায্য পাইয়া থাকে বা সাহায্যের প্রত্যাশা করে। তাছাড়া প্রয়োজন সরকারী অনুমোদন। সাহায্য ও অনুমোদনের পক্ষে পরিদর্শকের মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিদর্শকের মন্তব্যের উপর সাহায্য অনুমোদন নির্ভরশীল।

তাহা ছাড়া শিক্ষাপ্রসার পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার উপযুক্ত তত্ত্বাধান সরকারের পরম দায়িত্ব ও কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের অঙ্গ হিসাবে এবং বিদ্যালয়গুলির উপর ন্যস্ত দায়িত্ব কতদূর পালিত হইতেছে তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে পরিদর্শনের ব্যবস্থা। সুপরিকল্পিত পরিদর্শন ও তাহার ফলশ্রুতি সুপারিশের ভিত্তিতেই শিক্ষার সামগ্রিক উন্নতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

শিক্ষকদের ক্ষেত্রে পরিদর্শন একাধারে তাঁহাদের কাজের মূল্যায়ন ও আন্তর্বৃত্তি শিক্ষণ (inservice training)। উপযুক্ত পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষক যেমন উপকৃত হন, অভিভাবক তথা সমাজ, বিদ্যালয়, এমন কি পরিদর্শকরাও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে উপকৃত হন।

ব্যাপকতর অর্থে পরিদর্শন তাই পরিদর্শক (inspector) শিক্ষাবিদ, অভিভাবক প্রধান শিক্ষক সকলকেই বুঝায়।

পূর্বে পরিদর্শন ছিল নেতিবাচক (negative inspection) কেবল ত্রুটি নির্ধারণ সেইজন্য পরিদর্শকের আগমন ছিল ভয়ের বিষয়। ফলে শিক্ষা ও শিক্ষা পরিচালনার উন্নতির বদলে বিপরীতই ঘটিত।

পরিদর্শনের নীতি—কিন্তু যদি শিক্ষার উন্নতিই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পরিদর্শকের বিদ্যালয় পরিদর্শনের ধারা ভিন্নমুখী হইবে। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষকের শিক্ষাদান সংক্রান্ত মূল বিষয়কে সাহায্য করা। শিক্ষকের সঙ্গে তিনি হইবেন সমমর্মী ও সহকর্মী। তিনি শিক্ষকের কাজের বিচারক হইয়া থাকিবেন না। শিক্ষাদান সংক্রান্ত সমস্ত সমস্যার ক্ষেত্রে তিনি শিক্ষকের সঙ্গে যুক্ত হইয়া কাজ করিয়া সমস্যা সমাধানে শিক্ষককে সাহায্য করিবেন। পরিদর্শনের জন্য পূর্বাহ্নে সংবাদ দিলে অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু কুফল দেখা যায়। পরিদর্শকের আগমন সংবাদে বিদ্যালয়ে একটি কৃত্রিম আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যালয়ের সত্যকার ছবি পরিদর্শকের দৃষ্টিগোচর না-ও হইতে পারে। অপর পক্ষে ইহার ত্রুটি হইল, শিক্ষককে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরিবার মনোবৃত্তি পরিদর্শকের মনে মনে জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় এবং শিক্ষকও তাহা ভাল মনে লইবেন না। গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় পরিদর্শিত হইলে এই মনোভাবের নিরসন হইলেও আর একটি বিশেষ অসুবিধা থাকিয়া যায়। পরিদর্শক আসেন জটিল সমস্যা সমূহে শিক্ষককে সাহায্য করিতে। কিন্তু পূর্বাহ্নে না জানাইয়া আসিলে হয়তো সেই সাহায্যের অবকাশ মিলিবে না। যে ভাবেই বিদ্যালয় পরিদর্শন-কার্য হউক না কেন, পরিদর্শন দ্বারা যেন উভয় পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণ ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

গণতন্ত্রের নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিদর্শক উভয়েরই বিদ্যালয় সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে। সেই কারণেই বিদ্যালয় পরিদর্শনের পর পরিদর্শক অতি অবশ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে একত্র হইয়া সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালন ও পাঠদান নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। পরিদর্শকের দৃষ্টিতে যে বিষয়টি ভুল বা ত্রুটিপূর্ণ, তাহার আলোচনা করিতে যাইয়া সেই বিষয় সংক্রান্ত শিক্ষকের যুক্তিও পরিদর্শক মন দিয়া শুনিবেন এবং শিক্ষক যদি তাঁহার নিজস্ব বিষয়টির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিতে পারেন তাহা হইলে পরিদর্শক নিশ্চয়ই তাঁহার অভিমত পরিবর্তন করিবেন। এই আলোচনা-সভার পর প্রয়োজন হইলে পরিদর্শক প্রতি শিক্ষকের সঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাঁহার সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারেন।

ভারতের মত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমাজকল্যাণকর সর্ববিধ বিষয়ে সরকারকেই অগ্রণী হইতে হইবে। জনহিতকর কাজের মধ্যে শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। সেইজন্য জনশিক্ষার ভার মূলতঃ সরকারকে লইতে হইয়াছে। শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতির সম্পূর্ণ ভার রাষ্ট্রের উপর বর্তাইয়াছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্র অর্থব্যয় ও শিক্ষার নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন। এই সব পরিকল্পনার রূপায়ণ কিরূপ হইতেছে তাহা দেখাশুনা করিবার জন্য সরকার পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। এক এক জন পরিদর্শকের দায়িত্ব এক এক অঞ্চল বা নির্দিষ্ট কতকগুলি বিদ্যালয় পরিদর্শন করা। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংক্রান্ত, পরিশাসন ও সংগঠন সংক্রান্ত সমুদয় কাজকর্ম পরীক্ষা করিয়া দেখাই পরিদর্শকের কর্তব্য।

পরিদর্শকের কর্তব্য—বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে হিসাব-পত্র অডিটরের যা কর্তব্য অনেকক্ষেত্রে পরিদর্শক সেই কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন।

সরকারী পরিদর্শক খাতাপত্র, আয়ব্যয়ের হিসাব ও পরিচালনার দোষ ত্রুটি ধরিতে এত বেশী সময় ব্যয় করেন যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও তাহার মান নির্ণয় এবং উন্নতি বিধানের পরামর্শ দিবার সময় পান না। পরিদর্শকের প্রধান কর্তব্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সঙ্গে শিক্ষা-সমস্যা, পদ্ধতি, পদ্ধতি রূপায়ণে অসুবিধা, শিক্ষা-গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও তাঁহাদের পরামর্শ দেওয়া। ছাত্রদের শিক্ষার মান পরিমাপ করা, শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রদীপন দেখা—নূতন কি কি জিনিসের প্রয়োজন তাহা অনুধাবন করা, খেলার মাঠ ইত্যাদি দেখা। শিক্ষকদের পাঠনা পারদর্শনের পর প্রয়োজন স্থলে তিনিও দু'-একটি শ্রেণীতে আদর্শ পাঠ দিবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন পরিদর্শকের কর্তব্যকে দু'ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—পরিচালনা-সংক্রান্ত ও শাসন-সংক্রান্ত। প্রথম দিক পরিদর্শন কালে তাঁহাকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে হইবে :

(ক) বিদ্যালয় পরিচালনার দিক—( ) ক্যাশ বই আয়-ব্যয় পরীক্ষা। (২) সরকার বা সাধারণ প্রদত্ত অর্থ, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ব্যবহার ও রক্ষণ। (৩) পরীক্ষার ফলাফল বই। (৪) বিদ্যালয় পরিচালনা-সংক্রান্ত অন্যান্য রেকর্ড। (৫) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কাগজপত্র ও বই। (৬) বিদ্যালয় সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকিলে সে বিষয়ে তদন্ত। (৭) শিক্ষক ও কর্মচারীদের সম্পর্ক, বিরোধ ইত্যাদি থাকিলে তাহা পরিশাসন বা পরিচালনা বিষয়ে পরীক্ষা করিতেই পরিদর্শকের অনেক সময় চলিয়া যায়। শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়ে পরীক্ষা ও পরামর্শ দিবার মত সময় থাকে না। তাই পরিদর্শক যদি তাঁহার সঙ্গে একজন অভিজ্ঞ কর্মচারীকে নেন, যিনি খাতাপত্র পরীক্ষায় তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারেন, পরিদর্শক তাহা হইলে শিক্ষা বিষয়ে বেশী সময় দিতে পারেন।

(খ) শিক্ষাগত মূল্যায়নের দিক—পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য হইল বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত মানের মূল্যায়ন এবং ইহার উন্নতির জন্য সুপরামর্শ দান। পরিদর্শকের শিক্ষা, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিচক্ষণতা সত্ত্বেও তাঁহার একার পক্ষে শিক্ষার মূল্যায়ন ও পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। তাই কোঠারী ও মুদালিয়ার, উভয় কমিশনই সুপারিশ করিয়াছেন তিন বা চার জন অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক লইয়া একটি পরিদর্শক দল গঠিত হইবে। তাঁহারা পরিদর্শকের সঙ্গে বিদ্যালয়ে যাইবেন। প্রতি তিন বৎসর অন্তর পরিদর্শক, পরিদর্শক দলকে লইয়া প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন। প্রয়োজন হইলে সেই বিদ্যালয়ে দুই বা তিন দিন ধরিয়া শ্রেণীপাঠনা, শিক্ষা পরিকল্পনা, রুটিন, পাঠাগার, খেলার মাঠ, শিক্ষা-সরঞ্জাম, পরিচালনা, ছুটি, শৃঙ্খলা ইত্যাদি দেখিবেন, পর্যালোচনা করিবেন ও উন্নয়নের সুপারিশ করিবেন। পরিদর্শক দলে যে সব সুযোগ্য শিক্ষক থাকিবেন তাঁহারা নিজের নিজের বিষয়ে আদর্শ পাঠদান করিয়া শিক্ষকদের উৎসাহিত করিবেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন দুই ধরণের পরিদর্শনের সুপারিশ করিয়াছেন—

(১) বাৎসরিক পরিদর্শন—ইহা রুটিনমাফিক বিদ্যালয় পরিচালনার খুঁটিনাটি দেখিবেন। (২) প্রতি তিন বৎসরে একবার পূর্বকথিত মত ব্যাপক প র্শন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শারীর শিক্ষা, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক নিযুক্তির পরামর্শ দিয়াছেন। এই সব পরিদর্শক নিজ নিজ বিষয়ের পরিদর্শন করিবেন ও উন্নতির বিষয় পরামর্শ দিবেন।

পরিদর্শক নির্বাচন—পরিদর্শকের যে কর্তব্যের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহা নিষ্পন্ন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষণপ্রাপ্ত হইলেই হইবে না—তাঁহাকে চিন্তাশীল শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক ও সংগঠক হইতে হইবে। বর্তমানে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সরাসরি পরিদর্শকের পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। ফলে শিক্ষাকমিশনের সুপারিশ মত শিক্ষাগত মান উন্নয়ন-মূলক কোন কাজই তাঁহাদের দ্বারা হইয়া উঠে না।

কমিশনের মতে যে সব পরিদর্শক সরাসরি নিযুক্ত হইবেন তাঁহাদের নিম্নলিখিত গুণ থাকা প্রয়োজন :

(১) অনার্স বা এম. এ. ডিগ্রি। (২) শিক্ষকতার কাজে অন্তত: দশ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন।

কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিন বছরের অভিজ্ঞতা। সরাসরি নিযুক্ত না করিয়াও নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে হইতেও পরিদর্শক নিযুক্ত করা যাইতে পারে :

(১) শিক্ষকতার কাজে অন্তত: দশ বছরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। (২) উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক। (৩) শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ অধ্যাপক।

এই সব ব্যক্তি তিন বৎসরের জন্য পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন। তিন বৎসর পর তাঁহারা নিজের নিজের কাজে ফিরিয়া যাইবেন। পরিদর্শকদের শতকরা পঞ্চাশ জন এই ভাবে নিযুক্ত হইবেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা যদি পরিদর্শক নিযুক্ত হন পরে নিজের স্কুলে গিয়া এই অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের উন্নতিতে কাজে লাগাইতে পারিবেন। শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পরিদর্শক পদে নিযুক্ত করা উচিত। কারণ শিক্ষণ-ক্ষেত্রে অধ্যাপকদের বিদ্যালয় সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা উচিত এবং পরিদর্শকের ক্ষেত্রেও শিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহা ছাড়া শারীর-শিক্ষা, শিল্প, গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ ঐ ঐ বিষয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইবেন।

বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ—কোঠারি কমিশন বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে যে সব সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার মূল কথা হইল :

(১) রাজ্যের শিক্ষা-বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত হইবে রাজ্য শিক্ষা-বিভাগ। এই বিভাগ নিম্নলিখিত দায়িত্ব বহন করিবে :

(ক) বিদ্যালয়ে উন্নতির কর্মসূচি গ্রহণ ও তাহার রূপায়ণের ব্যবস্থা করা। (খ) বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নির্ধারণ ও রূপায়ণের ব্যবস্থা। (গ) শিক্ষক-শিক্ষণের উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা। (ঘ) প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের

ব্যবস্থা। (ঙ) উপযুক্ত ও নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা। (চ) রাজ্য সমীক্ষা সংস্থার প্রতিষ্ঠা ও তাহার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান পরিমাপের ব্যবস্থা করা। (ছ) রাজ্য শিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education)-র প্রতিষ্ঠা এবং তাহার মাধ্যমে শিক্ষা-সম্পর্কিত গবেষণার ব্যবস্থা করা। (জ) বিদ্যালয় স্তরে বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা।

(২) জেলাস্তরে শিক্ষ-ব্যবস্থাও যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে হইবে। এ সম্পর্কে সুপারিশগুলি হইল :

(ক) জেলার শিক্ষা ব্যবস্থার ভার জেলা শিক্ষা বিভাগকে দিতে হইবে। (খ) জেলা শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মীকে ভারতীয় শিক্ষা সার্ভিসের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হইবে। (গ) জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের উপযুক্ত যোগ্যতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। তাহাদের বেতন ও ভাল হইবে। (ঘ) জেলায় বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে—পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন এবং একটি পরিসংখ্যান বিভাগ চালু করিতে হইবে। (ঙ) মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের জন্য জেলায় কিছু মহিলা পরিদর্শক নিযুক্ত করিতে হইবে।

পরিদর্শন ও স্কুল কমপ্লেকস্ (School Complex)—কোঠারি কমিশন কোনও বিশেষ অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলি লইয়া তাহাদের শিক্ষক, শিক্ষা-সরঞ্জাম, সুযোগ-সুবিধাগুলির সংহতি করিয়া উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিবার নীতিতে আঞ্চলিক বিদ্যালয়, সমবায় বা স্কুল কমপ্লেকস্ গঠন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন। একটি উচ্চ বিদ্যালয় কয়েকটি প্রাথমিক ও নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় লইয়া একটি বিদ্যালয় সমবায় গড়িয়া উঠিবে। পরিদর্শকের কর্তব্য হইল, এই বিদ্যালয়-সমবায় গঠন ও তাহার সংরক্ষণ ও ও প্রয়োগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা।

এক একটি বিদ্যালয়-সমবায় একটি একক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হইবে। এই বিদ্যালয় সমবায় কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্মসূচি লইয়া কাজ করিবে। যেমন—শিক্ষাদানের উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ, মূল্যায়নের ব্যবস্থা, সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া, শিক্ষা-সরঞ্জামের বিনিময় ও পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা। এই শিক্ষা সমবায়গুলির উপর অনেক দায়িত্ব ও ক্ষমতা দেওয়া হইবে। জেলা শিক্ষা বিভাগ এই সব সমবায়গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিবেন।

বিদ্যালয়-সমবায় কেবল পরিচালনা ও শিক্ষা ব্যাপারেই নয়, যৌথ ও ব্যক্তিগত গবেষণার কাজেও উৎসাহ দিবে।

বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারি কমিশন নূতন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলিয়াছেন। দুই কমিশনের মতে বিদ্যালয় পরিচালন ও শাসন কর্তৃত্ব থাকিবে জেলা বিদ্যালয়-পর্ষদের (District School Board) হাতে এবং পরিদর্শনের ভার থাকিবে জেলা শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের উপর। অবশ্য দুইটি সংস্থাই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করিবে। জাতীয় শিক্ষা সংস্থা (State Institute of Education) শিক্ষকদের ও পরিদর্শকদের চাকরি অবস্থায় শিক্ষণের (in service training) ব্যবস্থা করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

বিদ্যালয় পরিশাসন

বিদ্যালয় স্থাপনের উষাকাল হইতেই বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি নীতি চালু হইয়াছিল। তাহা হইল বিদ্যালয় পরিচালনা করিবেন শিক্ষক—যত কিছু দায় দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাঁহার। সে বিষয়ে শিক্ষার্থীর কোন বক্তব্য বা অধিকার থাকিবে না। পঠন-পাঠনের জন্য যাহা প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিভিন্ন যুগে বিবিধ নীতি-নিয়ম চালু হইলে-শিক্ষার্থীকে সব কিছু মানিয়া চলিতে হইত। শিক্ষক কেবল গুরু ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রশাসকও আর ছাত্র কেবল বিদ্যার্থীই নয়, সে ছিল প্রজার সামিল। শিক্ষক হুকুম দিবার কর্তা, আর ছাত্র ছিল হুকুম তামিল করিবার যন্ত্র।

প্রাচীনকাল হইতে যে ধারণা চালু ছিল তাহা হইল অপরিণত-বুদ্ধি শিশুদের নিজেদের মঙ্গল অমঙ্গলের ধারণা থাকে না। কাজেই তাহারা কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ বুঝিবে কিরূপে। পরিণতবুদ্ধি শিক্ষকদের পক্ষে কিসে বিদ্যার্থীর মঙ্গল হইবে তাহা বুঝা সহজ। ছাত্রদের জন্য শিক্ষকরা যে ব্যবস্থাই করুন না কেন তাহা শিক্ষার্থীর মঙ্গলের জন্যই করিতেছেন, এই ধারণা ছিল। তাহা ছাড়া মনোবিজ্ঞানের প্রসার না হওয়ায় শিশুদের মানসিক শক্তি দক্ষতা ও প্রকৃতির সম্পর্কে কোনওরূপ ধারণা ছিল না। তাহারা যে কোন চিন্তামূলক বা গঠনামূলক কাজের উপযুক্ত—একথা কেহ বিশ্বাস করিত না। জ্ঞানলাভকেই শিক্ষা বলার ফলে শিক্ষা-ক্ষেত্রে শিশুর সক্রিয়তাকে কোন মূল্য দেওয়া হইত না। এই সব কারণে অনাধুনিক কাল পর্যন্ত বিদ্যালয় পরিচালনায় শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করা হয় নাই।

বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের ধ্যান ধারণার পরিপোষক। সমাজের আদর্শ অনুযায়ী বিদ্যালয়ের আদর্শও নিরূপিত হইয়া থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের একনায়কতন্ত্র ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শে বিদ্যালয়ও পরিচালিত হইত। রাজার মত প্রধান শিক্ষকই ছিলেন বিদ্যালয়ের সর্বেসর্বা। তাহার পরবর্তী যুগে সামন্ততান্ত্রিক অভিজাত শাসনের প্রতিরূপ দেখা যায় বিদ্যালয় পরিশাসনে। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের তাঁহার ক্ষমতার অংশী করিয়া লইলেন। পৃথিবীর রাজনৈতিক ধ্যানধারণার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালনায় অনেক পরিবর্তন লক্ষিত হইল। মনিটর, প্রিফেক্ট প্রভৃতি প্রথার উদ্ভব হইল। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। সমাজের সবক্ষেত্রে গণতন্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী পরিচালনও পরিশাসনের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রাম হইতে বিদ্যালয়ও বাদ যাইতেছে না। ছাত্র বিক্ষোভ ও ছাত্র-অসন্তোষ অত্যন্ত ব্যাপক হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিচালনায় গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে মানিয়া লওয়া হইয়াছে।

মনিটর—ছাত্র সহযোগিতার ক্ষেত্রে মনিটর নিয়োগ একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপ। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে Dr. Andrew Bell নামক একজন পাদরী মাদ্রাজে শিক্ষকতা করার সময় প্রচলিত এই প্রথায় সুফল পাওয়ায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া সেখানে ইহা ব্যাপক-

ভাবে চালু করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মনিটর বা সর্দার পোড়ো প্রথা দক্ষিণ ভারতের দান।

শ্রেণী শাসনকার্যে শিক্ষককে সাহায্য করিবার জন্য বৎসরের প্রথমেই প্রত্যেক শ্রেণীতে ছাত্রদের মধ্য হইতে একজন মনিটর বা প্রিফেক্ট এবং একজন সহকারী মনিটর নিযুক্ত করা হইত। ইহারা ছাত্রগণ কর্তৃক নির্বাচিত বা প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত হইতেন। মনিটরকে একদিকে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে, অন্যদিকে ছাত্রদের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিতে হইত। শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে তাহাকে শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সাহায্য করিতে হইত। শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে শ্রেণীতে যেন কোন গোলমাল না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইত, শ্রেণীর কোন ছাত্র যেন অন্য কোন ছাত্রের প্রতি অন্যায় ব্যবহার না করে বা শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে যেন কোন দলাদলির সৃষ্টি না হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইত। শ্রেণীর ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কোন নিয়মভঙ্গ করিলে তাহাতে বাধা দিতে এবং তাহাদিগকে সর্বদা শিক্ষকের নির্দেশ মত কাজ করিবার জন্য প্রভাবিত করিতে হইত। সে শিক্ষকের প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিত।

অপরদিকে ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে মনিটরকে শ্রেণীর অভাব অভিযোগ শ্রেণী-শিক্ষক ও প্রধান শিককে জানাইতে হইত। বস্তুতঃ, ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য মনিটরকে সর্বদা চেষ্টিত থাকিতে হইত।

কিন্তু এই প্রথার অনেক দুর্বলতা ছিল। প্রধান শিক্ষক কর্তৃক মনোনীত বলিয়া মনিটরকে যথার্থ ছাত্র প্রতিনিধি বলা যাইত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনিটর ক্ষমতার অপব্যবহার করিত। আপন পদের সুযোগে দুর্বল ও প্রতিযোগী ছাত্রদের উপর অত্যাচার করিত, তাহাদের নামে শিক্ষকদের কাছে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অনর্থক শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিত। কালক্রমে শিক্ষকদের অনুগ্রহভাজন মনিটারকে ছাত্ররা নিজেদের প্রতিনিধিরূপে মানিয়া লইতে পারিল না। তাহারা মনিটরকে গুপ্তচর আখ্যায় ভূষিত করিল।

বিদ্যালয় পরিশাসনে গণতান্ত্রিক নীতি—গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী বিদ্যালয় পরিচালনা বিদ্যালয় পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। আমরা দেখি যে, প্রতি কার্য পরিকল্পনায় শিক্ষক ও শিশু যৌথভাবে পরিকল্পনা কার্যকর করিতে ব্যস্ত। কার্য সম্পাদনে শিক্ষকের আদেশ নাই, বল প্রয়োগ নাই, আছে সহানুভূতিসম্পন্ন সাহায্য দানের মনোভাব।

সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয় পরিচালনায় স্বায়ত্ত-শাসন নীতিকে স্বীকার করা হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিচালনা-ক্ষেত্রে ছাত্ররা আর অচ্ছুৎ নয় বরং শক্তির উৎস মনে করা হইতেছে। বিদ্যালয়ের প্রতিটি কাজে কর্মে প্রতিটি পরিকল্পনা ও রূপায়ণে ছাত্রদের সক্রিয়তা লক্ষ্যণীয়। ইহাতে কি শিক্ষা কি বিদ্যালয় শৃঙ্খলা, উভয়েরই প্রভূত উন্নতি হইয়াছে।

কোনও বিষয় না বুঝিয়া প্রচার করা, মুখস্থ করা, যান্ত্রিকভাবে কোন কিছু শিক্ষা করার কোন সুবিধা বর্তমান পদ্ধতি বর্হিভূত। শিক্ষা-বিষয়ে কোন কিছু আয়ত্ত

করিতে হইলে তাহাকে দেখিয়া শুনিয়া, পর্যবেক্ষণ করিয়া যাচাই করিয়া তবে আয়ত্ত করিতে হয়। সামাজিক চাহিদা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুবন্দোবস্তও বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষেই বর্তমান। প্রতিটি শ্রেণী এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয় একটি গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী গঠিত সমাজ।

বর্তমান প্রথায় বিদ্যালয়ে কোন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে হইলে শিশু ও শিক্ষক উভয়-পক্ষই ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে নানাভাবে চেষ্টিত হন। ঐ সম্বন্ধে তাঁহারা খোলাখুলি আলোচনা করেন। শিশুরা কি করিতে চায়, কি তাহাদের ক্ষমতা, কি তাহাদের করা উচিত সমস্ত বিষয় লইয়াই আলোচনা সেখানে হইয়া থাকে।

নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় লেখাপড়া সহ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সব বিষয়গুলিই হইতেছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র। গণতান্ত্রিক নীতিতে শিক্ষক ও শিশুকে যখন বিদ্যালয় পরিচালন-ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তখন বিদ্যার্থী নিজের দায়িত্ব পালন করিতে যাইয়া এমন কিছু করিয়া বসিবে না যাহা বিদ্যালয়ের আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয়। বর্তমান নীতিতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, সমগ্র বিদ্যালয় একটি গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত সক্রিয় সমাজ। এই সমাজের যত কাজ সমস্তই শিক্ষক ও শিশু একত্রে মিলিয়া সম্পাদন করেন। বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ শিশুরাই করে। তাহারা পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখে, বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, বাগানের কাজ করে, বিদ্যালয়ের যাবতীয় জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখে, বিদ্যালয়-পত্রিকা সম্পাদন করে, লাইব্রেরীর কাজ পরিচালনা করে, বিদ্যালয়ের টিফিন বিতরণ করে, সমবায় ভাণ্ডার পরিচালনা করে ইত্যাদি। এই সমস্ত কার্য পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের সকল শিশুরা মিলিয়া একটি পরিষদ গঠন করে। এই পরিষদে তাহারা ভোটের সাহায্যে বিভিন্ন কার্য-দপ্তরের নেতা নির্বাচিত করে। সাধারণতঃ প্রধান নেতা, শ্রেণী নেতা, কৃষি নেতা, শিল্প নেতা, কৃষ্টি নেতা, স্বাস্থ্য ও সাফাই নেতা, লাইব্রেরী নেতা, ক্রীড়া নেতা, সমবায় ভাণ্ডার নেতা—এইরকম কয়েক জন নেতার সাহায্যে শিশুরা বিদ্যালয়ে যাবতীয় কার্য করিয়া থাকে। এই সকল কাজ সম্পাদন দ্বারা শিশুরা শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া থাকে।

প্রতি সালের জন্য পরিষদ-সভা হইতে নেতা নির্বাচিত হয় এবং নেতারা সেই মাসের জন্য বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজ অন্যান্য শিশুদের সাহায্য লইয়া করিয়া থাকে। নির্বাচনের সময় শিশুরা নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে আর পরিষদ-সভায় পরিষদের সভ্যরা মাসান্তে নেতাদের কার্যের সমালোচনা করে, সমালোচনা যাহাতে গঠনমূলক হয় সেই দিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখেন। শুধু তাহাই নয়, পরবর্তী নেতাগণ বর্তমান মাসের জন্য কোন্ নীতি অবলম্বন করিবে এবং কিভাবে পরিকল্পনা করিয়া বিদ্যালয়-সমাজের উন্নতিসাধন করিবে, সেই সম্বন্ধেও আলোচনা চলে। শিশুরা গণতান্ত্রিক সমাজে গরিষ্ঠসংখ্যক সভ্যদের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করিতে শিক্ষা করে, অথচ লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে অসম্মান করে না।

গণতান্ত্রিক মনোভাব কেবল শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষার সমস্ত ধারাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে, শিক্ষার আদর্শ বদলাইয়াছে।

বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক নীতির উপযোগিতা—অধুনাপ্রচলিত অনেক প্রগতিশীল শিক্ষানীতিতে বিদ্যালয় পরিশাসনে গণতান্ত্রিক রীতির প্রয়োগকে অভিনন্দিত করা হইয়াছে। কেবল অভিনন্দন নয়, ইহা প্রগতিশীল শিক্ষানীতির অঙ্গ বা পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিশাসনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের স্বায়ত্তশাসনকে মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসনের তথা গণতান্ত্রিক পরিশাসনের অনেক উপযোগিতা আছে। যেমন—

(১) বর্তমানকালে স্বীকার করা হইয়াছে শিক্ষা কেবল কতকগুলি তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান নয়, শিক্ষা জীবনকে নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। বিদ্যালয়ের নানা কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে বিদ্যার্থী জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হইবার সুযোগ পায়।

(২) তত্ত্বমূলক জ্ঞানের প্রয়োগসিদ্ধির উপরই শিক্ষার যাথার্থ্য নির্ভর করে। এই এই প্রযুক্তি সম্ভব হয় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সক্রিয় অংশ গ্রহণে। এইভাবে তাহার সে, বিভিন্ন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করিতে শিক্ষা করে ও শিক্ষা পূর্ণতা লাভ করে।

(৩) কৈশরে ও প্রথম যৌবনে শিশুর মনে কতকগুলি চাহিদা দেখা দেয়। যেমন—নেতৃত্বের চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, নূতনত্বের চাহিদা ইত্যাদি। বিদ্যালয় পরিচালনায় অংশে গ্রহণের ফলে তাহার সে চাহিদার তৃপ্তি ঘটে ফলে তাহার বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

(৪) শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্তিই সব নয় তাহার ভবিষ্যৎ প্রস্তুতিও শিক্ষার আর এক উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার ফলে শিশু উত্তরকালে নানা জটিল পরিস্থিতিতে সঠিক পথ নির্ণয়, সমন্বয় সাধন ও সক্রিয় সমাধানে সমর্থ হইবে।

(৫) বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক অভ্যাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশ ঘটে। সহযোগিতা, আত্মনির্ভরতা, সেবাপরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, দায়িত্বশীলতা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণে সমৃদ্ধ হয়। সে সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে গড়িয়া উঠে।

(৬) বিদ্যালয়ের নানাবিধ কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে তাহার প্রকৃতিতে অনেক গুণের বিকাশ ঘটে। যেমন—নেতৃত্ব, সংগঠন-প্রতিভা, বাচনিক দক্ষতা, বাগ্মীতা, অফিস পরিচালনা, ভাণ্ডার পরিচালনা, হিসাব-সংক্রান্ত ইত্যাদি।

(৭) বিদ্যালয়-জীবনে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হওয়া ও অভ্যাসের দ্বারা সে গণতন্ত্রের মূল তাৎপর্য উপলব্ধি করে। পরবর্তীকালে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল কর্তব্যে প্রয়োজন হইলে সে সহজেই অংশ গ্রহণ করিতে বা নেতৃত্ব দিতে পারিবে।

(৮) বিদ্যালয় পরিশাসনে এবং গণতান্ত্রিক অভ্যাসে সিদ্ধ হওয়ায় শিশুর জীবন নূতন ভাবে গড়িয়া উঠে। তাহার ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে সে সামাজিক হইয়া উঠে। নাগরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় ও অভ্যাসসিদ্ধ হয়। পরে পরবর্তীকালে একজন দায়িত্বশীল সুনাগরিক হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

শাসন ও শৃঙ্খলা (Discipline)

বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলা কাহাকে বলে—সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ে শাসন-শৃঙ্খলা বজায় থাকিলে, ছাত্রগণ কিছুমাত্র গোলমাল বা পরস্পরের সহিত ঝগড়া-বিবাদ না করিলে, সেই স্কুলে সুশাসন রক্ষিত হইতেছে বলা হয়।

কিন্তু **শৃঙ্খলার অর্থ প্রাণহীন শাস্তি নয়।** সুতরাং শাস্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ থাকিলেই বিদ্যালয়ের সুশাসন রক্ষা হইয়াছে বলা যায় না। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় রাখা এক কথা নয়। ইহা শাস্তিভয়-প্রসূত আজ্ঞানুবর্তিতাও নহে এবং সকল সময় নিষেধাত্মকও নয়। **বিদ্যালয়ে যে অবস্থা বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইলে ছাত্রগণ স্বেচ্ছায় ও তৎপরতার সহিত শিক্ষকদের আদেশ পালন করিতে ও তাঁহাদের উপদেশমত কাজ করিতে প্রস্তুত হয়, নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল-প্রবৃত্তি দমন করিয়া পরস্পরের সহিত সংযত ও ন্যায্য ব্যবহার করিতে শিখে, আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত হয়, এবং সর্বোপরি স্বেচ্ছায় ও সতর্কতার সহিত বিদ্যালয়ের সমস্ত নিয়ম-ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে অভ্যস্ত হয়, তাহাকেই বিদ্যালয়ের সুশাসন বলে। সংক্ষেপে ইহাকে নিয়মানুবর্তিতা বলা যায়।** কারণ, ছাত্র-শিক্ষক সকলে নিয়মানুবর্তী হইলেই বিদ্যালয়ে পূর্ব-বর্ণিত অবস্থা বা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইবে এবং তাহার ফলে ছাত্রেরা শিক্ষকের আজ্ঞানুবর্তী হইবে, পরস্পরের সহিত ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করিবে ও আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে প্রবৃত্ত হইবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার প্রয়োজনীয়তা—বিদ্যালয়ে অনেক ছাত্র এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে। তাহারা যদি ঠিকভাবে পরস্পরের সহিত ব্যবহার না করে এবং কাহারও নির্দেশমত বা কোন নিয়মানুযায়ী কাজ না করে তবে বিদ্যালয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকিবে না। এমন কি, বিশেষ কোন মন্দ কাজ না করিয়াও তাহারা যদি এক এক জন এক এক ভাবে চলে তাহা হইলেও ঘোরতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার অভাব হইলে শিক্ষক সফলতার সহিত পাঠ দিতে পারিবেন না, ছাত্র পাঠে মনোযোগ দিতে পারিবে না, বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকগণের মধ্যে সহযোগিতা হইবে না ছাত্রগণ শিক্ষকদের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত হইবে না, যাহার যখন যাহা খুসী সে তখন তাহা করিবে এবং ফলে সমস্ত বিদ্যালয়ে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। **সুতরাং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় না থাকিলে বিদ্যালয় সুপরিচালনা বা বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদান কিছুতেই সম্ভব হইবে না।**

অপর দিকে **শিশুর চরিত্রগঠনের জন্যও শৃঙ্খলার প্রয়োজন কম নয়।** শিশু স্বভাবতঃই চঞ্চল, তাহার উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিও অত্যন্ত প্রবল, তাহার ইচ্ছাশক্তি

দুর্বল এবং তাহার ভালমন্দ বিচারশক্তিও নাই। সুতরাং তাহাকে শিক্ষকের নির্দেশ-মত বা বিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী চলিতে বাধ্য না করিলে সে ঠিক ভাবে চলিতে ও ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইবে না এবং তাহার চরিত্র গঠিত হইবে না।

ইহা ছাড়া সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা ভিন্ন কোন বড় কাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করিতে হইলে সকলকে কাহারও নেতৃত্বাধীনে চলিতে হয়, সৈনিকের ন্যায় কঠোরতার সহিত নিয়মপালন করিয়া নিজ নিজ কর্তব্য করিতে হয়। সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রথমে আদেশ পালন করিতে না শিখিলে আদেশ দানের ক্ষমতা লাভ করা যায় না। সুতরাং **বাল্য-জীবনে নিয়মানুগামিতা শিক্ষা না হইলে, ছাত্রগণ ভবিষ্যৎ জীবনে কাহারও নেতৃত্বাধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে পারিবে না।** বস্তুতঃ, একমাত্র শৃঙ্খলার অভাবেই আমাদের জাতীয় জীবনেরপ্রায় সকল ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যক্তিগত উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার অভাবে জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। জাতীয় জীবনের এই অভাব পূরণ করিয়া জাতিকে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর করিতে হইলে আমাদের বিদ্যালয়সমূহে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এবং বাল্যকাল হইতেই ছাত্রগণকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে হইবে।

বিদ্যালয়-শাসন সম্বন্ধে প্রাচীন ও বর্তমান ধারণা

সেকালে বিদ্যালয়সমূহে দমন-নীতির প্রচলন ছিল। বেত্রই বিদ্যালয়-শাসনের প্রধান যন্ত্র ছিল এবং তাহা মুক্তহস্তে ব্যবহার করা হইত। প্রবাদ ছিল যে, "বেত্রের ব্যাপারে কার্পণ্য করিলে শিশুকে নষ্ট করা হয়।" (Spare the rod and spoil the child)। "ছাত্রের কান তাহার পিঠের উপর, তাহার পৃষ্ঠে ঘা না দিলে সে শুনে না।" (A boy's ear is on his back ; he does not listen if his back is not touched)।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই ইউরোপে বিদ্যালয়ের এই দমন-নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ শিশুকে অধিকতর সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে থাকেন এবং বেত্রের ব্যবহার না করিয়া অন্য উপায়ে শিশুকে পরিচালিত করিবার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তখন **ছাত্রের উপর শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করিয়া এবং বিদ্যালয়ে অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করিয়াই ছাত্রকে নিয়মানুবর্তী করিবার চেষ্টা আরম্ভ হয়।** অবশ্য বিদ্যালয় হইতে বেত্রকে একেবারে বিদায় দেওয়া হয় না, কিন্তু ইহার ব্যবহার যত দূর সম্ভব কম করিবার চেষ্টা হয়। ইংলণ্ডে Rugby বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার Dr. Arnold এই মতবাদীদের আদর্শ ছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সুশাসন সম্বন্ধে এই নীতিই প্রচলিত আছে।

কিন্তু কোন কোন শিক্ষাবিদ্ এই বিষয়ে আরও উদার মত পোষণ করেন। তাঁহারা শিশুকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষপাতী। **তাঁহাদের মতে যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র অন্য কাহারও কাজে বাধা না দেয় বা কাহারও অনিষ্ট না করে, ততক্ষণ তাহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।**

তাঁহারা শারীরিক শাস্তিদানের সম্পূর্ণ বিরোধী; এমন কি, ছাত্রের উপর শিক্ষকের বেশী প্রভাব বিস্তার করাও অন্যায় মনে করেন। Mr. Macmunn ও Dr. Montessorie এই দলের অগ্রণী। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে যে, এখনও এই মত শিক্ষক-সমাজে গৃহীত হয় নাই। তাঁহারা মনে করেন যে, আমাদের শিশুগণ এখনও সেইরূপ স্বাধীনতা উপভোগের যোগ্য হয় নাই। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, স্বাধীনতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা এক কথা নয়। চঞ্চলমতি শিশুগণকে সংযত থাকিতে এবং নিয়মানুবর্তী হইতে বাধ্য করিলে তাহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় না। ইহাও না করিলে শিশুগণ তাহাদের স্বাভাবিক চঞ্চলতাবশতঃই অসংযত ব্যবহার করিবে এবং বিদ্যালয়ের নিয়ম ভঙ্গ করিবে। তবে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, শারীরিক শাস্তি না দিয়াও শিশুদের সংযত রাখা যায় এবং নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়া যায়। সোভিয়েট রাশিয়ায় বিদ্যালয়সমূহে শারীরিক শাস্তিদান নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। ইহার সাহায্য ব্যতিরেকে ছাত্র ও অভিভাবকগণের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা-ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় শাস্তি ও পুরস্কার নীতিকে সম্পূর্ণ বর্জন করা হইয়াছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের প্রসারের ফলে শিশুর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার করা হইয়াছে। শিশুর সক্রিয়তার ফলে সে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়। তাহার অভিজ্ঞতা লাভের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া সক্রিয়তার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে শিশু নিজের তাগিদেই শিক্ষা লাভ করিবে এবং বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর হইবে।

বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়

(১) **বিদ্যালয় পরিচালনার ও বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।** বিদ্যালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে প্রথমে বিদ্যালয় সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রগণ যখন দেখে যে প্রত্যেক শিক্ষককে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী নিজ নিজ কর্তব্য করিয়া যাইতে হয়, তখন তাহারও স্বভাবতঃই নিয়মানুযায়ী তাহাদের কর্তব্যসাধনে রত হয়। তাহা ছাড়া তাহারা যখন বুঝিতে পারে যে, প্রধান-শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের সজাগ দৃষ্টি এড়াইয়া তাহারা কোন নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করিতে পারে না, তখন তাহারা স্কুলের নিয়ম ভঙ্গ করিতে সাহস করে না। অপর দিকে বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে অধিকাংশ ছাত্রই আগ্রহের সহিত জ্ঞানার্জনে রত হইবে, বিদ্যালয়ের নিয়মবিরুদ্ধ কোন কাজ করিতে তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না। অবশিষ্ট অল্প কয়েকজন ছাত্রকে শাসনের জন্যই অন্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। **সুতরাং বিদ্যালয় সুপরিচালনা ও বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা দানের সহিত বিদ্যালয় সুশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে**; বস্তুতঃ বিদ্যালয় সুপরিচালিত হইলে এবং সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলেই বিদ্যালয়ে সুশাসনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। যে-বিদ্যালয়ে সুশাসনের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়, অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সে বিদ্যালয় সুপরিচালিত নহে এবং তথায় সুশিক্ষাদানের ভাল ব্যবস্থা হয় নাই।

(২) **শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসনক্ষমতা**। সুপরিচালিত হইলে এবং বিদ্যালয়ে সুশিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইলে সুশাসনের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষকগণের, বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকের, উচ্চ ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতা না থাকিলে অনুকূল অবস্থায়ও বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষা হইতে পারে না। কেননা, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন-ক্ষমতার অভাব হইলে ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের নিয়মবহির্ভূত কাজ হইতে নিবৃত্ত বা শিক্ষকের নির্দেশমত জ্ঞানার্জনে রত না হইতে পারে। সুতরাং **শিক্ষকগণের বিশেষতঃ প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শাসন ক্ষমতা না থাকিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না।**

সুশাসকের গুণাবলী। সুশাসক হইতে হইলে **শিক্ষকের যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি ও উচ্চ-ব্যক্তিত্ব থাকা চাই**। তাঁহাকে ইতস্তত: ভাব পরিহার করিতে হইবে; তৎপরতার সহিত বিচার ও সিদ্ধান্ত করিবার এবং দৃঢ়তার সহিত আদেশ-দানের ও তদনুযায়ী কাজ করাইবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকা চাই।

কিন্তু তাঁহার নিজের ভুল স্বীকার করিবার সাহসও থাকিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমিবে না, বরং বাড়িবে। তাঁহার যথেষ্ট কর্মকৌশল (Tact) চাই। তৎপরতার সহিত সমস্ত দিক্ বিচার করিয়া এবং প্রত্যেক কাজের ভাবী ফল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত কর্মপন্থা নিরূপণ করিতে হইবে। তাঁহাকে ন্যায়পরায়ণ, সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য এবং **নিজে কঠোরতার সহিত নিয়মানুবর্তী হইতে হইবে**। নতুবা ছাত্রগণ তাঁহার সিদ্ধান্ত বা মীমাংসা অন্তরের সহিত মানিয়া লইবে না এবং অন্তরের সহিত তাঁহার আদেশমত কাজ করিবে না। তাঁহাকে খুব সংযত ও সহিষ্ণু হইতে হইবে। তাঁহার নিজের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব না থাকিলে তিনি ছাত্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন না। তাঁহার হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আছে এবং তিনি ছাত্রগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহার আত্মবিশ্বাস থাকা চাই। কিন্তু তাঁহাকে নিরর্থক ক্ষমতা প্রদর্শন না করিয়া শাসন করিবার কৌশলটি জানিতে হইবে। ছাত্রদের সহিত তাঁহার ব্যবহার সর্বদা সৌজন্য ও সহানুভূতিপূর্ণ হইবে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে বজ্রের মত কঠোরও হইতে হইবে। ছাত্রদের সহিত অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা তিনি যেমন বর্জন করিবেন, তেমনি তাহাদের প্রতি ঔদাসীন্য বা তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করাও যত্নের সহিত পরিহার করিবেন। কখনও তাহাদের সহিত ব্যঙ্গ বা হাস্যে যোগ দিবেন এবং কখন তাহা দমন করিবেন তাহা তাঁহাকে জানিতে হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে, **ছাত্রের সহিত শিক্ষক এমন ব্যবহার করিবেন যাহাতে তাহাদের মনে তাঁহার প্রতি যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও ভালবাসার ভাব জাগে**; তাঁহার অসন্তোষসূচক ভ্রূকুটিই যেন সর্বাপেক্ষা বড় শাস্তি এবং তাঁহার অনুমোদন-সূচক মৃদু হাস্যই যেন সবাপেক্ষা বড় পুরস্কার বলিয়া তাহারা মনে করে।

(৩) **নিয়ম প্রণয়ন ও নিয়ম পালন। ছাত্রগণকে নিয়মানুবর্তী করিতে পারিলেই বিদ্যালয়ে সুশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়**। এবং তাহাদিগকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে **তাহাদের পরিচালনার জন্য সুচিন্তিত নিয়মাবলী**

প্রণয়ন করিতে হইবে এবং সেগুলি তাহাদিগকে পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিতে হইবে। নিয়মগুলি ছাপাইয়া রাখিতে পারিলে এবং প্রত্যেক ছাত্রকে এক এক কপি দিতে পারিলে সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। কেননা রাষ্ট্রীয় আইনের বেলা অজ্ঞতার অজুহাতে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে না পারিলেও কোন ছাত্র প্রকৃত অজ্ঞতাবশতঃ বিদ্যালয়ের কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া যায় মাত্র।

বিদ্যালয়ের সুশাসনের নিয়মগুলি খুব চিন্তা ও যত্নের সহিত তৈয়ার করিতে হয়। নিয়মগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক নিয়ম প্রণয়নের সময় তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে কিনা ভালরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। ইহা ছাড়া যে নিয়ম প্রয়োগ করা যাইবে না, তাহা তৈয়ার করাও উচিত নয়। খুব বেশী নিয়ম প্রণয়ন করিলে ছাত্রগণের পক্ষে তাহা মনে রাখা বা অনুসরণ করা কঠিন হয়। নিয়মগুলি সাধারণ রকমের হইবে। খুব খুঁটিনাটি বিষয়ে নিয়ম তৈয়ার করিলে তাহা সকল সময় ও সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা যায় না। নিয়মগুলি সরল, সহজবোধ্য ও যুক্তিযুক্ত হওয়া চাই। অল্পবয়স্ক ছাত্রগণ নিয়মগুলির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে সেগুলি পালন করিতেও পারে না। নিয়মগুলি যুক্তিযুক্ত মনে হইলেই তাহারা আগ্রহের সহিত সেগুলি পালন করিবে।

কেবল সুচিন্তিত নিয়ম প্রণয়ন করিলেই যথেষ্ট হইবে না। সেগুলি **ছাত্রগণ যাহাতে নিষ্ঠার সহিত পালন করে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।** কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে প্রকৃতির শাস্তির ন্যায় অনিবার্য শাস্তি দিতে হইবে। এমন কি, তাহার ফলে কাহারও কোন ক্ষতি না হইলেও নিয়মের মর্যাদা রক্ষার জন্যও শাস্তি দিতে হইবে। নতুবা ছাত্রগণ সতর্কতার সহিত নিয়ম-পালনে অভ্যস্ত হইবে না।

(৪) **আদেশ দান।** আদেশ লিখিতও হইতে পারে, মৌখিকও হইতে পারে। সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেষকে কোন সাময়িক বিষয়ে মৌখিক আদেশ দেওয়া হয়। অনেক ছাত্রকে অনুরূপ অবস্থায় কোন কাজ করিবার নির্দেশ দিতে হইলে লিখিত আদেশ দেওয়া প্রয়োজন।

নিয়ম ও লিখিত আদেশের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিয়ম সকল সময়ে সকলের উপর প্রযোজ্য। লিখিত আদেশ কোন সময়ে, বিশেষ অবস্থায় এবং নির্দিষ্ট ছাত্র-গণের পরিচালনার জন্য দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া নিয়ম ও আদেশের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নাই। নিয়ম প্রণয়ন সম্বন্ধে যে-সকল মন্তব্য করা হইয়াছে সেগুলি লিখিত আদেশ দেওয়ার বেলাও স্মরণ রাখিতে হইবে।

(৫) **শিক্ষকের আদর্শ।** **"উপদেশ হইতে উদাহরণ বেশী মূল্যবান বা কার্যকরী"** এই সারগর্ভ বাক্যটি শিক্ষাক্ষেত্রেই সর্বাপেক্ষা বেশী খাটে। **শিক্ষকগণ নিজে কঠোরতার সহিত নিয়ম পালন করিয়াই ছাত্রদিগকে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা দিতে পারেন।** শিক্ষকেরা যদি প্রধান শিক্ষকের কর্তৃত্ব মানিয়া না চলেন, সৈনিকের ন্যায় তাঁহার নির্দেশমত কর্তব্য না করেন, ঠিক সময়ে

বিদ্যালয়ে না আসেন, ঠিক সময়ে শ্রেণীতে পাঠ দিতে না যান এবং অন্য যে সকল নিয়ম তাঁহাদের বেলায়ও প্রযোজ্য তাহা মানিয়া না চলেন, তবে সেই স্থলে সুশাসন রক্ষিত হইতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে, **প্রথমে শিক্ষকদের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত না হইলে ছাত্রদের মধ্যে শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।**

(৬) **প্রধান-শিক্ষকের তত্ত্বাবধান। প্রধান শিক্ষক সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর সজাগ দৃষ্টি না রাখিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না।** শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই যদি বুঝিতে পারে যে, তাহারা প্রধান শিক্ষকের চক্ষু এড়াইয়া কোন কাজ করিতে পারিবে না, তাহা হইলে কেহই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ করিতে সাহস করিবে না। অবশ্য শিক্ষকদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সহকারী প্রধান-শিক্ষককে সাহায্য করিতে হইবে এবং ছাত্রদের উপর দৃষ্টি রাখার কাজে সমস্ত শিক্ষকেরই তাঁহাকে সাহায্য করিতে হইবে। সমস্ত শিক্ষকের চক্ষে না দেখিলে তাঁহার পক্ষে সর্বদা সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইবে না।

(৭) **সর্বদা কার্যে নিয়োগ। "অলস লোকের মন শয়তানের কারখানা."** এই সারগর্ভ বাক্যটি স্কুল-শাসন ব্যাপারে সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। কেননা, শিশুগণ স্বভাবতঃই চঞ্চল। **তাহাদিগকেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে বলা ও তাহাদিগকে প্রাণহীন হইতে বলা একই কথা।** তাহাদিগকে কোন সময়ে কোন ভাল কাজে নিয়োজিত না করিলে তাহারা তখন মন্দ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে ; অন্ততঃ গোলমাল করিয়া সমস্ত বিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করিবে। সুতরাং সমস্ত স্কুল-সময়ে সমস্ত ছাত্রগণকে কাজে নিযুক্ত রাখিবার ব্যবস্থা না করিলে বিদ্যালয়ে সুশাসন বজায় থাকিবে না।

(৮) **ছাত্রদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা এবং বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দেওয়া।** "আমি অন্য কাহারো চেয়ে হীন নই, আমারও একটা মর্যাদা আছে এবং কোনরূপ অন্যায় বা ঘৃণ্য কাজ করা আমার পদমর্যাদার হানিকর," এইরূপ মনোভাবকেই আত্মসম্মান-জ্ঞান বলে। ছাত্রদের মনে এরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগাইতে পারিলে তাহারা আপনা হইতে অন্যায় কাজে নিবৃত্ত হইবে। অবশ্য নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এরূপ ভাব জাগান কঠিন। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণের মনে এরূপ আত্মসম্মান-জ্ঞান জাগরিত করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। "এরূপ কাজ অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্রের উপযুক্ত নয়" "অমুক শ্রেণীর কোন ছাত্র এরূপ কাজ করিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না,"—এ রকম মন্তব্যই সাধারণ অপরাধের জন্য যথেষ্ট শাস্তি। শ্রেণীর সকল ছাত্রকে শ্রেণীর সম্মান রক্ষা করার জন্য উৎসাহ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সকল শ্রেণীর ছাত্রগণকে বিদ্যালয়ের জন্য গৌরব অনুভব করিতে শিক্ষা দিলে, তাহার সাহায্যেও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরিত করা যায়। "অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্র কোন প্রকার অন্যায় বা হীন কাজ করিতে পারে না", "এরূপ কাজ অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রের উপযুক্ত নয়" ইত্যাদি মন্তব্য করিলে নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের মনেও আত্মসম্মান-বোধ জাগিবে।

বিদ্যালয়ে স্বায়ত্ত শাসন—শাস্তি এবং পুরস্কারের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে কার্যকরী শৃঙ্খলা আনা সম্ভব নয়। স্বভাবজাত বা অন্তর্জাত শৃঙ্খলার উদ্বোধন ঘটাইতে পারিলে শৃঙ্খলামূলক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

বিদ্যালয়ে প্রাত্যহিক পরিচালনার কার্যে ছাত্র সহযোগিতা শৃঙ্খলা রক্ষায় অনেক সাহায্য করে। বিদ্যালয় পরিচালনায় শ্রেণীসংস্থাপনে, ঘণ্টা দেওয়া, পরিচ্ছন্নতা বিধান, উৎসব অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ও পরিচালনা এক কথায় বিদ্যালয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ছাত্র কর্তৃত্ব বিদ্যালয়কে সুশৃঙ্খলে চলিতে সাহায্য করে।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে বাস্তবতা জ্ঞানের পরিচয় মিলে বুনিয়াদী পদ্ধতিতে। বিদ্যালয় পরিবেশকে এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে, যাহাতে ইহা একটি আদর্শ সমাজে পরিণত হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেই সমাজের সক্রিয় সভ্য এবং উভয়েই এই সমাজের পুষ্টির জন্য কাজ করিবেন। এই সমাজের প্রতিটি কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ গ্রহণ করিবেন। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে সমাজের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব লইবে। তাহারা যৌথভাবে পরিকল্পনা করিবে, নির্বাচিত নেতার নেতৃত্বে কাজ করিবে। এমন কি, বিদ্যালয় পরিচালনার কাজেও অংশ লইবে। ফলে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক কাজের বিরুদ্ধে তাহাদের কোনও রূপ মনোভাব গড়িয়া উঠিবার অবকাশ থাকিবে না।

শ্রেণী শৃঙ্খলা—শ্রেণী শৃঙ্খলা বিদ্যালয়ের সামগ্রিক শৃঙ্খলার সঙ্গে জড়িত। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা থাকিলে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেণী-শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ে সুস্থ পরিবেশ থাকিলে এবং ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্পর্ক গড়িয়া উঠিলে শ্রেণী-বিশৃঙ্খলতার অবকাশ থাকে না। তথাপি শ্রেণীর কতকগুলি বিশেষ সমস্যা থাকে এবং সেইজন্য নিম্নরূপ বিশৃঙ্খল আচরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, গোলমাল করে, নড়া-চড়া করে।

(২) শিক্ষককে বিরক্ত, বিব্রত ও বিদ্রূপ করিবার প্রবণতা দেখা যায়।

(৩) শিক্ষকের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে।

এ ছাড়া আরও নানাবিধ উপায়ে শ্রেণী-শৃঙ্খলা ব্যাহত হইতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যাইতে পারে :—

শ্রেণীতে শৃঙ্খলা রক্ষার উপায়

(১) **শ্রেণী-কক্ষে ভাল আলো-বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা এবং ছাত্রদের ভালভাবে বসিবার ব্যবস্থা।** ইহার প্রয়োজনীয়তা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সুব্যবস্থা না হইলে ছাত্রগণ অস্বস্তি অনুভব করিবে ও চঞ্চল হইয়া সুশাসন নষ্ট করিবে।

(২) **ছাত্রগণের ঠিকভাবে উপবেশন ও শ্রেণী-ব্যায়াম।** পাঠদান আরম্ভ করিবার পূর্বে শ্রেণীর ছাত্রগণ ঠিকভাবে বসিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। ঠিকভাবে না বসিয়া থাকিলে প্রথমেই তাহাদিগকে **নিজ নিজ নির্দিষ্ট আসনে**

বা স্থানে সোজা হইয়া বসিতে আদেশ দিতে হইবে। যদি শ্রেণীতে বিশেষ বিশৃঙ্খলা বা গোলমাল হয় তবে পাঠদান স্থগিত রাখিয়া ছাত্রগণকে দাঁড়াইতে এবং ২।১ মিনিট **শ্রেণী-ব্যায়াম করিতে আদেশ** দিলে বিশৃঙ্খলা অনেকটা দূর হইবে। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রেণীতে শৃঙ্খলা স্থাপন না করিয়া পাঠদান আরম্ভ করা কিছুতেই উচিত নয়।

(৩) **শিক্ষকের ঠিক স্থানে অবস্থান।** শিক্ষক শ্রেণীর সামনে এমন স্থানে দাঁড়াইবেন বা আসন গ্রহণ করিবেন যেন তিনি সমস্ত ছাত্রের মুখ দেখিতে পারেন এবং তাহারা যেন কখনও তাঁহার দৃষ্টির বাইরে যাইতে না পারে। এইজন্য শিক্ষকের আসন কিছু উচ্চ হওয়াও উচিত।

(৪) **আনন্দদায়ক ও সজীব ভাবে পাঠদান।** পাঠদান আনন্দদায়ক ও সজীব হইলে ছাত্রগণের মন তাহাতে আকর্ষিত হইবে এবং আবদ্ধ থাকিবে। সুতরাং কোনরূপ গোলমাল করিবার তাহাদের প্রবৃত্তিই হইবে না। **ভাল পাঠদানের ব্যবস্থা না করিয়া শ্রেণীতে সুশাসন বজায় রাখা যায় না।** কেননা তাহার অভাব হইলে কেবল শাস্তির ভয়ে ছাত্রগণ চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে এবং সেইরূপ প্রাণহীন শান্তিকে সুশাসন বলা যায় না।

(৫) **সর্বদা কর্মে নিয়োগ রাখা।** চঞ্চলমতি শিশুগণ অল্পক্ষণও চুপচাপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, তাহাদের হাতে কোন কাজ না থাকিলে তাহারা গোলমাল করিবে। সুতরাং **তাহাদিগকে সর্বদা কার্যরত রাখাই শ্রেণী-শাসনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।** কেননা তাহা হইলে তাহারা গোলমাল করিয়া শ্রেণীর শাসন-শৃঙ্খলা নষ্ট করিবার কোন অবসরই পাইবে না।

(৬) **চক্ষুর শাসন।** শ্রেণীতে কোন কাজ দিলেই যে সকল ছাত্র কার্যরত থাকিবে তাহা নয়। তাহাদের উপর শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না থাকিলে তাহারা কার্যে অবহেলা করিয়া পরস্পরের সহিত কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইতে পারে বা গোলমাল করিতে পারে। তাই **চক্ষুকে শ্রেণী-শাসনের সর্বাপেক্ষা কার্যকরী যন্ত্র বলা হয়।** যে ছেলে আগ্রহের সহিত কাজ করিতেছে তাহার প্রতি **অনুমোদনসূচক দৃষ্টি** নিক্ষেপ করিলে সে উৎসাহিত হইবে। যে ছাত্র লুকাইয়া কোন সাধারণ অন্যায় কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার **মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন** করিয়া শিক্ষক মৃদুহাস্য করিলে সে লজ্জা পাইবে ও সেই কাজ হইতে নিবৃত্ত হইবে। কোন ছাত্র বিশেষ অন্যায় কার্য করিবার চেষ্টা করিলে **ভ্রূকুটির** সাহায্যে তাহাকে শাসন করা যায়। ছাত্রের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিলে সে পাঠে অমনোযোগী হইলেও ধরা পড়িবে। বস্তুতঃ চক্ষুর ভাল ব্যবহার করিতে পারিলে এবং সমস্ত শ্রেণীর উপর সজাগ দৃষ্টি রাখিলে সাধারণতঃ একমাত্র তাহার সাহায্যেই শ্রেণীতে সুশাসন রক্ষা করা যায়।

(৭) **প্রশ্ন।** কোন ছাত্র পাঠে অমনোযোগী হইয়াছে বা গোলমাল করিতেছে দেখিলে তাহাকে বর্ণিত বিষয়ে একটা প্রশ্ন করিলে সে উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইবে। কোন ভাল ছাত্র যদি অহঙ্কারবশতঃ পাঠে অমনোযোগী হয় বা উদ্ধত

ব্যবহার করে, তাহাকে একটা **কঠিন প্রশ্ন** করিয়া তাহার জ্ঞানের সীমা দেখাইয়া দিলে সে লজ্জা পাইবে ও নম্র হইবে।

(৮) **কিছুক্ষণের জন্য পাঠ স্থগিত ও শ্রেণী পর্যবেক্ষণ**। যদি পাঠদানের সময় দেখা যায় যে, শ্রেণীর অনেক ছাত্র পাঠে মনোযোগী না হইয়া পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহার ফলে শ্রেণীতে গোলমালের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে হঠাৎ পাঠ বন্ধ করিয়া শিক্ষক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করিতে থাকিলে ছাত্রগণ সচকিত হইয়া পরস্পরের সহিত কথা বলা বন্ধ করিবে এবং শ্রেণীতে শান্তি স্থাপিত হইবে।

(৯) **অপরাধী ছাত্রগণের নাম লেখা**। যে সকল ছাত্র কোনরূপ গোলমাল করে তাহাদের নাম লিখিবার ভার মনিটরের উপর দেওয়া যাইতে পারে। কোন ছাত্রের নাম বার বার এই তালিকায় স্থান পাইলে তাহার সম্বন্ধে ব্যবহারের খাতায় মন্তব্য করা হইবে ইহা জানাইয়া দিলে বা তাহাকে পরে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে খুব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রও ভয় পাইবে ও সংযত হইবে।

(১০) **আদেশ দান ও ভৎর্সনা**। পাঠদানের সময় শ্রেণী-শাসনের জন্য জিহ্বার ব্যবহার যতদূর কম হয় ততই ভাল। কেননা তাহাতে শিক্ষকের পাঠ-বর্ণনায় এবং ছাত্রগণের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া দেখা যায় যে, বার বার ছাত্রগণকে "চুপ কর" "গোলমাল কোরো না" ইত্যাদি আদেশ দিতে থাকিলে তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয় না। একটু পরেই তাহারা পুনঃ গোলমাল করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং **পাঠদানের সময় জিহ্বার ব্যবহার না করিয়া যত দূর সম্ভব চক্ষুর সাহায্যে শাসনের চেষ্টা করা উচিত**। একান্ত প্রয়োজন হইলে **অমনোযোগী বা গোলমালকারী ছাত্রের নামোচ্চারণ** করিলেই সে সাবধান হয় ও শান্ত হয়। ইহাতে ফল না হইলে ছাত্রবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু ভৎর্সনা করা যাইতে পারে। কিন্তু সমস্ত শ্রেণীকে ভৎর্সনা করা কিছুতেই উচিত নয়। কেননা ইহাতে প্রকৃত দোষীকে শাসন করা হয় না, অনেক নির্দোষ ছাত্র শাস্তি পায়। আদেশের সংখ্যা কম হওয়া উচিত এবং তাহা সাধারণতঃ নিষেধাত্মক না হইয়া নির্দেশাত্মক হওয়া উচিত। আদেশ দৃঢ়তার সহিত দিতে হইবে এবং ছাত্রেরা যেন তাহা তৎক্ষণাৎ কাজে পরিণত করে তাহা দেখিতে হইবে।

(১১) **শাস্তি**। পাঠদানের সময় কোন গুরুতর শাস্তি দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। **শারীরিক শাস্তি দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়**। কেননা তাহাতে ছাত্রের শরীর মন এতই বিচলিত হইয়া পড়ে যে, সে সহজে মনস্থির করিতে পারে না। ইহাতে জ্ঞানলাভের আনন্দ নষ্ট করে। পাঠের সময় শাস্তির ভয়ে শিশুর মন আড়ষ্ট হইয়া পড়িলে সে শিক্ষকের সহিত মানসিক সহযোগিতা করিতে পারে না এবং নিজের ভাবে কাজ করিতেও উৎসাহিত হয় না। তবে সময় সময় অল্প-বয়স্ক ছাত্র-ছাত্রীগণকে এই প্রকারের শাস্তি দেওয়া যায়। যথা—দুইজন ছাত্র বার বার কথা বলিতেছে দেখিলে তাহাদিগের মধ্যে একজনকে স্থানান্তরিত করা যায়; পড়া না শেখার জন্য বা অমনোযোগিতার জন্য কোন ছাত্রকে শ্রেণীর পেছনে দাঁড়াইয়া পাঠ গ্রহণ

করিতে দেওয়া যায়; কোন অন্যায় কার্য করিলে তথায় কানে ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা যায়; কোন ছাত্র গোলমাল করিয়া পাঠদানে বা অন্য ছাত্রদের পাঠে মনোযোগ দানে বাধার সৃষ্টি করিলে এবং পূর্ব-বর্ণিত কোন উপায়ে তাহাকে সংযত করিতে না পারিলে তাহাকে দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া পুস্তক পাঠ করিতে দেওয়া যায়; পাঠ বা গৃহকার্যে অবহেলা করার জন্য স্কুল ছুটির পর আটক রাখিয়া কোন কাজ করিতে দেওয়া যায়।

(১২) **গুরুতর অপরাধের শাস্তি**। যদি কোন ছাত্র পাঠদানের সময়ও গুরুতর অপরাধ করে; যথা—শিক্ষকের সামনে অন্য ছাত্রকে গালি দেয় বা প্রহার করে, শিক্ষকের আদেশ অমান্য করে বা তাঁহার কর্তৃত্ব অস্বীকার করে, তবে পাঠদান কিছুক্ষণ স্থগিত রাখিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তিদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কারণ শ্রেণীতে শিক্ষকের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখিতে না পারিলে তিনি শ্রেণীতে শাসন করিতেও পারিবেন না এবং শিক্ষা দিতেও পারিবেন না। তবে সহজে ইহা করা উচিত নয়, শিক্ষকের কর্তৃত্ব রক্ষার শেষ উপায় হিসাবেই ইহা অবলম্বন করিতে হয়।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

স্বাস্থ্য শিক্ষা

অনাধুনিক কালে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। শিক্ষা বলিতে প্রধানতঃ মানসিক উন্নতির কথাই বলা হইত। শিশু যাহাতে উন্নতবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতসম্পন্ন হইতে পারে, শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে সেইজন্য অনুরূপ বিষয় ও পদ্ধতি অনুসৃত হইত। যদিও দেহকে সুস্থ রাখিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হইত তথাপি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষার অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। পুস্তকপাঠ ও জ্ঞানার্জনই ছিল শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেইজন্য দৈহিক পীড়ন ও শারীরিক বঞ্চনাকেও স্বীকার করিয়া লওয়া হইত। শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন, রাত্রি জাগরণ, সব রকমের ব্যায়াম না করা, আনন্দোৎসব বর্জন ইত্যাদি ভাল ছাত্রের লক্ষণ বলিয়া মনে করা হইত।

যদিও পরবর্তী যুগে শিক্ষার লক্ষ্য বলিতে শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের কথা বলা হইয়াছে, তথাপি শারীরিক বিকাশের স্তর, স্বাস্থ্যবিধি, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অভাবে এবং বিদ্যালয়ে কিভাবে স্বাস্থ্য-শিক্ষা সম্ভব জানা না থাকায় স্বাস্থ্যবিদ্যাকে বিদ্যালয়ে শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

আধুনিক যুগে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে শারীরবিদ্যা ও স্বাস্থ্যবিদ্যা সম্পর্কে এবং রোগ আক্রমণের প্রতিরোধ ও প্রতিষেধক অনেক পদ্ধতি নিরূপণের ফলে গণস্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। ফলে ইহার প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সুঅভ্যাস গঠন ও স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। সেইজন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

পৃথিবীতে গণতন্ত্রের প্রসারের ফলে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব যেমন সকলের উপর বর্তাইয়াছে, তেমনই রাষ্ট্রের প্রতিটি মানুষের সর্ববিধ কল্যাণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্যবিধ কল্যাণের সঙ্গে তাহাদের শরীর নীরোগ ও স্বাস্থ্য ভাল রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের অনেক বিভাগ আছে। কিন্তু বিদ্যালয় হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সত্যকার শিক্ষা সম্ভব হয় না। সেই জন্য বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্র একটি পবিত্র সামাজিক কর্তব্যের সূচনা করে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার স্বরূপ—বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমরা কি বুঝি তাহা জানা দরকার। স্বাস্থ্য কথাটির একটি সুসংহত ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য অর্থে বলা হইয়াছে "Health is that state in which the individual is able to mobilize all his resources, intellectual, emotional and physical—for optimum daily

living". অর্থাৎ স্বাস্থ্য হইল একটি অবস্থা—যাহা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও প্রাক্ষোভিক শক্তিকে সুসংহত করে, উদ্দীপিত করে, বিকশিত করে। আমাদের আচরণকে সুসংহত করিয়া পূর্ণভাবে জীবন যাপনের সুবিধা করে। আমাদের শাস্ত্রে একটি কথা আছে 'শরীরম্ আদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্'। অর্থাৎ শরীর হইল প্রথম বস্তু, শরীর ভাল হইলে তবে ধর্মসাধনা সম্ভব। তেমনই জ্ঞানার্জন, নৈতিকতা, সামাজিকতা, প্রাক্ষোভিক অর্থাৎ মানবজীবনের মূল শক্তিগুলির সুসংহত বিকাশ তখনই সম্ভব হয় যদি শরীর সুস্থ, সক্রিয় ও নীরোগ থাকে। সুতরাং স্বাস্থ্য শব্দের অর্থ বহু ব্যাপক, কেবল নীরোগ শরীরই নয়—ব্যক্তিসত্তার সুসমঞ্জস সর্বতোমুখী বিকাশের উপযোগী অবস্থাকে বুঝায়।

স্বাস্থ্য কথাটির এই ব্যাপক সংজ্ঞা হেতু স্বাস্থ্য-শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণের শিক্ষা নয় পরিবেশগতভাবে সমাজের স্বাস্থ্যের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাস্থ্য জড়িত, অতএব সামাজিক স্বাস্থ্যশিক্ষার কথাও চিন্তা করিতে হইতেছে। কারণ ব্যক্তিকে লইয়া সমাজ। সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন প্রতিটি ব্যক্তির সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন, আবার তেমনি সামাজিক স্বাস্থ্যশিক্ষা-ব্যবস্থা থাকিলে তাহার প্রভাব ব্যক্তিসত্তার উপর বর্তাইবে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার স্বরূপ বিচারে ইহার তিনটি স্তরের বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য। প্রথমতঃ, স্বাস্থ্যবিধি হিসাবে তাত্ত্বিক জ্ঞান। প্রাথমিক পর্যায়ে অবশ্য শিশুকে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য শিক্ষা দিতে হইবে। এই জ্ঞান তাহার আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাহার প্রাপ্তজ্ঞান ও আচরণের ফলে তাহার মনে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে ধারণা একটি মূল্যবোধ গড়িয়া উঠে। তৃতীয় পর্যায়ে তাহার নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়িয়া উঠে ও তাহার আচরণে পরিবর্তন আনে। আচরণে কোন পরিবর্তন না হইলে তত্ত্ব হিসাবে স্বাস্থ্য-শিক্ষার কোন যৌক্তিকতা নাই। স্বাস্থ্য-শিক্ষা ব্যক্তিকে সুসংহত জীবনযাপনে ও তাহার শক্তিগুলির বিকাশে সাহায্য করে।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখাই হইল স্বাস্থ্য-শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, কি রকম খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করিলে এবং কি রকম স্থানে ও কি রকম গৃহে বাস করিলে এবং কিরকম জীবন যাপন করিলে আমাদের শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম থাকিবে। তাহা ছাড়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ করিলে আমরা উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অনেক কঠিন রোগের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারি, এমন কি সাধারণ শারীরিক অসুস্থতার প্রাথমিক চিকিৎসাও করিতে পারি এবং নানা সংক্রামক রোগের বিস্তার বন্ধ করিতে পারি। এক কথায় বলিতে গেলে স্বাস্থ্যরক্ষাই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠের একমাত্র উদ্দেশ্য।

যে শিক্ষা আমাদের দেহকে সুস্থ, সবল, নীরোগ ও সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলে, তাহাই স্বাস্থ্য-শিক্ষা। সুন্দর জীবন যাপনের জন্য সুন্দর আচরণ ও সুঅভ্যাস গঠনের শিক্ষা আমরা স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমেই লাভ করিতে পারি। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

ও গণস্বাস্থ্য সংরক্ষণের নিয়মাবলীর শিক্ষা বিদ্যালয়-জীবন হইতেই দিবার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

শিশু বিদ্যালয়ে আসে তাহার বিকাশের জন্য। যেমন লেখাপড়া, অর্থাৎ বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ, তেমনই শারীরিক ও নৈতিক বিকাশও অবশ্যকাম্য। আজিকার শিশু ভবিষ্যতের নাগরিক। কাজেই ভবিষ্যৎ নাগরিকরা দেহ ও মনে সুস্থ ও সবল হইবে, সমাজকে পরিচ্ছন্ন করিয়া গড়িয়া তোলার মত মনোভাব-সম্পন্ন হইবে—ইহা সকলের কাম্য। বিদ্যালয় শিশুশিক্ষার দায়িত্ব লইয়াছে। সুতরাং ভবিষ্যৎ নাগরিকের উপযুক্ত সুঅভ্যাস গঠনের দায়িত্ব তাহার।

সেইজন্য স্বাস্থ্য-শিক্ষার গোড়ার কথা হইল শিশুকে নীরোগ, কর্মক্ষম ও সুস্থ শরীর বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয় নীতি-নিয়ম শিক্ষা দেওয়া। ব্যক্তিস্বাস্থ্য সুরক্ষার নিয়মাবলী পালন করা, যেমন, (১) প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিত মুখ ধোওয়া ও পরিষ্কার করা, (২) দাঁত মাজা, (৩) চোখ পরিষ্কার করা, (৪) কান পরিষ্কার করা, (৫) চুলের যত্ন করা, (৬) নিয়মিত নখ কাটা ও পরিষ্কার রাখা, (৭) স্নান করা ও দেহ পরিচ্ছন্ন রাখা, (৮) পরিধেয় কাপড়-চোপড় নিয়মিত পরিষ্কার করা, (৯) নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, (১০) নিয়মিত মলমূত্র ত্যাগ করা, (১১) বিভিন্ন ব্যাধির আক্রমণের কারণ জানা ও তাহা হইতে মুক্ত থাকা, (১২) পরিমিত বিশ্রাম করা ইত্যাদি।

(খ) শরীরের সঙ্গে মনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। স্বাস্থ্য-শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্যবিধি পালনের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা, যাহাতে তাহার মানসিক অসঙ্গতি দেখা না দেয়। পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম ইত্যাদির দ্বারা শরীর সুস্থ থাকিলে তাহার প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি দেখা দিবে না। জীবনের ক্ষেত্রে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রক্ষোভমূলক আচরণের সঙ্গে সামাজিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দেহ ও মনে সুস্থ থাকে। কাজেই তাহার সামাজিক সম্পর্কও মধুর ও সঙ্গতিপুর্ণ হয়। তাহা ছাড়া সুষ্ঠু ও সঙ্গত সামাজিক আচরণ শিক্ষাও স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(গ) ব্যক্তিস্বাস্থ্য রক্ষা প্রাথমিক কর্তব্য হইলেও গণস্বাস্থ্যের উপর ব্যক্তিস্বাস্থ্যও কিছুটা নির্ভরশীল। কাজেই শিক্ষার্থী কেবল নিজেই স্বাস্থ্যবিধি পালন করিবে তাহা নয়, পরিবেশ যদি সুন্দর না হয় তাহা হইলে সামাজিক স্বাস্থ্য ভাল হয় না। বিদ্যালয়ে শিশুরা নিয়মিত সাফাই ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশকে সুন্দর করিয়া তুলে। নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার, পানীয় জলের ব্যবহার, বসন্ত কলেরার টীকা নেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ রচনার উপযোগী মনোভাবসম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠে। তাহা ছাড়া তাহারা কেবল নিজের স্বাস্থ্য ভাল করাই নয়, তাহা দ্বারা যাহাতে অন্যের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না হয়, দেখিবে।

বিদ্যালয়কে আমরা একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করি। তাই সম্মিলিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা উচিত। স্বাস্থ্য-শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যেক শিশু যদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অভ্যাস শেখে তাহা হইলে জনস্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব সহজ হয়।

(ঘ) বর্তমানকালে জীবন অত্যন্ত জটিল হইয়াছে। শরীর ও মনকে সুস্থ রাখিতে হইলে স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত শিক্ষা অত্যাবশক। শরীর যন্ত্রের কাজ, সেইগুলিকে সচল ও কর্মক্ষম রাখিবার নিয়মাবলী, দুর্বল হইলে প্রতিকারের উপায় সম্পর্কে অনেক গবেষণা হইয়াছে। সুস্থ ও সবল জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেকের ঐ সব নিয়ম কানুন জানা আবশ্যক। স্বাস্থ্য-শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ঐ সব নীতি নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবহিত করান হয়।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির সম্বন্ধে অজ্ঞতাই যে আমাদের দেশবাসীর স্বাস্থ্য-হানির ও অনেক রোগভোগের প্রধানতম কারণ, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। এই অজ্ঞতার জন্যই আমরা অনেক সময় সুলভ পুষ্টিকর খাদ্য না খাইয়া, মুখরোচক দুষ্পাচ্য ও স্বাস্থ্যহানিকর খাদ্য খাইতে ভালবাসি, দূষিত খাদ্য, পানীয় গ্রহণ করিয়া রোগাক্রান্ত হই, আমাদের বাসের জন্য বহু ব্যয়ে অস্বাস্থ্যকর গৃহ নির্মাণ করি, বাসস্থানের চারিদিকে অস্বাস্থ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করি, উপযুক্ত উপায় অবলম্বন না করিয়া নানা মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হই। শত শত প্রসূতি ও শিশু অকালে মারা যায় এবং অনেকে স্বাস্থ্যহীন, শক্তিহীন, উদ্যমহীন, আনন্দহীন হইয়া কাল কাটায়। সুতরাং আমাদের দেশে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী।

স্বাস্থ্য-শিক্ষায় বিদ্যালয়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুশিক্ষার ভার বিদ্যালয়ের উপর। ব্যাপকভাবে দেখিলে দেশের ভবিষ্যৎ সুনাগরিক তৈরীর দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। কাজে কাজেই মানসিক সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শারীরিক বিকাশের দিকেও যত্ন লইবে। কারণ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী না হইলে কোন ব্যক্তি বা জাতি বড় হইতে পারে না। সেইজন্য বাল্যকাল হইতেই শিশুদের স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে। দেহ যেমন তাহাদের নমনীয় থাকে, মনও তেমনি কুসুম কোমল। সেই অবস্থায় যদি তাহাদের সুন্দর জীবন যাপনের নিয়মাবলী মনের মধ্যে গাঁথিয়া দেওয়া যায় এবং সুঅভ্যাস গঠন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিদ্যালয় একটি বড় কর্তব্য সাধন করিবে।

(৩) বিভিন্ন পরিবেশ হইতে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে একত্র সমবেত হয়। বিভিন্ন আর্থিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ হইতে তাহারা আসে। প্রত্যেকের অভ্যাস, আচার আচরণ পৃথক্। কেউ পরিচ্ছন্ন কেউ বা অপরিচ্ছন্ন থাকিতে চায়। নানা রোগাক্রান্ত শিশুও যে না আসে তাহা নয়। এতগুলি শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুঅভ্যাস গঠন সহজ কাজ নয়। প্রত্যেকটি শিশুকে যেমন স্বাস্থ্যবিধির তাত্ত্বিক ধারণা দিতে হইবে, তেমনই বিদ্যালয়ে স্বাস্থবিধি পালনের একটি ন্যূনতম কর্মসূচীর অভ্যাস করাইতে হইবে। ব্যায়াম, খেলাধূলা ছাড়াও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, দাঁত, চুল, নখ পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিষ্কার পোশাক পরা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া সাধারণ পাঁচড়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করাও বিদ্যালয়ের কর্তব্য।

(৪) 'আপনি আচরি ধর্ম অন্যেরে শিখায়'—আপ্তবাক্যের মত বিদ্যালয়-পরিবেশ পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর করিতে হইবে। শিক্ষক ও কর্মচারীরা বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিবেন। ফলে শিশু ইহাদ্বারা প্রভাবিত হইবে ও স্বাস্থ্য-বিধি পালনে তাহার মানসিক গঠন সম্পূর্ণ হইবে।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষা পদ্ধতি

(১) সকল সময় বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। তাহা না করিয়া আমাদের বিদ্যালয়ে কেবল পুস্তকের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয় বলিয়া ইহা তেমন কার্যকর হয় না। শরীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য আমাদের কি কি নিয়ম পালন করা উচিত, শরীর পোষণের জন্য আমাদের কি রকম খাদ্য খাওয়া উচিত, বিভিন্ন রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমাদের কি কি উপায় অবলম্বন করা উচিত ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তব-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) যতদূর সম্ভব বাস্তব দৃষ্টান্ত, কাজ বা অবস্থা দেখাইয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া উচিত। যেমন—কাঁচের গ্লাশে দূষিত ও পরিষ্কার জল রাখিয়া জলের পার্থক্য প্রদর্শন—অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূষিত জলের কীটাণু প্রদর্শন, গ্রাম্য পুষ্করিণীর কাছে লইয়া গিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের জল দূষিত হইবার কারণ শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

(৩) যে সকল বিষয় কার্যতঃ প্রদর্শন সম্ভব নয়, তাহাদের মডেল বা ছবি দেখাইয়া ছাত্রদের বিষয়টি বুঝাইতে হইবে। ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন, এপিডায়োস্কোপের সাহায্যে ছবি দেখাইয়া বুঝাইলে আরও হৃদয়গ্রাহী হইবে।

(৪) যে সময়ে যে সকল নিয়ম পালন করা প্রয়োজন সে সময় সেই সকল নিয়ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলে ছাত্রগণ তাহা মনোযোগের সহিত শিক্ষা করে। যথা—বিভিন্ন ঋতুতে যে সকল প্রাদুর্ভাব হওয়ার সম্ভাবনা, তাহাদের নিবারণের উপায়, রোগী শুশ্রূষার নিয়ম ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত।

(৫) নিম্ন শ্রেণীতে স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের নিয়মগুলি ব্যাখ্যা ও বর্ণনার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রথমেই তাহাদের কারণ শিক্ষা দেওয়া যায় না। উচ্চ শ্রেণীতে কারণ শিক্ষা দেওয়া যায়।

(৬) স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন। স্বাস্থ্যবিধি শিক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালনের ব্যবস্থা করিয়া ছাত্রগণের যত বেশী সম্ভব স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গঠন করিয়া দিতে হইবে। ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যবিধি পালন করিতেছে কিনা, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হইবে। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান অনুমোদিত জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত করাই স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রধান উপায় ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

(৭) সময় সময় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। পরীক্ষায় কাহারও কোন রোগ ধরা পড়িলে অভিভাবকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া তাহার প্রতিকার করা কর্তব্য।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার পাঠ্যক্রম

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য একটি সুপরিকল্পিত পাঠ্যক্রমের প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে। এই পাঠ্যক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।

(১) স্বাস্থ্যবিধির জ্ঞান অর্জনমূলক তথ্য। সুস্বাস্থ্যের জন্য কি কি করণীয়, রোগ প্রতিকার, সুষম খাদ্য, প্রাথমিক চিকিৎসা, গণস্বাস্থ্য ইত্যাদি আধুনিক বিষয় সম্বন্ধে তথ্যাদি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা থাকিবে।

(২) স্বাস্থ্যবিধিসম্মত অভ্যাস গঠন। কেবল তত্ত্বমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে চলিবে না—সুঅভ্যাস গঠনের উপযোগী ব্যবস্থা থাকিবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, নিয়মিত স্নান, দাঁত মাজা, চোখ, কান, চুলের পরিচর্যা, বসা, চলা ও শোয়ার স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাস গঠন, সংক্রামক রোগ সম্পর্কে সচেতন হওয়া, নিয়মিত টীকা নেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকিবে।

(৩) সামাজিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে মনোভাব গঠনের উপযোগী ব্যবস্থা থাকিবে। কেবল তত্ত্বগত নয়, ব্যবহারিক দিক দিয়াও গণস্বাস্থ্য রক্ষার অভ্যাস গঠনের সুযোগ পাঠ্যক্রমে থাকিবে।

(৪) স্বাস্থ্যশিক্ষার পাঠ্যক্রমে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। পথেঘাটে কিভাবে চলিলে দুর্ঘটনা হইতে নিস্তার পাওয়া যাইবে, আগুন ইত্যাদি কিভাবে প্রতিরোধ করা যাইবে তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

(৫) সহ-পাঠ্যক্রমিক নানাবিধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

স্বাস্থ্য-শিক্ষার উপকরণ

পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে উপকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। নিম্ন-লিখিত উপকরণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। (১) পাঠ্যপুস্তক-তথ্য ও তত্ত্বমূলক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য। পর্যায়ক্রমিক ও সুসংহত শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীপাঠনায় সুনির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয়। শ্রেণী অনুযায়ী পাঠ্য-পুস্তক হইবে। (২) প্রদীপন—স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য বস্তু, মডেল, চার্ট, ফিল্ম, এপি-ডায়োস্কোপ, নাটক, বেতার, টেলিভিসন, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি অত্যন্ত কার্যকর। (৩) ইহা ছাড়া পরিবেশ পরিচিতিও একটি বিশেষ মাধ্যম। স্বাস্থ্য-শিক্ষার উপকরণ হিসাবে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হাসপাতাল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী দেখানোর ব্যবস্থা থাকিলে শিক্ষা অত্যন্ত কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানবদেহ

স্বাস্থ্যনীতি পালন কেবল সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত দিক্‌ও দেখিতে হইবে। সেইজন্য মানবদেহ গঠন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রাণীসর্গের মধ্যে মানুষের স্থান সর্বাগ্রে। বিধাতার সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ জীব হইল মানুষ। ইতিহাসের আলোচনায় জানা গিয়াছে, জীবসৃষ্টির শুরু হইতেই মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। জীবসৃষ্টির ধাপে ধাপে ক্রম-পরিণতির ফলে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। অ্যামিবা হইতে মনুষ্য পর্যন্ত আসিতে বহু লক্ষ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। মানুষের মস্তিষ্ক আছে—সে চিন্তা করিতে পারে, তাহার বুদ্ধি বিবেক আছে—বিচার করিতে পারে, কল্পনা করিতে পারে। এইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পালন সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে মানবদেহ গঠন সম্পর্কে কিছু আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

দেহকোষ (Animal cell)

দেহগঠনের মূল উপাদান হইল সেল (cell) বা কোষ। জীবদেহের প্রতিটি অংশ এই সেল দ্বারা তৈরী। জীবদেহের গঠনের উপাদান হইল জৈব কোষ। কোষ সমষ্টি দ্বারাই মনুষ্যদেহ গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি কোষই জীবন্ত বা এক একটি পৃথক্ জীব। এই জীবন্ত লক্ষ কোটি জীবকোষ দিয়াই জীবন্ত মানবদেহ গঠিত হইয়াছে। কেবল প্রাণীদেহই নয়, উদ্ভিদ দেহও জীবকোষ দ্বারা গঠিত।

কোষগুলি জেলির মত নরম পদার্থ দ্বারা গঠিত। কোষগুলি পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে। কোষগুলি খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহার প্রকৃতি ধরা পড়ে। তাহাতে জানা যায় যে, (১) কোষগুলি নড়াচড়া করিতে পারে ও আকার পরিবর্তন করিতে পারে, (২) আঘাতে বা উত্তেজনায় সাড়া দিতে পারে, (৩) খাদ্য গ্রহণের ফলে পুষ্ট হয়, (৪) নিজ দেহ হইতে ময়লা বা আবর্জনা দূর করিতে পারে, (৫) অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বর্জন করে ও (৬) ক্রমাগত বংশ বৃদ্ধি করে।

দেহের সব কোষের আকৃতি ও প্রকৃতি একই রকমের হয় না। দেহবস্তু অনুযায়ী কোষের প্রকার-ভেদ ঘটে। হাড়, পেশী, চর্ম, মস্তিষ্ক, রক্ত-প্রত্যেকের কোষের জাত আলাদা। মূল দেহকোষ হইতে জন্মের শুরু হইতে কোষের পার্থক্য সৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর কোষের সঙ্গে অন্য শ্রেণীর কোষের মিল থাকে না। যেমন—

(১) **সংযোজক কলা** (Connecting tissue)—দেহের কাঠামো নির্মাণে ও সংযোজনে ইহাদের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। যেমন—হাড়, গাটের বন্ধনী প্রভৃতি।

(২) **আচ্ছাদক কলা** (Epithelial tissue)—আচ্ছাদনসূচক দেহযন্ত্র এই কোষ দ্বারা নির্মিত। চামড়া, রক্তনালীর ভিতরের আচ্ছাদনী প্রভৃতি এই কোষ দ্বারা প্রস্তুত।

(৩) **পেশীকলা** (Muscle tissue)—দেহের মাংসপেশী যে ধরণের কোষ দ্বারা নির্মিত হয়, তাহাকে পেশীকলা বলে। এই কোষের আকার সরু সূতার মত।

(৪) **স্নায়ুকলা** (Nerve tissue)—মস্তিষ্ক ও স্নায়ু নির্মিত হয় এই জাতীয় কোষ দ্বারা।

(৫) **অস্থিকলা** (Bone tissue)—দেহের অস্থি এই জাতীয় কোষ দ্বারা নির্মিত হয়।

(৬) **মেদকলা** (Adipose tissue)—ইহা দ্বারা মেদকোষ প্রস্তুত হয়।

কোষগুলি জীবের প্রকৃতির অনুরূপ। ইহারা উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ করে ও পুষ্ট হয়। খাদ্য ও অক্সিজেন না পাইলে কোন কোষই বাঁচে না। ইহারা পুষ্টি লাভ করিয়া দেহের বৃদ্ধি ঘটায়। কোষ বিভাজনের দ্বারা বংশ বৃদ্ধি করে। কোষের যেমন বংশ বৃদ্ধি আছে তেমনই মৃত্যু আছে।

নরকঙ্কাল

এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, হাড় ও মাংস দিয়া মানবদেহ গঠিত। দেহের ভিতরের দিকে আছে শক্ত হাড়ের কাঠামো বা নরকঙ্কাল। ঠাকুরের প্রতিমা গড়িতে গেলে যেমন থাকে প্রথমে বাঁশের কাঠামো, খড়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাহার পর মাটি দেওয়া হয়; তেমনি কঙ্কাল হইল মানবদেহের কাঠামো। মানবদেহে আছে ছোট-বড় নানা আকারের অনেকগুলি হাড় এবং তাহার প্রত্যেকটির জোড়ে জোড়ে আছে নানা প্রকার কব্জার মত সন্ধি। এইসব অস্থি লইয়া গঠিত হয় একটি পূর্ণ নরকঙ্কাল।

নরকঙ্কাল

অস্থির কাজ : (১) অস্থি শরীরকে শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার ও চলাচলের উপযুক্ত করিয়া তোলে, (২) মাংস-পেশীগুলি অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে, (৩) মানব-দেহের অভ্যন্তরস্থ সব যন্ত্রকে আশ্রয় ও আড়াল করে ও (৪) মজ্জার মধ্য হইতে অবিরাম নূতন রক্ত কণিকা সৃষ্টি করে।

হাড়ের প্রকারভেদ : হাড় বা অস্থি অঙ্গসংস্থান অনুসারে প্রধানতঃ চার রকমের হইয়া থাকে। যেমন—(১) বাহুর অস্থি, (২) ছোট অস্থি—যেমন আঙ্গুলের হাড়, (৩) করোটির মত চ্যাপ্টা অস্থি ও (৪) বিষমাকৃতি—যেমন, করতল বা পদতলের অস্থি।

অস্থির বিশ্লেষণ : রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে অস্থির মধ্যে জৈব পদার্থের সহিত অজৈব পদার্থের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। আপাতঃদৃষ্টিতে অস্থিকে নিরেট মনে হইলেও আসলে ইহা নিরেট নয়। ইহার ভিতরটা ফাঁপা স্পঞ্জের মত পদার্থ। ইহার মধ্যে থাকে মজ্জা।

প্রত্যেক হাড়ের প্রান্ত-দুইটিতে সংযোগস্থল থাকে। ইহা দ্বারা হাড়-নিকটস্থ হাড়ের সহিত বন্ধনীর দ্বারা যুক্ত হয়। উহাকে **সন্ধি** বা **গাঁট** বলে। প্রত্যেক অস্থিসন্ধি বা গাঁটে একখণ্ড করিয়া **উপাস্থি** (inter articular cartilage) বলে।

মোট ২০৬টি হাড় লইয়া আমাদের দেহকাণ্ড রচিত। এইগুলিকে নিম্নোক্তরূপে বিভক্ত করা চলে :

১।	মাথার খুলি ও মুখমণ্ডলে	২২টি অস্থি
২।	মেরুদণ্ডে	২৬টি "
৩।	বক্ষপঞ্জরে	২৫টি "
৪।	কণ্ঠায়	১টি "
৫।	দুই কানের ভিতরে ৩টি করিয়া	৬টি "
৬।	বাহু প্রভৃতি উর্ধ্বাংগে	৬৪টি "
৭।	উরু প্রভৃতি নিম্নাংগে	৬২টি "
	মোট	২০৬টি অস্থি আছে।

মেরুদণ্ড—যে লম্বা হাড়খানি ঘাড় হইতে কোমর পর্যন্ত পিঠের মাঝামাঝি বিস্তৃত তাহার নাম মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া। ইহা দেহের স্তম্ভস্বরূপ। এইটি ছোট ছোট ২৬টি অস্থি-গ্রথিত একটি মালাবিশেষ। ইহাকে ভার্টিব্র্যা (vertebra) বা কশেরুকা বলে। প্রত্যেক কশেরুকা অস্থির মাঝে মাঝে একটি করিয়া উপাস্থি থাকে এবং ভার্টিব্রাগুলি একটির উপর একটি স্তম্ভের ন্যায় গাঁথা হইয়া মেরুদণ্ডটি নির্মিত হয়। ভার্টিব্রায় মোট অস্থিসংখ্যা হইল : গলদেশে ৭টি, পৃষ্ঠদেশে ১২টি, কটিদেশে ৫টি, তাহার নীচে সেক্রাম বা ত্রিকাস্থি এবং সকলের শেষে ককিসক্স্ বা অনুত্রিকাস্থি। প্রত্যেক কশেরুকার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রসকল একত্রে একটি অস্থিঘেরা নলের আকারে পরিণত হয়।

স্কন্ধদেশ—প্রত্যেক স্কন্ধে দুইটি করিয়া হাড় থাকে। সম্মুখে থাকে কণ্ঠার হাড় বা অক্ষকাস্থি (clavicle) এবং পশ্চাৎদিকে থাকে স্ক্যাপুলা (scapula)। স্কন্ধদেশে এই দুইটি হাড়।

বাহু বা উর্ধ্বাংগ (upper limb)—মোটামুটি ৮টি অস্থি লইয়া বাহু গঠিত। হস্ত ও পদের অস্থিগুলি লম্বাটে ধরণের। বাহুর অস্থিগুলির নাম প্রগণ্ডাস্থি (humerus), প্রকোষ্ঠ (fore arm), মণিবন্ধাস্থি, করাস্থি ও অঙ্গুলাস্থি। স্কন্ধের নীচেই বৃহৎ অস্থিটির নাম প্রগণ্ডাস্থি। উহা স্কন্ধ হইতে কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ইহাকে বাহু বলে। বাহুর নিম্নাংশের নাম প্রকোষ্ঠ। দুইটি অস্থি দ্বারা প্রকোষ্ঠ তৈরী হয়। বাহিরের দিকের অস্থির নাম বহিঃ প্রকোষ্ঠাস্থি (radius) ভিতরের দিকের অস্থির নাম অন্তঃ প্রকোষ্ঠাস্থি (ulna)। কব্জি বা মণিবন্ধে ৮টি ছোট ছোট কর-কূর্চাস্থি থাকে। তাহার পর ৫টি লম্বা অঙ্গুলি নলক (phalanges)। প্রত্যেক আঙ্গুলে ৩টি করিয়া হাড়, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ২টি হাড় থাকে।

নিম্নাংগ (lower limb)—উরুদেশে একটি বড় হাড় থাকে। তাহার নাম উর্বস্থি (femur)। তাহার নীচের অংশের নাম জানুদেশ। জানুসন্ধিতে একটি হাড় থাকে যাহাকে মালাইচাকি বলে। তাহার নীচে জঙ্ঘাতে ২টি সমান্তরাল হাড় থাকে। জঙ্ঘাস্থি ও অনুজঙ্ঘাস্থি। পায়ের গোছা ও গোড়ালিতে ৭টি ও পায়ের পাতায় ৫টি লম্বা হাড় থাকে। তাহার পর হাতের আঙুলের মত পায়ের পাঁচটি আঙুলে মোট ১৪টি নলকের হাড় থাকে।

দাঁত—দাঁতকে এক রকম অস্থিই বলা চলে। ইহাদের নাম বহিঃকঙ্কাল। দাঁত চারি প্রকার—(১) সম্মুখে ৪টি **ছেদন দন্ত** (incisors), (২) ইহাদের দুই পাশে একটি করিয়া কুকুরের দাঁতের ন্যায় ২টি দাঁত থাকে। তাহাদের বলা হয় **শ্ব-দন্ত** (canines), (৩) শ্ব-দন্তের পাশে ২টি করিয়া **চর্বণ দন্ত** (bi-cuspids), ইহাদের কাজ খাদ্যবস্তুকে উত্তমরূপে চর্বণ করা। (৪) এইগুলির পাশে ৩টি করিয়া **পেষণ দন্ত** (molars) থাকে। উপর ও নীচের পাটি লইয়া মোট দাঁতের সংখ্যা ৩২টি।

বাল্যকালে ১—৩ বছরের মধ্যে যে দাঁত উঠে তাহাকে দুধে দাঁত বলা হয়। ইহাতে চর্বন দন্ত থাকে না। ৭ বছর হইতে এই দাঁতগুলি পড়িতে আরম্ভ করে। দাঁতের কিছু অংশ মাড়ির নীচে ও কিছু অংশ মাড়ির উপরে থাকে। মাড়ির নীচের অংশের নাম মূল (root)। যে কঠিন পদার্থ দ্বারা দাঁত নির্মিত হয়, তাহার নাম ডেন্টিন্ (dentine)। তাহার উপর আর একটি সাদা কঠিন ও মসৃণ স্তর থাকে, তাহার নাম এনামেল (enamel)। দাঁতের মাঝখানে থাকে অতি সূক্ষ্ম স্নায়ু। তাহার নাম দন্তমজ্জা।

দেহের কাঠামোর আরও কয়েকটি অংশ

শরীরের ভিতরের কাজের জন্য অনেকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্রকে স্থান দিতে হয় এবং সেইগুলিকে রক্ষা করিতে হাড়ের দ্বারা খাঁচার আকারে তিনটি গহ্বর তৈরী হইয়াছে—মস্তক গহ্বর, বক্ষ গহ্বর ও উদর গহ্বর।

মস্তক-গহ্বর বা করোটি : ৮টি হাড় গায়ে গায়ে শক্তভাবে লাগিয়া একটি গোলাকার করোটি (skull) বা মাথার খুলি নির্মিত হয়। এই খুলির মধ্যে থাকে মস্তিষ্ক। মাথার খুলির হাড় বেলের খোসার মত চ্যাপ্টা ও শক্ত। ইহা ছাড়া চক্ষু-কোটর, নাসিকা-গহ্বর, কর্ণ-গহ্বর ও মুখ-গহ্বর এই করোটির নীচে কয়েকটি হাড়ের মধ্যে অবস্থিত। করোটির পিছনের দিক হইতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া একটি নালীগহ্বর নীচে কোমরের তলদেশ পর্যন্ত গিয়াছে। ইহার মধ্যে থাকে সুষুম্নাকাণ্ড (Spinal Cord)।

করোটির ৮টি অস্থির নাম—(১) ফ্রন্টাল (frontal) বা ছাদাস্থি, (২) প্যারিট্যাল (parietal bone) বা প্রাচীরাস্থি, (৩) অকসিপিটাল (occipital) বা মূলাস্থি, (৪) টেম্পোর‍্যাল (temporal bone) বা কর্ণমূলাস্থি, (৫) স্ফীনয়ড, (৬) গণ্ডাস্থি, (৭) ম্যাক্সিলা (maxilla) বা হনুঅস্থি ও (৮)ম্যানডিব্‌ল্(mandible)বা চোয়াল অস্থি।

বক্ষগহ্বর—বক্ষগহ্বরকে ঘিরিয়া দুই পাশে ১২টি করিয়া বাঁকা পঞ্জরাস্থি (ribs) ও মাঝে একটি উরঃফলক (sternum) আছে। উহাকে বক্ষ-পঞ্জর বলে। এই বক্ষগহ্বরে দুই পাশে ফুসফুস (lungs) ও তাহার মাঝখানে হৃৎপিণ্ড (heart) থাকে।

উদরগহ্বর—বক্ষগহ্বরের ঠিক নিচেই থাকে উদরগহ্বর। একটি মাংসপেশীর দেওয়াল দুইটি গহ্বরকে বিভক্ত করিয়াছে, তাহাকে মধ্যচ্ছদা বলে। উদরগহ্বরের পিছন দিকে মেরুদণ্ডের হাড় রহিয়াছে। ইহার সম্মুখভাগে কোন হাড় নাই। উদরগহ্বরের মধ্যে থাকে পাকস্থলী (stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine), বৃহদন্ত্র (large intestine), যকৃৎ (liver), প্লীহা (spleen), অগ্ন্যাশয় (pancreas), বৃক্ক (kidneys) ইত্যাদি।

পেশী (Muscles)—অস্থির উপরে থাকে মাংসপেশী। ইহার ধর্ম স্থিতিস্থাপক। রবারের মত হওয়ায় সব রকমের পেশীই প্রয়োজনে সহজেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। ইহার ফলে মানব-দেহের সঞ্চালন, গতিবিধি ও কাজকর্ম সম্পাদিত হইয়া থাকে। অবস্থান অনুসারে পেশীর বিভিন্ন আকার হইয়া থাকে। কোথাও লম্বা, চ্যাপ্টা, আবার কোথাও অতি সূক্ষ্ম। প্রত্যেক পেশী অতি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে। ইহার নাম ফাসা (fascia)।

ক্রিয়া অনুসারে মাংস-পেশীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা চলে :

(১) **ঐচ্ছিক পেশী** (voluntary)—যে পেশীকে আমরা ইচ্ছামত পরিচালনা করিতে পারি। যেমন হাতের, পায়ের পেশী। (২) আর যে সব পেশী আমাদের ইচ্ছামত চালনা করিতে পারি না তাহাকে বলে **অনৈচ্ছিক পেশী** (involuntary)। এইগুলি নিজস্ব প্রয়োজনে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। যেমন পাকস্থলী, অন্ত্র, শিরা প্রভৃতির পেশী।

(৩) যে সব পেশী কেবল হৃৎপিণ্ডেই থাকে তাহাকে বলে **হৃদ্‌পেশী** (cardiac muscles)। এই পেশী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করিয়া চলে।

মাংসপেশীর কাজ : মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে দেহযন্ত্র সচল হয় তাহাকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে। সংকোচন পেশীর সক্রিয়তা আর প্রসারণ উহার ক্রিয়াবিরতি। মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে দেহে উত্তাপের সৃষ্টি হয়। পেশীর মধ্যে গ্লাইকোজেন নামক পদার্থ এই উত্তাপ সৃষ্টি করে। পেশী আপন হইতেই সব কাজ করে না, স্নায়ুর আদেশেই তাহার সঙ্কোচন ও প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। সব পেশীর মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু রহিয়াছে।

পেশীর শক্তি : আমরা যে সব কাজ করি তাহা পেশীর শক্তিতেই করিয়া থাকি। কিন্তু সকলের পেশী সমান শক্তিসম্পন্ন নয়, আবার একদেহের সব পেশীই সমান শক্ত নয়। ব্যবহারের তারতম্যেই এই কম বা বেশী হইয়া থাকে। ব্যবহারের ফলে এইরূপ হইয়া থাকে। ব্যবহার করিলে পেশী পুষ্ট ও বলবান হয়, ব্যবহার না করিলে শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

কোন পেশী একাধিক্রমে অনেকক্ষণ ব্যবহার করিলে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমরা ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ করি। পেশীর মধ্যে গ্লুকোজ নামক খাদ্য তাহাকে শক্তি জোগায়। অনেকক্ষণ কাজ করিলে গ্লুকোজ ফুরাইয়া যায়, সেইজন্য পেশী ক্লান্ত হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলে রক্ত হইতে গ্লুকোজ সংগ্রহ করিয়া সে আবার কাজ করিতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

দেহযন্ত্র (Systems of the Body)

যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের কাজ ঠিকমত চলে, রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকে ও তাহাকে সচল করিয়া রাখে, সেইরূপ দেহমধ্যস্থ বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দেহযন্ত্রকে সচল, সক্রিয় রাখে। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে প্রধান হইল (১) মস্তিষ্ক ও চেতনতন্ত্র (Brain and Nervous System), (২) দর্শনতন্ত্র—চক্ষু (Eye), (৩) শ্রবণতন্ত্র—কান (Ear), (৪) নাসিক (Nose), (৫) হৃৎপিণ্ড (Heart), (৬) পাচনতন্ত্র (Digestive system) (৭) শ্বাসনতন্ত্র (Respiratory system), ইত্যাদি।

মস্তিষ্ক ও চেতন তন্ত্র ঃ—মানব দেহরূপ যন্ত্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ-কর্তার নামই মস্তিষ্ক। ইহা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে মানবদেহের সর্ববিধ সূক্ষ্ম ও স্থূল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিয়া থাকে। কাজেই দেহবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের জন্য মস্তিষ্কের জ্ঞান অপরিহার্য। সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাথার খুলির মধ্যে এক জোড়া করিয়া মস্তিষ্ক থাকে। মস্তিষ্ক দুইটি। একটি কিছু বড়, অপরটি ছোট। সাধারণতঃ বাম দিকের মস্তিষ্ক ডান দিকের এবং ডান দিকের মস্তিষ্ক বাম দিকের কার্যাবলী পরিচালনা করিয়া থাকে।

মস্তিষ্কের অবস্থান ঃ মাথার খুলির মধ্যে কোমল ঝিল্লজাতীয় যে পদার্থ আছে, তাহাকেই আমরা মস্তিষ্ক বলিয়া থাকি। এই মস্তিষ্ক হইতে একটি মোটা দড়ার মত জিনিস নীচের দিকে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া কোমরের নীচ পর্যন্ত নামিয়াছে। ইহাকে সুষুম্না কাণ্ড বলে।

মাথার খুলির নীচে তিন স্তরের আবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে আবার বেশ কিছু অংশ জলীয় পদার্থ রহিয়াছে। এই জলের মধ্যে মস্তিষ্ক অবস্থান করে বলিয়া ইহার সঠিক ওজন পাওয়া যায় না। যে তিনটি আবরণ মস্তিষ্ককে ঘিরিয়া থাকে, তাহাকে মেনিঞ্জিস বলা হয়। মস্তিষ্ককে সাধারণভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে—

(১) ঊর্ধ্বমস্তিষ্ক ও (২) নিম্নমস্তিষ্ক। যে অংশে সুষুম্না ও মস্তিষ্কের সংযোগ, ঐ অংশকে মেডালা বলে।

মেডালার উপরের অংশকে **পন্‌স্** বলে। ইহার পিছনের অংশকে বলে **সেরিবেলাম**।

অধঃমস্তিষ্কের তিনটি অংশ। ইহার উপরের দিকে কিছু অংশ ধূসর বর্ণ, অসমতল, এলোমেলো, খাঁজকাটা, তাহার নীচে সাদা অংশ, তাহার নীচে জল। এই ধূসর অংশেই যত প্রধান প্রধান নার্ভ-কোষের অবস্থান।

মাথার খুলি অপসারণ করিলে ভিতরে যে অংশ চোখে পড়ে তাহার নাম **গুরু মস্তিষ্ক**। গুরু মস্তিষ্ক দক্ষিণে ও বামে দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার রং ধূসর লোহিতাভ, অত্যন্ত নরম তুলতুলে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপক ও সাড়ার কাজ করে। পশ্চাৎ দিকের একটি অংশ দৃষ্টিশক্তির কেন্দ্র, কোথাও বা শ্রবণশক্তি, কোথাও বা কর্মচাঞ্চল্য ইত্যাদির কেন্দ্র। মস্তিষ্কের একটি কাজ চিন্তা, স্মৃতি ও জ্ঞানের ক্রিয়া। গুরু মস্তিষ্কের সম্মুখ ভাগে ঐ সব ক্রিয়া চলে।

মস্তিষ্কের কাজঃ (১) মানব-দেহ তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার জন্য সর্বক্ষণ কোন না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনা করিতেছে। তাহার এই অঙ্গ-সঞ্চালন কোন না কোন পেশীর মাধ্যমে ঘটিতেছে। শরীরের এই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন কখনও বাহির হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, কখনও বা তাহা শরীরের অভ্যন্তরে ঘটে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। মস্তিষ্ক এই সব অঙ্গ চালনার মধ্যে ছন্দ ও তাল বজায় রাখিয়া চলিতেছে। তাহার ফলেই আমাদের অঙ্গচালনার মধ্যে পারম্পর্য ও শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে। মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ না থাকিলে তাহা অসম্ভব হইয়া পড়িত এবং দেহ ধারণও সম্ভব হইত না।

(২) কেবলমাত্র মাংসপেশী নয়, দেহের অভ্যন্তরে অনেক তরল পদার্থও আছে। সেই তরল পদার্থসমূহও দেহের নানা স্থানে নানাভাবে সঞ্চারিত হয়। তাহার উপরও মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ বর্তমান। যথা—কর্ণস্থিত তরল পদার্থ দ্বারা মানব শরীরের ভারসাম্য রক্ষিত হয়, তাহা মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে।

(৩) পরিপাকক্রিয়া, শোষণক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনা করাও মস্তিষ্কের কাজ।

(৪) মস্তিষ্কের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল মানুষের মধ্যে চিন্তা অনুযায়ী কাজ করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা পরিচালনা করা। মস্তিষ্ক যথাযথ স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে উদ্দীপক সাড়া (Stimulus Response) সৃষ্টি করিয়া যথাযথ মাংসপেশীকে সেই কাজ করিতে নির্দেশ দেয়। কাজ করিবার পর কাজের মূল্যায়ন চিন্তা করা বা বিচার দ্বারা পূর্বোক্ত ভুলভ্রান্তি পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতাও মস্তিষ্কের আছে।

(৫) মস্তিষ্ক যেভাবে কাজ করে তাহার মধ্যে তিন প্রকার প্রকারভেদ দেখা যায়। যেমন, (ক) প্রথমত: চিন্তার সূত্রপাত, তাহর পর উদ্দীপক সাড়া, তাহার পর মাংসপেশীর কর্ম। (খ) উপরোক্ত প্রক্রিয়া বার বার পুনরাবৃত্তির ফলে চিন্তার পর্যায়টি অবশেষে লুপ্ত হয়। তখন উদ্দীপক—সাড়া—কর্ম এইভাবে চলিতে থাকে। এই ধরণের কার্যাবলীকে Reflex Action বলা যায়। (গ) যান্ত্রিকভাবে একই ধরণের কাজের পুনরাবৃত্তি। এইভাবে কাজের কিছুটা সুবিধা আছে। প্রথমতঃ. দুই প্রক্রিয়ার সময়, শ্রম, মস্তিষ্কের সক্রিয়তা ইত্যাদির প্রয়োজন হয়,—কিন্তু যান্ত্রিকভাবে

যে সব কাজ চলে তাহা জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় অথবা মস্তিকের সক্রিয়তা না থাকিলেও আপন নিয়মে চলিয়া থাকে। উপরোক্ত দুই প্রকার কাজ করিতে করিতে মস্তিষ্ক শ্রান্ত হয়, শ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে কাজের তৎপরতা কমে। কিন্তু যান্ত্রিক নিয়মে যে কাজ চলে তাহা মস্তিষ্ক শ্রান্ত হইলেও একই নিয়মে একইভাবে কাজ করিয়া যায়, ফলে শরীরের যে প্রয়োজন তাহা ঠিকমত মিটিতে পায়।

মস্তিষ্কের ক্লান্তি : অতিরিক্ত পরিশ্রমে, দুর্ভাবনায়, উদ্বেগে, একঘেয়ে কাজে, ভয়ে, দুর্বলতায়, দীর্ঘকাল অসুস্থতায় মস্তিষ্ক ক্লান্ত হইয়া পড়িতে পারে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মস্তিষ্কের বিশ্রাম দরকার। প্রতিদিন কাজের ফলে মস্তিষ্কের যে ক্লান্তি তাহা নিবারণের উপায় হইল ঘুম।

একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ক্লান্তি আসে। মস্তিষ্কের ক্লান্তির অন্যতম লক্ষণ, কাজে অনিচ্ছা। তাহার পর লক্ষ্য করা যায় মনোযোগ দিবার ক্ষমতা দ্রুত কমিয়া আসে এবং কাজের মধ্যে শৃঙ্খলা কমিয়া যায়। তাহার পরও কাজ করিতে চাহিলে আর কাজ করা যায় না। ক্লান্ত অবস্থায় মস্তিষ্কের কোষসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। মস্তিষ্কই দেহকে চালায়। অতএব মস্তিষ্কের ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেহও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। বিশ্রামের পর দেহ ও মস্তিষ্ক দুইই সতেজ হইয়া উঠে।

মাথার পিছন দিকে কমলালেবুর ন্যায় ক্ষুদ্র আর একটি মস্তিষ্ক অবস্থান করে। ইহার বর্ণ ধূসর, ভিতরের দিক সাদা। ইহার গায়ের খাঁজ অগভীর ও খাঁজগুলি সুবিন্যস্ত। এটি লঘু মস্তিষ্ক। লঘু মস্তিষ্ক শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করে, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পেশীর কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। লঘু মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আচরণে পারম্পর্য থাকে না।

স্নায়ু বা চেতনতন্ত্র (Nurvous System) : আমরা আমাদের শরীর ও মন নানাভাবে চালনা করিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের কোন অঙ্গেরই স্বাধীনভাবে চালিত হইবার ক্ষমতা নাই। আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি মস্তিষ্কের নির্দেশ পালন করিয়া চলে। মস্তিষ্ক বিভিন্ন স্নায়ুর মাধ্যমে সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিচালনা করিয়া থাকে। চেতনা দ্বারাই আমরা কার্য-কারণ-সম্পর্ক ঠিক রাখিয়া আচরণ করিয়া যাই। শরীর বিচিত্র প্রয়োজন অনুযায়ী চেতনতন্ত্রের তিনটি কেন্দ্র আছে। (১) প্রথম কেন্দ্র মস্তিষ্ক। (২) মেডুলা বা সুষুম্নাশীর্ষ। শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন ও পরিপাক-ক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনার জন্য মেডুলাই বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। (৩) প্রতিক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া। যে সকল কাজ মস্তিষ্ককেন্দ্র পর্যন্ত না পৌছিয়া নিম্নতম কেন্দ্র হইতেই সাধিত হয় এবং মস্তিষ্ক অচেতন থাকিলেও যে কাজ নির্বিঘ্নে চলিতে থাকে, তাহাকেই Reflex Action বলা হয়। সমগ্র শরীরের চেতন পরিবাহী তিনটি কেন্দ্র আছে। (ক) চেতনা পরিবাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেন্দ্রসমূহ, (খ) বহির্মুখী স্নায়ুতন্ত্র ও (গ) অন্তর্মুখী স্নায়ুতন্ত্র।

মানবদেহে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য দেহের সর্বত্র জুড়িয়া বিভিন্ন প্রকার স্নায়ু রহিয়াছে। শরীরের ভিতরকার কোন কাজই আপনা হইতে সাধিত হয় না—নার্ভের বা স্নায়ুর ভিতর দিয়া উত্তেজনা আসিলে তাহারই হুকুমে সকল কাজ

সম্পাদিত হয়। নার্ভ বা স্নায়ু টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের তারের মত একপ্রকার বার্তাবহ তন্তু। বার্তা, নির্দেশ বা চাঞ্চল্য বহন করাই ইহার কাজ। এই নার্ভগুলি দেহের সর্বত্র বিদ্যমান। দেহে এমন কোন স্থান নাই যেখানে স্নায়ু অবর্তমান।

স্নায়ুর প্রেরণার মূল কেন্দ্র মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্ক হইতে সুষুম্নাকাণ্ড। মস্তিষ্কে ১২ জোড়া ও সুষুম্নাকাণ্ডে ৩১ জোড়া স্নায়ু আছে।

মস্তিষ্ক হইতে যে স্নায়ু বাহির হইয়াছে তাহা কেন্দ্রীয় স্নায়ু (central nurve)। আর সুষুম্না হইতে বাহির হওয়া স্নায়ু হইল মেরুদণ্ডীয় স্নায়ু (spinal nurve)। স্নায়ু নির্মিত হয় কোষ দ্বারা। স্নায়ুকোষ হইতে অতি সূক্ষ্ম সূতার মত কিছু তন্তু বাহির হয়। সেইগুলির নাম নিউরণ (Neuron)। অনেকগুলি নিউরন মিলিত হইয়া স্নায়ুর সৃষ্টি করে। স্নায়ুকোষ হইতে প্রথমে উত্তেজনা বা আদেশ সঞ্চালিত হয় এবং তা হইতে নির্গত তন্তুগুলি টেলিগ্রাফের তারের মত তাহা বহন করিয়া যথাস্থানে লইয়া যায়।

কর্ম অনুসারে স্নায়ুগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। যেমন—প্রেরক স্নায়ু (efferent nurve), গ্রাহক স্নায়ু (afferent nurve) এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ু (Inter cetral nurve)।

চক্ষু (Eye)ঃ চোখকে অমূল্য রত্ন বলিয়া অনেক সময় তুলনা করা হয়। আসলে চোখ দ্বারা আমরা জীবন যাপনের জন্য বহুবিধ কাজ করিতে পারি। চোখ দিয়া আমরা প্রধানতঃ দেখার কাজ করিলেও অন্যান্য অনেক কাজ চোখ দিয়া করিতে হয়। যেমন—দূরত্ব মাপার কাজ, আপন মনোভাব প্রকাশ করিবার কাজ, যেমন, আনন্দ, হর্ষ, বিষাদ, বিরক্তি প্রকাশ চোখের সাহায্যে করা যায়। দুইটি চোখ যেন দুইটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা। মানুষ চোখের অনুকরণেই ক্যামেরা তৈয়ারী করিয়াছে। ক্যামেরার সহিত চোখের তফাৎ এই যে, ক্যামেরায় ফিল্ম বদলাইতে হয়, চোখে তাহা করিতে হয় না। চোখের অন্য ক্ষমতা হইল সে যদৃচ্ছা ঘুরিয়া ফিরিয়া, সোজাসুজি, কৌণিকভাবে ফোকাশ্‌ করিতে পারে। এই কাজের জন্য ছয়টি করিয়া সুদক্ষ মাংসপেশী আছে। মস্তিষ্কের মধ্যাঞ্চল এই পেশীগুলিকে পরিচালিত করে। চোখ ডাইনে, বামে, উপরে, নীচে, কোণাকুণি যতটা ঘোরাঘুরি করিতে পারে তাহাকে eye-span বলা হয়। অভ্যাসের দ্বারা এই eye-span বাড়ানো যায়।

চোখকে রক্ষা করিবার জন্য চোখের উপর ভুরু আছে। ভ্রূযুগল কেবল যে মুখমণ্ডলের শোভা বর্ধন করে তাহা নয়। কপালের হাড় ভুরুর নিকট আসিয়া ঈষৎ উন্নত হইয়াছে। ভুরুতে আছে ঘন কেশ। ফলে কপালের উপর হইতে ঘাম বা ঐ জাতীয় পদার্থ গড়াইয়া চোখে পড়িতে পারে না। ভুরুর নীচে একটি চামড়ার ঢাকনা ও চোখের নীচের দিকে অপর একটি ঢাকনা। এই ঢাকনা-জোড়া অবিরাম বন্ধ হয় আর খোলে।

চোখ দিয়া আমরা দেখি তাই চোখ আমাদের দৃষ্টিযন্ত্র। কিন্তু চোখ প্রকৃতপক্ষে দেখার মালিক নয়, দেখার মালিক স্বয়ং মস্তিষ্ক। চোখ তাহার ইন্দ্রিয় বা যন্ত্র মাত্র। একটি সুন্দর ফুল দেখিলে বলি খুব সুন্দর ফুল। কিন্তু আসলে চোখ সৌন্দর্যকে

উপলব্ধি করেনি, করেছে মস্তিষ্ক। চোখের মধ্যে দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে বলিয়াই আমরা দেখি। আলো না থাকিলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। সুতরাং চোখ প্রকৃতপক্ষে আলোর সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব ধরার যন্ত্র।

চোখের গঠন—চোখের ভিতরের সাদা অংশটিকে বলা হয় নেত্রকলা। নেত্রকলা যেন উপর নীচে পাতার ভিতরও কিছুটা পর্যন্ত গিয়াছে। নেত্রকলার উপর সর্বক্ষণ জলের ধারা পড়ে। তাই ইহা সর্বক্ষণ ভিজা ও চকচকে। নেত্রকলার ভিতর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-শিরা আছে। চোখের মধ্যে কিছু প্রবেশ করিলে, ঠাণ্ডা লাগিলে, চোখ রগড়াইলে, রাত্রি জাগরণ করিলে, নেত্রকলার অভ্যন্তরস্থ রক্তশিরাগুলি ফুলিয়া ওঠে এবং চোখ লাল হয়। নেত্রকলার পিছনে থাকে নেত্রগোলক। নেত্রগোলক সম্পূর্ণ গোল নয়। এই নেত্রগোলক তিনটি দেওয়াল দিয়া গঠিত।

বাহিরের দেওয়ালটির নাম শ্বেতমণ্ডল। এইটি একেবারে সাদা ও অস্বচ্ছ। কেবল সম্মুখের একটি জায়গায় গোলক হইতে একটু উঁচু হইয়া স্বচ্ছ কাঁচের মত হইয়াছে। ইহার ভিতর দিয়াই আমরা দেখি। শ্বেত মণ্ডলের এই স্বচ্ছ অংশের নাম অচ্ছোদপটল (cornea)। নেত্রগোলকের মাঝের অংশটির নাম কৃষ্ণমণ্ডল (chorid)। কৃষ্ণমণ্ডল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। অন্য আলো ইহার ভিতর যাইতে পারে না। সম্মুখের দিকে অচ্ছোদপটলের পিছনের অংশটি ফাঁকা। ইহার চারিদিকে আছে এক চক্রাকার পর্দা। ইহাকে বলে কনীনিকা (Iris)। ইহার মধ্যকার ছিদ্রটিকে বলে তারারন্ধ্র। এটি কাহারও কাল বা কটা হয়।

তারারন্ধ্রের ভিতরে আছে চোখের মণি। নেত্রগোলকের সবচেয়ে ভিতরের দিকে তৃতীয় দেওয়াল। তাহার নাম অক্ষিপট (ratina)। ইহার দশটি স্তর স্নায়ুকোষ দিয়া নির্মিত। এইটি দৃশ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে। কোন দৃশ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশ হইতে আলোকরশ্মি সরলরেখায় প্রথমে অচ্ছোদপটলে পড়ে, পরে জলীয় পদার্থ ভেদ করিয়া তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়া কর্ণিনিকার পিছনের চোখের মণি বা লেন্সে পৌছায়। ঐ রশ্মি যখন অক্ষিপটে আসে তখন সেইখানে দৃশ্যবস্তুর প্রথম প্রতিবিম্ব পড়ে।

দৃশ্যের সকল প্রতিবিম্বই প্রথমে অক্ষিপটে গিয়া পড়ে। অক্ষিপটের পশ্চাৎ ভাগ হইতে একটি মোটা নেত্রস্নায়ু বাহির হইয়া মস্তিষ্কের মধ্যে গিয়াছে। সেই স্নায়ু প্রতিবিম্বের প্রত্যেকটি রেখা ও বর্ণ হুবহু ভাবে বহন করিয়া মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে লইয়া যায়।

অক্ষিপটকেই ratina বলা হয়। এই রেটিনাতে দণ্ড (rods) ও শঙ্কু (cones) নামে ছোট ছোট কোষ আছে। মানুষের চোখে প্রায় ৭০ লক্ষ শঙ্কু এবং কয়েক কোটি দণ্ড আছে। শঙ্কুগুলির আছে বর্ণানুভূতি আর দণ্ডগুলির আলোকানুভূতি আছে। দণ্ডগুলির অনুভূতিশক্তি নষ্ট হইলে রাতকানা হইয়া যায়।

চোখের মণি অত্যন্ত সংবেদনশীল। তীব্র আলোয় ইহা সঙ্কুচিত হয়, আবার ভয়ে ও উত্তেজনায় প্রসারিত হয়।

চোখ যদিও আমাদের সম্মুখে থাকে কিন্তু দৃষ্টিকেন্দ্র থাকে মস্তিষ্কের পিছন দিকে। অতএব সম্মুখের চোখের দেখা ছবি মস্তিষ্কের পিছন দিকের কেন্দ্রে গিয়া পৌঁছায়। দুইটি চোখ হইতে দুইটি প্রতিবিম্ব গেলেও সেখানে একটাই দেখা যায়।

শ্রবণযন্ত্র—কান (Ear)

আমাদের মুখমণ্ডলের দুই পাশে ভুরু ও নাসামূলের সমান্তরালে কোমলাস্থি দ্বারা গঠিত দুইটি শ্রবণযন্ত্র আছে। শ্রবণযন্ত্রের মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করিলে আমরা শুনিতে পাই। প্রতি সেকেণ্ডে ২০ হইতে ২০,০০০ গতি বিশিষ্ট শব্দ তরঙ্গ মানুষের কান ধরিতে পারে।

কর্ণের বাহিরের যে অংশটি নরম হাড় দ্বারা গঠিত, ইহা বায়ু ধরার কৌশলমাত্র। ইহার অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিশেষ নাই। তবে কর্ণকে আঘাত হইতে ইহা কিছুটা রক্ষাও করিয়া থাকে। বায়ুতরঙ্গ যাহাতে কানের গর্তে সহজে প্রবেশ করিতে পারে সেইজন্য ইহা ঠোঙার ন্যায় তৈরী। মানুষ ছাড়া অন্যান্য অনেক প্রাণী বাহিরের এই অংশটি সঞ্চালিত করিতে পারে। কিন্তু মানুষ ইহার উপর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।

কানের গঠন: ঠোঙার মত অংশ হইতে একটি আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সুড়ঙ্গ পথটি প্রায় ১" মত। সুড়ঙ্গে সম্মুখের দিকে সামান্য রোম থাকে। এক ইঞ্চির মত সুড়ঙ্গ পথটি মোমের মত আঠালো পদার্থে ঢাকা। কোন কিছু কানে ঢুকিলে ঐ আঠালো পদার্থে আটকাইয়া যায়। সুড়ঙ্গের শেষপ্রান্তে গোল চাকৃতির মত একটা পর্দা আটকানো আছে। ঐ পর্দাকে কর্ণপটহ বলে। কর্ণপটহ পর্যন্ত বহিরের অংশের নাম বহিঃকর্ণ। এই কর্ণপটহ ঢাকের চামড়ার মত গোল এবং হাড়ের সঙ্গে লাগান। কোন শব্দ যখন কানে প্রবেশ করে তখন প্রথম কর্ণপটহে কম্পন লাগে।

কর্ণপটহ অতিক্রম করিলেই দ্বিতীয় অংশ শুরু হইল। দ্বিতীয় অংশে তিনটি হাড় আছে। এইগুলির একটির নাম হাতুড়ি, আর একটির নাম নেহাই (Anvil) তৃতীয়টির নাম রেকাব (Stirrup)। শব্দতরঙ্গ প্রথম অংশের শেষে কর্ণপটহে যে কম্পন জাগাইয়াছিল, সেই কম্পন এই হাড় তিনখানির সাহায্যে আরও বর্ধিত হয়। বর্ধিত শব্দতরঙ্গ মধ্যকর্ণের শেষের কর্ণপটহে গিয়া আঘাত করে।

কানে হাত দিলে আমরা ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনি। বাহির হইতে কানে যেমন বাতাস যায় তেমনই মুখের ভিতর হইতেও কানে বাতাস যায়। গলার ভিতর হইতে একটি সরুনালী দ্বারা এই পথ যুক্ত। এই নালীপথের নাম ইউস্টেকিয়ান টিউব (Eustachian Tube)।

প্রতি বার ঢোঁক গিলিবার সঙ্গে কিছু পরিমাণ বায়ু ভিতরে প্রবেশ করে। ঐ বায়ু ইউস্টেকিয়ান টিউব দিয়া গিয়া কর্ণপটহের পিছন দিকে মৃদু আঘাত করে ও সেইখানে জমা থাকে। বাহিরের বায়ু আসিয়া যখন কর্ণপটহে আঘাত করে তখন উভয় দিকে বায়ুর পার্শ্বচাপ পড়ে। ফলে পর্দাটি ছিঁড়িয়া যায় না।

দ্বিতীয় পর্দার পরবর্তী অংশকে বলা হয় অন্তঃকর্ণ। শামুকের ন্যায় আকার বলিয়া ইহার নাম ককলিয়া (cochlea)। ককলিয়া কিছুটা গোলক ধাঁধার মত। দ্বিতীয় কর্ণপটহে যখন শব্দতরঙ্গ জাগে তখন ককলিয়া অনুরূপ শব্দতরঙ্গ তৈয়ারী করিয়া মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্কের শ্রুতি স্মৃতিকেন্দ্রে উক্ত শব্দতরঙ্গ চলিয়া গেলে সেখানে শোনা যায়—অনুরূপ ঘটনা মনে পড়া ইত্যাদি কাজ সমাপ্ত হয়।

ককলিয়া নামক সুড়ঙ্গটির মধ্যে ছোট ছোট হাড়ের খুঁটি আছে। এই সব খুঁটিতে ২৪০০০ নানা আকারের তার বাঁধা আছে। বাহিরের কোন শব্দতরঙ্গ কানে প্রবেশ করিলে যে কয়টি তার সমস্বরে বাঁধা, সেইগুলিতে ঝঙ্কার উঠে। মূল মস্তিষ্ক-কেন্দ্র বিকল হইলে কান ভাল থাকিলেও কিছু শোনা যাইবে না।

মানুষের শরীর যেভাবে গঠিত তাহাতে ছয় দিকে ভারসাম্য রাখিতে হয়। উঁচু ও নিচু দিক, ডান ও বাম দিক, সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক। শরীর যে দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ুক না কেন, সুড়ঙ্গের মধ্যস্থিত জল সেই দিকে গড়াইয়া পড়ে। তাহাতে সুড়ঙ্গের গায়ে যে পুচ্ছাকৃতি লোম আছে, সেই লোমগুলিও সেই পাশে হেলিয়া পড়ে। এই লোমগুলি তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। ফলে মস্তিষ্কে সংবাদ পৌঁছাইয়া যায়। মস্তিষ্ক বুঝিতে পারে শরীরের ভারসাম্য কি অবস্থায় আছে এবং তৎক্ষণাৎ বিপরীত দিকের অঙ্গসমূহে ভারসাম্যরক্ষার নির্দেশ পাঠায়। যে দিকের ভারসাম্য নাই তাহার বিপরীত দিকের পেশীগুলি সক্রিয় হইলে অনেক ত্রুটিমুক্ত হওয়া যায়।

আসলে ককলিয়াই হইল শ্রবণযন্ত্র। ইহার পাকে পাকে রহিয়াছে একটি জল প্রণালী ও তাহার মাঝে ভাসিতেছে একটি তন্তুময় পর্দা (basement membrane)। প্রতিটি তন্তুর শেষে আছে স্নায়ুকোষ, এইখান হইতে শ্রুতিস্নায়ু শুরু হইয়াছে। শব্দের তরঙ্গ ককলিয়ায় তরঙ্গ তোলে। যে সুরের স্পন্দন আসে সেই সুরের তন্তুটি স্পন্দিত হয় এবং তাহার স্নায়ুকোষ সেই শব্দ-স্পন্দন শ্রুতিস্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে। মস্তিষ্কের দুই পাশে কানের কাছে শ্রুতিকন্দ্র রহিয়াছে। ডান দিকে বাম কানের, বাম দিকে ডান কানের।

ঘ্রাণযন্ত্র—নাসিকা (Nose): নাক আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা নাসাপথে বায়ু গ্রহণ করি ও পরিত্যাগ করি। শুধু বায়ু নয়, ঘ্রাণ লওয়ার ব্যবস্থাও এখানে। বাতাসকে ভালভাবে গ্রহণ করার জন্য নাসাযন্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। নাসাপথের গর্ত-দুইটি কিছুদূর অবধি গিয়া নিম্নাভিমুখী হইয়াছে এবং গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। নাসিকা শক্ত হাড় দ্বারা গঠিত নয়। ইহা এক ধরণের উপাস্থি দ্বারা গঠিত। নাকের প্রবেশ পথে একগুচ্ছ রোম দেখা যায়। বাহিরের শত্রু যাহাতে নাকে ঢুকিয়া না পড়ে তাহার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা।

নাসিকার দুই পথের মাঝে একটি পাতলা হাড় আছে। ঐ হাড়ের সংলগ্ন ঝিল্লীর পর্দার সন্নিকটে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা আছে। ঐ স্থানটি বেশ গরম। আমরা যে প্রশ্বাস গ্রহণ করি সেই বায়ু ঐ স্থানটি অতিক্রম করিবার সময় কিছুটা গরম হয়। ঐ গরম বাতাসই ফুসফুসে প্রবেশ করে। ইহা ছাড়া নাকের অভ্যন্তর ভাগ সব সময়

সিক্ত থাকে। চোখের অতিরিক্ত অশ্রু অবিরাম নাসিকাগহ্বরে প্রবেশ করে। নাসিকার ভিতরের কোষগুলিও রসক্ষরণ করে। সিক্ত ভাব থাকিবার ফলে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও প্রবেশ করিতে পারে না।

নাকের ছিদ্র-দুইটির নাম নাসাগুহা। এই অংশটি থাকে নাকের মধ্যে কিছু উপরের দিকে। সেখানে থাকে ঘ্রাণঝিল্লি। ঐ ঝিল্লি অসংখ্য ঘ্রাণকোষে পূর্ণ থাকে। কোন গন্ধযুক্ত বস্তুর গন্ধ পৌছিলে ঘ্রাণকোষ বিশেষ ভাবে উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনার চেতনা যখন কোষের স্নায়ুতন্তুর মারফৎ মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্রে গিয়া উপস্থিত হয়, তখনই আমরা ঘ্রাণ সম্বন্ধে সচেতন হই। মস্তিকের স্বাদকেন্দ্রের পাশেই ঘ্রাণকেন্দ্র রহিয়াছে।

স্বাদযন্ত্র—জিহ্বা (Tongue): মুখ-বিবরের মধ্যে জিহ্বার অবস্থান। জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ আটকানো। জিহ্বা যেমন খাদ্য গ্রহণের সময় খাদ্যকে নাড়াচাড়া করিয়া চর্বনে সাহায্য করে, তেমনি জিহ্বার সহিত সংযুক্ত বিভিন্ন লালাগ্রন্থি হইতে নিঃসৃত লালা খাদ্য পরিপাকে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের কথা বলার ক্ষমতা, জিহ্বার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই সম্ভব। তৃতীয়তঃ, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণের একমাত্র যন্ত্র। যাবতীয় খাদ্যের স্বাদ, তাহাদের তারতম্য জিহ্বার সাহায্যে অনুভব করা যায়।

মৌলিক স্বাদ লবণ, মিষ্ট, টক ও তিক্ত। এই চারি প্রকার স্বাদের পারস্পরিক মিশ্রণে অন্যান্য যে সব স্বাদ অনুভব করা যায়, জিহ্বায় তাহা ধরা পড়ে। জিহ্বার মাঝখানটি বাদ দিয়া ইহার অগ্রভাগ, দুই পার্শ্ব ও পিছনের দিকে যে উঁচু দানার মত আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায় এইগুলিই আস্বাদ স্থান। ঐগুলির মধ্যে থাকে আস্বাদ-কোরক, যাহা অস্বাদকোষে পূর্ণ। বিভিন্ন ধরণের আস্বাদের জন্য বিভিন্ন কোরক রহিয়াছে। মিষ্ট আস্বাদের কোরক জিভের আগায় থাকে। তাহার উপরে জিহ্বার দুই পাশে পাওয়া যায় লবন আস্বাদের, তাহার উপরে অম্ল আস্বাদের, এবং জিহ্বার পিছনের দিকে থাকে তিক্ত আস্বাদের কোরক। জিহ্বা হইতে আস্বাদের সংবাদ মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্কে স্বাদের কেন্দ্র আছে ঘ্রাণ-কেন্দ্রের পাশেই।

চর্ম (skin): সমস্ত প্রাণীর শরীর চর্মের আবরণে আবৃত। কোন কোন পশুপক্ষীর চর্ম অত্যন্ত স্থূল, কর্কশ। কোন কোন প্রাণীর চর্ম অত্যন্ত পাতলা, মসৃণ ও চকচকে। বিচিত্র বর্ণযুক্ত বা নক্সাকাটা চামড়াও অনেক দেখা যায়। চর্মের প্রধান কাজ শরীরকে আবৃত রাখিয়া রক্ষা করা, কিন্তু ইহা ছাড়াও চর্মদ্বারা অন্যান্য কাজও চলে। যেমন—চর্মের মধ্য দিয়া আংশিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে, চর্ম দিয়া দেহের আভ্যন্তরিণ ক্লেদ নিঃসৃত হয়, চর্ম স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। কতকগুলি ইতর-প্রাণী চামড়ার মধ্যে দিয়া শ্বাসকার্য চালায়। ইহা ছাড়া চর্মের বিভিন্ন বর্ণ জীবজন্তুর আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়। চর্মের মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্প বাহির হয় ও বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে তাহা তৎক্ষণাৎ উরিয়া যায়। এই ক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলিতেছে।

আবার পরিশ্রমে বা সূর্যতাপে যখন ঘাম বেশী পরিমাণে বাহির হয় তখন তাহা সঙ্গে সঙ্গে উবিয়া যাইতে পারে না। শীতকালে বা খুব বর্ষার সময় ঘাম কমিয়া যায়। আবার গ্রীষ্মে তাহা বাড়িতে থাকে। হঠাৎ ভয় পাইলে, শক খাইলে, উত্তেজিত হইলে নার্ভের প্রতিক্রিয়ায় ঘামের পরিমাণ বাড়িতে থাকে। আবার পরিমাণ মত ঘাম বাহির হইয়া শরীরের ভারসাম্য রক্ষিত হয়। শরীর গরম হইয়া গেলে ও যথাযথ ঘাম বাহির না হইলে তাপদগ্ধ (Heat Stroke) হইয়া মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে।

স্পর্শেন্দ্রিয় হিসাবেও চর্মকে সর্বক্ষণ কাজ করিতে হয়। বার্তাবহ নার্ভগুলি চর্মের মধ্যে জালের মত পরিব্যাপ্ত। কোন বস্তু চামড়ার সংস্পর্শে আসিলেই বার্তাবহ নার্ভগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ চলিয়া আসে। স্পর্শানুভূতি চামড়া ছাড়া অন্য কোন যন্ত্রের নাই। এক বর্গ ইঞ্চি চামড়ার মধ্যে প্রায় ৫০০০ কোষ ও প্রায় ৫০টি বার্তাবহ নার্ভ থাকে। চামড়া এমনভাবে নির্মিত যে বাহিরের কিছু চামড়ার ভিতর দিয়া দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। চামড়া অক্ষত থাকিলে বিষাক্ত কোন দ্রব্যও তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

চামড়ার গঠন : চর্মের তিনটি স্তবক আছে। উপরের স্তবকটিকে বলা হয় বহিঃস্তবক। ইহার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক স্তবক আছে। বহিঃস্তবকের গভীরতম স্থানে ঘন সংবদ্ধ চ্যাপ্টা কোষের অবস্থান। এই কোষগুলি অবিরাম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও পুরাতন কোষের উপর জন্মায়। ক্ষয়ের সময় কোষগুলি ঘনসংবদ্ধ ও অনুভূতিহীন হইয়া মরিয়া যায়। বহিঃস্তবকের কোষে এক ধরণের রঞ্জক পদার্থ থাকে। তদনুযায়ী চামড়ার রং হয়। কেন্দ্রীয় স্তরটির নাম ডারমিস (dermis)। প্রচুর পরিমাণ স্থিতিস্থাপক তন্তু দ্বারা এই অংশ গঠিত। চর্মের মধ্যে অনেকরক্ত ও নাসিকা-প্রণালী, স্নায়ুসূত্র, লোমমূল, তৈলগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি থাকে।

চর্মের মধ্যে তৈলগ্রন্থি সমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত থলির মত। ইহা তৈলক্ষরণ করে। সেই তৈল চামড়া ও লোমের উপর পাতলা আবরণ সৃষ্টি করিয়া ইহাদিগকে নরম ও তরল পদার্থদ্বারা অভেদ্য করিয়া তুলে। চর্মস্থিত স্বেদগ্রন্থিগুলি গিঁটপাকানো নালিকার মত। ইহাদের মধ্যদিয়া ঘাম নির্গত হয়।

চর্মের নীচের স্তবকে স্নেহজাতীয় একটি আবরণ থাকে। ইহা কোথাও কোথাও কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত পুরু থাকে। দেহযন্ত্রকে আঘাত হইতে রক্ষা ও তাপক্ষয় নিবারণ ইহার কাজ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) : অবস্থান—বক্ষগহ্বরের অভ্যন্তরে বামদিকে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান। ইহার উপরের অংশে যেখান হইতে নালীসমূহ বাহির হইয়াছে, তাহাকে Base বলা হয়। আর নীচের দিকে যেখানটা সরু হইয়া আসিয়াছে, সেই অংশকে Apex বলা হয়।

গঠন ও কাজ—হৃৎপিণ্ডের একমাত্র কাজ, দিবারাত্র নিজস্ব ছন্দে রক্ত পাম্প করা। পাম্পের সাহায্যে রক্ত শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হয়। ইহা বিশেষ ধরণের নির্মিত ব্লাডার-বিশেষ।

যে পেশীর দ্বারা হৃৎপিণ্ড গঠিত হয়, তাহার সহিত শরীরের অন্য কোন স্থানের পেশীর মিল নাই। ইহা আড়াআড়ি ভাবে ডোরা কাটা। ইহার বৈশিষ্ট্য হইল পেশীর কোন একস্থানে সঙ্কোচন শুরু হইলে ডোরাকাটা বাঁধগুলি বহিয়া সঙ্কোচন সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ড প্রতি বার সঙ্কুচিত হইয়া একবার শিথিল হইয়া যায়। পরে আবার সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে।

ভ্রূণ অবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের কোষ যতক্ষণ জীবিত, ততক্ষণ সঙ্কোচন ও প্রসারণ পর্যায়ক্রমে চলিতেছে। হৃৎযন্ত্রের মৃত্যু ও জীবের মৃত্যু একসাথে নাও ঘটিতে পারে। কারণ, অনেক সময় দেখা যায় জীবের মৃত্যু ঘটার পরও অতি সামান্য সময় হৃৎযন্ত্র কাজ করিতেছে।

মস্তিষ্ক যদিও দেহস্থিত সকল যন্ত্রের অধীশ্বর তথাপি হৃৎযন্ত্রের উপর তাহার বিশেষ কর্তৃত্ব নাই। মস্তিষ্ক ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইহার স্পন্দন বাড়াইতে পারে মাত্র। আকস্মিক ভয়, উত্তেজনা, শ্রম, অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে স্পন্দন দ্রুত হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতি মিনিটে ৬০-৭০ বার।

হৃৎযন্ত্র দেখিতে রক্তবর্ণ একটা মাংসপিণ্ডের মত। প্রায় ৫" লম্বা ও ৪" চওড়া। খানিকটা কচ্ছপের মত। যে পিঠটা সমতল তাহা পিছনের দিকে থাকে, আর কূর্মাকৃতি পিঠটা থাকে সামনের দিকে।

একখণ্ড সাদা সেলোফিন কাগজে একখণ্ড মাংস রাখিলে যেমন দেখায়, তেমনি হৃৎযন্ত্রটি একটি পুরু ঝিল্লির আবরণে সর্বদা আবৃত থাকে। ঝিল্লির ভিতর সর্বদা রসক্ষরণ হয় ও হৃৎপিণ্ডটি সর্বদা ভিজা ভিজা ও স্নিগ্ধ থাকে। এই ঝিল্লির থলিটির নাম পেরিকার্ডিয়ম্।

হৃৎপিণ্ড

হৃৎপিণ্ডের মধ্যে মাংসের দেওয়াল-দ্বারা ভাগ করা চারটি কুঠরি বা খোপ আছে। উপর হইতে নীচের দিকে আসিতে হইলে যে দুইটি প্রকোষ্ঠ পড়িবে সেইখানে দেওয়াল থাকে না, আছে ঝিল্লি-নির্মিত কপাট। এই কপাট এমনভাবে নির্মিত যে, উপরের কুঠরির রক্ত অনায়াসে নীচে চলিয়া আসিতে পারে, কিন্তু নীচ হইতে উপরের কুঠরিতে রক্ত যাইতে পারে না। উপরের কুঠরিকে বলা হয় অরিকল্ বা অলিন্দ, নীচের কুঠরিকে বলা হয় ভেনট্রিকল্ বা নিলয়।

রক্ত সংবহনের সময় রক্ত দুই ভাবে কাজ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ রক্তকে কোষে কোষে খাদ্য সরবরাহ করিতে হয়, আবার তাহাকে অক্সিজেন জোগান দিতে হয়। কাজেই খাদ্য সরবরাহ লইয়া বিভিন্ন কোষের কাছে উপস্থিত হইবার আগেই রক্তস্রোত ফুসফুসে প্রবেশ করে অক্সিজেন সংগ্রহ করিবার জন্য। এই রক্ত একবার ফুস্ফুসের অভ্যন্তরে ঘুরিয়া আসে, তাহার পরই ফুসফুস হইতে বাহির হইয়া যায়। এই উভয় প্রক্রিয়া বজায় রাখিবার জন্যই হৃৎপিণ্ডে এইরূপ ভাগ হইয়াছে।

রক্ত সঞ্চালন প্রণালী—শরীরের বিভিন্ন স্থান হইতে রক্ত দুইটি মহাশিরা দিয়া হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করে। দক্ষিণ অলিন্দ হইতে দক্ষিণ নিলয়ে যায়। হৃৎপিণ্ড পাম্প করার ফলে ঐ রক্ত নিলয় হইতে নির্গত হইয়া আর একটি ধমনীর সাহায্যে ফুস্ফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে অক্সিজেন সংগ্রহ করিয়া ঐ রক্ত বাম অলিন্দে প্রবেশ করে। সেখান হইতে নীচের দিকে নামিয়া বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। সেইখান হইতে পাম্পের দ্বারা ধমনী দিয়া বাহির হইয়া যায়। তাহা হইলে দেখা যায় ডান দিকের উভয় কুঠ্‌রি রক্তকে সাধারণতঃ ফুস্ফুসে প্রেরণ করে, আর বাঁদিকে উভয় কুঠ্‌রি তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু এই উভয় কাজেই একবার পাম্প করিলেই হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম সিস্টোল।

হৃৎপিণ্ডের দুই অংশ এই দুই প্রকার কাজের জন্য। উপরে যে সিস্টোল প্রক্রিয়ার কথা বলা হইল তা হইল সঙ্কুচিত হওয়া। ইহাতে সুবিধা এই যে, বাম অলিন্দের রক্ত বাম নিলয়ে প্রবেশ করে। নিলয় হইতে রক্তবহানালী দিয়া স্বতন্ত্র পথে রক্ত প্রবাহিত হয়। এই সময়েই হৃৎপিণ্ড আবার প্রসারিত হয়। এই অবস্থার নাম ডায়াস্টোল। ফাঁপা অবস্থায় রক্ত আবার আসিয়া প্রবেশ করে। ফুস্ফুস হইতে অক্সিজেন লইয়া রক্ত ডানদিকে প্রবেশ করে আর শরীরে সরবরাহ করা রক্ত আসিয়া বাম দিক দিয়া প্রবেশ করে।

পরিপাকযন্ত্র—পাকস্থলী (Stomach): শরীরের জীবকোষসমূহ দিবারাত্র খাদ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে। প্রতিটি জীবন্ত কোষ স্বতন্ত্রভাবে এই কার্য করিয়া থাকে। মানুষ খাদ্য গ্রহণ করিবার পর নানা যন্ত্র নানা রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে খাদ্যকে আত্মীকরণ করে। মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিবার পর সেই খাদ্য পরিপাক হইয়া অবশিষ্টাংশ মলদ্বার দিয়া বাহির হওয়া পর্যন্ত সমস্তটাই পরিপাক ক্রিয়া বা পাচনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। মুখগহ্বর হইতে একটি সুদীর্ঘ নল মলধার পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। এই নলটি কোথাও সরু, কোথাও মোটা, কোথাও গুটানো, কোথাও স্ফীত, কোথাও আঁকাবাঁকা, কোথাও সোজা—এইভাবে চলিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ নলটির নাম পৌষ্টিক নালী।

ইহার প্রথম অংশের নাম মুখগহ্বর, তাহার পর গলনালী, অন্ননালী, তাহার পর পাকস্থলী। পাকস্থলীর পর ডিউডেনাম, তাহার পর ক্ষুদ্র অন্ত্র, তাহার পর বৃহদন্ত্র, শেষে মলদ্বার। খাদ্য পৌষ্টিক নালীতে প্রবেশ করিবার পর ইহা সঙ্কুচিত হইয়া খাদ্যকে নিম্নদিকে প্রেরণ করিতে থাকে। খাদ্যকে হজম করিবার জন্য পৌষ্টিক নালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন যন্ত্র ও বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণের সুব্যবস্থা

আছে। তাহা ছাড়া লিভার ও প্যাংক্রিয়াস নামে দুইটি আলাদা যন্ত্র, খাদ্য হজম করিবার যন্ত্র পৌষ্টিক নালীতে পাচকরস প্রেরণ করে।

মুখ—মুখ হইতেই খাদ্য পরিপাকের কাজ শুরু হয়। মুখগহ্বর অন্ন-নালীর সম্মুখে দুই পাশে গাল, উপরে তালু এবং নীচে জিহ্বা দ্বারা ঘেরা থাকে। যখন মুখ বন্ধ করি তখন সম্মুখে, উপরে ও নীচে দুপাটি দাঁত থাকে। মুখের পিছনের ছিদ্রকে গলা বলে। এইখানে থাকে গিল্টি—যাহাকে টন্‌সিল বলা হয়। দাঁত খাদ্যকে ছিঁড়িয়া পিষিয়া চূর্ণ করিতে থাকে। জিহ্বা সেই সময় খাদ্যকে নাড়াচাড়া করিয়া দাঁতের কাজে সাহায্য করিতে থাকে। যখন মুখের মধ্যে চিবানোর কাজ চলে তখন জিভের দুই পাশের লালাগ্রন্থি হইতে তিন রকম লালারস নিঃসৃত হইয়া খাদ্যকে নরম করিয়া ফেলে। ইহার ফলে খাদ্য নরম হইয়া যায় এবং গিলিতে কষ্ট হয় না। কাণের পাশে এক জোড়া লালা গ্রন্থি আছে, তাহার নাম প্যারটিড গ্ল্যাণ্ড। এক জোড়া আছে চোয়ালের হাড়ের আড়ালে, তাহার নাম সাব্‌ ম্যাক্সিলারি গ্লাণ্ড, আর একজোড়া জিভের দুই পাশে, তাহাদের নাম সাব্‌লিংগুয়্যাল গ্ল্যাণ্ড।

এই গ্ল্যাণ্ডগুলির আকৃতি গুচ্ছে গুচ্ছে জড়ানো লম্বাটে ধরণের থলির মত। থলির গায়ে ছোট ছোট কোষ হইতে রস সরু সরু নল দিয়া বাহিরে আসে। সরু সরু নলগুলি একত্র মিলিত হইয়া অপেক্ষাকৃত মোটা নলে পরিণত হয়। মোটা নল মুখ-গহ্বরে উন্মুক্ত হয়। লালারসের ভিতর ক্ষার জাতীয় টায়ালিন আছে। টায়ালিন শর্করাপ্রধান খাদ্যকে জারিত করে। মানুষ ও অন্যান্য গবাদি পশুর মুখের লালায় টায়ালিন থাকে। বাঘ সিংহ ইত্যাদির থাকে না।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য মুখের টায়ালিনে জারিত হইয়া প্রথমে ডেক্সট্রেজে ও তাহার পর ধীরে ধীরে মলটোজে রূপান্তরিত হয়। তাহার পর পেটের মধ্যে গিয়া গ্লুকোজে পরিণত হয়।

শিশুদের লালায় টায়ালিন থাকে না। সেই জন্য দুগ্ধপোষ্য শিশুদের খাদ্য হিসাবে শটি, বার্লি ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। টায়ালিনের সাথে অম্ল মিশিলে টায়ালিনের হজমী-ক্রিয়া বন্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, গরম জিনিসের উপর টায়ালিন ভাল ক্রিয়া করে।

অন্ননালী—মুখগহ্বর হইতে খাদ্য ঢোক গিলিবার সঙ্গে সঙ্গে গলনালীতে প্রবেশ করে। গলনালী হইতে নামিয়া প্রায় ১০" লম্বা অন্ননালীতে প্রবেশ করে। অন্ননালীর মধ্যে পরিপাক-ক্রিয়া ঘটে না। তবে খাদ্য বহন করে। খাদ্য নিজের ভারে কখনও নীচের দিকে নামিতে পারে না। কারণ অন্ননালী ফাঁপা অবস্থায় থাকে না। চ্যাপ্টা মত থাকে। খাদ্য প্রবেশ করিবার পর অন্ননালীতে সঙ্কোচন শুরু হয় এবং খাদ্যকে চাপ দিয়া নীচে ঠেলিতে থাকে। যতই খাদ্যকে নীচে ঠেলা হয় ততই চ্যাপ্টা নল ফাঁপা হয় এবং উপরের পেশীর সঙ্কোচন-জনিত চাপে খাদ্য নীচে নামিতে থাকে।

এই প্রক্রিয়াকে পেরিষ্টলসিস বলে। খাদ্যকে অন্ননালী পার করিতে প্রায় ৮ সেকেণ্ড সময় লাগে।

অন্ননালী বা গ্রাসনালীর (Esophagus) সম্মুখে শ্বাসনালী। শ্বাসনালীর মুখে একটা ঢাকনা থাকে। তাড়াতাড়ি খাদ্য গ্রহণের ফলে অনেক সময় খাদ্যদ্রব্যের সামান্য অংশ শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিলে বিষম লাগে।

পাকস্থলী—খাদ্য পৌষ্টিকনালী দিয়া পাকস্থলীতে প্রথম পৌছায়। ইহা দেখিতে আড়াআড়ি ভাবে মশকের মত। পাকস্থলীর ভিতরের দিকে গায়ে প্রায় লক্ষাধিক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গ্রন্থি আছে। সেই সকল গ্রন্থি হইতে রস নির্গত হয়। প্রধাণতঃ তিন জাতীয় রস ক্ষরিত হয়। (১) হাইডোক্লোরিড অ্যাসিড, (২) পেপসিন, (৩) রেনিন। হাইডোক্লোরিড অ্যাসিড মূলতঃ অম্লরস। পেপসিন যাবতীয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে কতকটা হজম করে। রেনিন দুধ জাতীয় পদার্থকে ছানায় রূপান্তরিত করে। পাকস্থলীতে সর্বদাই রস নির্গত হয়। খাদ্য পৌছাইলে বা তাহার সম্ভাবনা দেখা দিলে তবেই রস নিঃসরণ শুরু হয়। পাকস্থলীতে খাদ্য পৌছানোর কিছুক্ষণ পরেই পাকস্থলীতে সংকোচন শুরু হয়। ইহাতে ভিতরকার খাদ্য জারিত হয়। বিকৃত খাদ্য পাকস্থলীতে গেলে ইহা উল্টা দিকে মোচড় দিতে থাকে। তাহাতে বমি বমি লাগে। পাকস্থলীতে খাদ্য ক্রমশঃ তরলভাবাপন্ন মণ্ডে পরিণত হয় ও নিগমদ্বারের নিকটে পৌছিয়া অন্ত্রে প্রবেশ করিতে থাকে।

অন্ত্র—পাকস্থলীর নিগমদ্বারের পর হইতে যে অংশ মলদ্বার পর্যন্ত প্রসারিত, তাহাকে অন্ত্র বলা হয়। ইহা দুই অংশে বিভক্ত। ক্ষুদ্র অন্ত্র ও বৃহৎ অন্ত্র। ক্ষুদ্র অন্ত্রটি প্রায় একুশ ফুট লম্বা এবং সরু নল। এই ক্ষুদ্র অন্ত্রটিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশের নাম গ্রহণী বা ডিওডিনাম। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম দিকের ১০" পরিমাণমত নলটি এই নামে পরিচিত। এই নলে আর একটি নল মিলিত হইয়াছে। যকৃৎ ও অগ্ন্যাশয় হইতে দুইটি নল বাহির হইয়া একটি নলের সৃষ্টি হইয়াছে। সেই নলটি ডিওডিনামে মিলিয়াছে। এই অংশেই প্রধানতঃ হজমের কাজ বেশী হয়। দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় জেজুনম্। জেজুনম্ নামক অংশে জারিত খাদ্যকে ছাঁকিয়া নেওয়ার কাজ আরম্ভ হয়। এই অংশে অন্ত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধাষের শীষের মত সরু সরু শুঁয়া থাকে। ইহাদের নাম ভিলাই। ইহারা পিচকারীর মত খাদ্যরসটিকে টানিয়া লইতে থাকে। কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন টানিয়া নিকটস্থ রক্ত শিরার মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। ঐ কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন গ্লাইকোজেনে পরিণত হইয়া যকৃতে মজুত থাকে এবং প্রয়োজনমত রক্ত, স্রোতে গিয়া মিশে।

গ্রহণীই সকল খাদ্যের প্রধান হজম স্থান। ইহার নিজস্ব পাচকরসের নাম আন্ত্রিকরস। ইহা ছাড়া দুই প্রকার পাচকরস বাহির হইতে আনিয়া থাকে—অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্তরস। অগ্ন্যাশয় প্রোটিন জাতীয় খাদ্যকে এবং পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে হজম করিতে সাহায্য করে।

হজম ও শোষণ হইয়া যাইবার পর খাদ্যে যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহা ক্ষুদ্র অন্ত্র হইতে বৃহৎ অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে। ইহা প্রায় ৬ ফুট লম্বা। ইহার একমাত্র কাজ খাদ্যের অবশিষ্টের জলীয় অংশ ও কিছু লবণাদি শোষণ করা এবং শেষে আবর্জনা বাহির করিয়া দেওয়া।

ফুসফুস (Lungs) : ফুস্‌ফুস যন্ত্র একটি ঘনসন্নিবদ্ধ অসংখ্য বায়ুকোষের সমষ্টি। ইহার বায়ুকোষগুলি গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি। এইগুলির দেওয়াল অতিশয় পাতলা। বায়ুকোষের ভিতরে থাকে বায়ু, আর দেওয়াল জড়াইয়া থাকে জালকনালী। জালকনালীর আবরণও খুব পাতলা। সুতরাং এইখানে জালকের রক্তের সঙ্গে বায়ু-কোষের বায়ুর সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে। ইহার পিছনের গ্রাসনালী সর্বদাই বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র খাদ্য খাইবার সময় খুলিয়া যায়। শ্বাসনালী সর্বদাই খোলা থাকে। হৃৎপিণ্ড হইতে শিরাপথে দূষিত রক্ত আসিয়া জালকের মাধ্যমে বায়ুকোষের বায়ুর সংস্পর্শে বিশুদ্ধ হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করিয়া অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাহার পর ধমনীর জালকের মাধ্যমে ধমনীপথে বিশুদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে। সঙ্কোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে ফুস্‌ফুস নিজের অশুদ্ধ বায়ু বাহির করে ও বাহির হইতে বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করে। ফুস্‌ফুস নিজে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে না। ইহা হাপর-যন্ত্রের মত অন্যের চালনায় ক্রিয়াশীল হয়। বুকের ও পেটের মাংসপেশী-সমূহের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে শ্বাসকার্য চলে।

ফুস্‌ফুস যন্ত্রটি একটি ঝিল্লির চাদর দিয়া আগাগোড়া মোড়া থাকে। ইহা দেখিতে অনেকটা গোলাপী স্পঞ্জের ন্যায় ফাঁপা। ফুস্‌ফুস দুইটির আকৃতি সমান নয়। ডান দিকের ফুস্‌ফুস বামদিকের চেয়ে কিছু বড়।

সাধারণ সংক্রামক ব্যাধি

(Common Infectious Diseases)

জীবন ধারণ করিতে হইলে নানা রকম অসুখ-বিসুখে ভুগিতে হয়। তাহার হাত হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না। সেইজন্য শরীরকে অনেক সময় ব্যাধিমন্দির বলা হইয়া থাকে। নানারকম অসুখের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা প্রধানতঃ সংক্রামক রোগে ভুগিয়া থাকে। খোস, পাঁচড়া, ডিপথিরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সাধারণতঃ সংক্রামক ব্যাধি।

প্রত্যেক প্রকারের সংক্রামক ব্যাধিরই প্রধান কারণ হইতেছে রোগ-জীবাণু। জীবাণু দ্বারা যে ব্যাধি সংঘটিত হয় সেই সকল ব্যাধি সংক্রমণশীল। জীবাণুর কার্যকারিতা অবশ্য দেহের উপর নির্ভর করে। আমাদের চারিদিকে অসংখ্য রোগ-জীবাণু, কিন্তু আমরা সকল সময় অসুস্থ হইয়া পড়ি না। তাহার কারণ অনেক ক্ষেত্রে রোগ জীবাণু আক্রমণ করিয়াও কিছু করিতে পারে না। দেহের যে প্রচণ্ড প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে, তাহা দ্বারাই রোগসৃষ্টির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। সাধারণতঃ অপরিচ্ছন্ন, রুগ্ন, দুর্বল, অপুষ্টিজনিত খাস্থ্যপ্রাপ্ত, জীবনীশক্তি শূন্য দেহেই রোগ আক্রমণ করিয়া থাকে।

জীবাণু কি—অসুস্থ ক্ষুদ্র জীবকেই বলা হয় জীবাণু। প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকারের জীবাণু আছে। সকল জীবাণুই রোগ বহন করিয়া আনে না। জীবাণুরা সাধারণতঃ মাইক্রোবস (Microbs), জার্মস (·Germs), ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ইত্যাদি নামে পরিচিত। যে সকল জীবাণু সরল দণ্ডাকৃতি তাহাদের বলা হয় ব্যাসিলাই (Bacilli) এবং যেগুলি বক্র সেইগুলিকে কোকাই (Cocai) বলা হইয়া থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত জীবাণুগুলিকে দেখা যায় না।

সাধারণতঃ রোগীর কফ, থুতু, মুখের লালা, মলমূত্র, ক্ষতস্থানের পুঁজ ইত্যাদিই হইতেছে রোগ-জীবাণুর প্রধান আশ্রয়স্থল।

জীবাণু সংক্রমণের পথ—রোগীর দেহনিঃসৃত বিভিন্ন দূষিত পদার্থকে ও জীবাণুরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে এবং উহা খাদ্য ও পানীয়কে দূষিত করে। কিছু হাওয়ায় সংক্রমিত হয়, কিছু মাটিতে থাকিয়া যায়। আবার দেখা যায় কোন কোন প্রাণী কোন কোন রোগজীবাণুর বাহক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পথে রোগ-জীবাণু দেহে সংক্রমিত হয় :

(১) পরস্পরের দ্বারা বায়ুর সাহায্যে প্রশ্বাসের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে অনেক রোগ এক দেহ হইতে অন্য দেহে যায়। যে সব রোগ সাক্ষাৎ সংস্পর্শ দ্বারা ঘটে, সেইগুলিকেই আমরা সংক্রামক রোগ বলিয়া থাকি। হাত দিয়া ছোঁয়া ছাড়া রোগীর জামা কাপড় বিছানা ব্যবহার করা ইত্যাদি হইতে সংক্রামক রোগ হয়। অনেক রোগ-জীবাণু রোগীর দেহ হইতে হাঁচি, কফ, থুতুর সঙ্গে বাহির হইয়া হাওয়ায় মিশিয়া যায় এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জীবাণু বায়ুর দ্বারা দেহে প্রবেশ করে এবং মানুষকে রোগগ্রস্ত করে। সেই রোগগুলি হইতেই সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাসি, বসন্ত, হাম, যক্ষ্মা ইত্যাদি হইয়া থাকে।

(২) খাদ্য ও পানীয়ের সহিত। থুতু, কাশি, কফ ইত্যাদি শুষ্ক হইয়া ধূলার সঙ্গে মিশ্রিত হয় এবং কীট-পতঙ্গাদি বা বায়ুর সাহায্যে উড়িয়া গিয়া পানীয় ও খাদ্যকে দূষিত করিয়া থাকে। এইভাবে তাহারা দেহাভ্যন্তরে গিয়া নানাবিধ রোগের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। টাইফয়েড্, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগ এইভাবে হয়।

(৩) কীটাদি দংশন বা ক্ষতযুক্ত দেহচর্মের সাহায্যেও রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। এই কারণে দেহে কোনও রূপ ক্ষত হইলে উহার যত্ন লওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে ঐ ক্ষত স্থানের মধ্য দিয়া রোগ-জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং সুস্থ ব্যক্তির রক্ত দূষিত করিতে পারে। ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, ধনুষ্টংকার, জলাতঙ্ক রোগ এইভাবে হয়।

(৪) মাটির মাধ্যমে—মলমূত্রাদি আবর্জনা মাটিতে পড়িয়া শুকাইয়া যায় ও ক্রমশঃ ধূলায় পরিণত হয়। কিন্তু ভিজা মাটির ও ছায়ার আশ্রয়ে মানুষ ও পশুর দেহ হইতে নির্গত রোগ-জীবাণু বাঁচিয়া থাকে এবং ধূলার রেণুতে রেণুতে সংলগ্ন হইয়া থাকে। তাহার পর নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, জলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। আবার কোন কোন কৃমির ডিমও মাটির সহিত মিশিয়া থাকে।

রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশের পর ব্যাধির লক্ষণ—রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলে দেহে একপ্রকার বিষ বা Toxin নিঃসৃত হয় এবং উহা রক্তদুষ্টি ঘটায়। কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তির দেহেও চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। দেহের মধ্যে এক প্রকারের জীবাণু প্রতিষেধক বিষ বা Anti toxin জন্মে এবং জীবাণুদের বাধা দেয়।

এই বাধা দিবার ফলে অনেক সময়েই দেখা যায় রোগীর হাঁচি, কাশি, বমি, পায়খানা হয়। এই উপসর্গগুলি হইতেছে জীবাণুগুলিকে দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার একরূপ প্রচেষ্টা।

কয়েকটি সংক্রামক রোগ

টিটেনাস বা ধনুষ্টংকার (Tetanus): এই রোগের জীবাণুর একপ্রকার বীজ-রেণু থাকে, তাহা সহজে নষ্ট হয় না। গরু, ঘোড়া প্রভৃতি যখন চরিয়া বেড়ায়, তখন ঘাসের সঙ্গে সেই রেণু তাহাদের উদরস্থ হয় ও পরে বিষ্টার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে বাহির হইয়া আসে। আবার মাটিতে আশ্রয় লয়। কাজেই গরু ঘোড়ার আবাসস্থলে এই রোগ-জীবাণু থাকা স্বাভাবিক। দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে সেখানে ঐ রোগ-জীবাণুযুক্ত মাটির সংস্পর্শ লাগিলে জীবাণু মাটি হইতে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। ফলে তাহাকে সংক্রমিত করে এবং তাহাতেই এই মারাত্মক রোগ জন্মায়।

টাইফয়েড (Typhoid fever): এই রোগের জীবাণু রোগীর মলের সহিত নির্গত হইয়া মাটিতে গিয়া মিশে এবং তাহা হইতে পরে শেষ পর্যন্ত জলের সহিত মিশ্রিত হয়।

হাম (Measles): সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে হাম অন্যতম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেশী হয়। অনেক শিশু এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায়। প্রথম হইতেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

সর্দি ও কাশির সঙ্গে কয়েক দিন জ্বর ভোগের পর সারা গায়ে ঘামাছির মত চাকা চাকা দাগ ফুটিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও বাড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে চিকিৎসার গুণে সুস্থ হইলেও শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। এই সময় আবার উদরাময় দেখা যায়।

হাম রোগীকে সাবধানে রাখিতে হয়, যেন ঠাণ্ডা না লাগে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাসযুক্ত ঘরে রাখিতে হইবে। ডাক্তারের নির্দেশ মত পথ্য দিতে হইবে। অনিয়ম হইলে এই রোগ হইতে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া হইতে পারে ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রোগীর থুতু, সর্দি, কাশি দ্বারা হামের জীবাণু ছড়ায়। কাজেই বাড়ির অন্য শিশুদের সর্বদাই রোগীর সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিতে হইবে।

আমাশয়:—আমাশয় আন্ত্রিক ব্যাধি। সাধারণতঃ বর্ষাকালে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আমাশয় দুই রকমের—ব্যাসিলারী ও অ্যামেবিক। রোগ-জীবাণু শরীরে প্রবেশের ২ দিন থেকে, সপ্তাহের মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

অন্ত্রে ঘা হওয়াই এই অসুখের প্রধান রূপ। সেইজন্য পেটে যন্ত্রণা হয়। বার বার মোচড় দেয়, অল্প অল্প দাস্ত হয়। কখনও রক্ত কখনও বা আম দাস্ত হয়। শেষের দিকে রক্তের সঙ্গে পুঁজ পড়ে। বার বার দাস্ত হয়, রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ আমাশয়ের জীবাণু খাদ্য ও পানীয়ের সঙ্গে দেহে প্রবেশ করে।

আমাশয় রোগাক্রান্তকে অবিলম্বে সুচিকিৎসা ও লঘু পথ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। আমাশয়ের রোগীর মলমূত্র মাটিতে পুতিয়া ফেলিতে হয়।

আমাশয় রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, টাটকা পুষ্টিকর পরিমিত ভোজন ও উপযুক্ত পানীয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কৃমিরোগ ঃ প্রায়শঃই ছেলে-মেয়েরা কৃমিরোগে ভুগে। কৃমির জীবাণু মাটি ও জলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। এই রোগে আক্রান্ত হইলে উদরাময়, অজীর্ণ আমাশয় হইতে পারে। রোগী রক্তশূন্য ও শীর্ণ হইয়া পড়ে। সে বদমেজাজী ও খিট্‌খিটে স্বভাবের হয়। কৃমি কয়েক প্রকারের হইয়া থাকে। যেমন—কেঁচো কৃমি (Round worm), ফিতা কৃমি (Tape worm), সুতা কৃমি (Thread worm), বক্রক্রিমি (Hook worm)।

কৃমির আক্রমণ হইতে সাবধান হইতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। (১) যেখানকার জলে মাটি হইতে জীবাণু গিয়া প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা আছে কিংবা পুকুরপাড়ে বা নদীর পাড়ে লোকে যেখানে মলত্যাগ করে সেখানকার জল পান করা বা গৃহস্থালীর কাজে না লাগান। এবং (২) পল্লীগ্রামের মাঠে জঙ্গলে খালি পায়ে চলা অথবা সেখানে বসিয়া মলত্যাগ করা উচিত নয়।

ডিপথেরিয়া (Diptheria) ঃ শিশু ও কিশোর বয়সের ছেলেমেয়েদের এই রোগের আক্রমণ হইতে পারে। সর্দিকাশির সঙ্গে গলা ও শ্বাসনালী আক্রান্ত হয়। সুচিকিৎসার অভাব হইলে রোগী অচিরে মারা পড়ে।

রোগাক্রান্ত হইলে গলায় ও নাকে ঘা হয়, গ্রাণ্ড ফুলে—কিছু খাইতে বা নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়। খুব তাড়াতাড়ি এই রোগের বৃদ্ধি ঘটে।

ডিপথেরিয়া অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। একজনের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের ও অন্যান্য শিশুদের হইতে তাহাকে একেবারে পৃথক্ রাখিতে হইবে। তাহার ব্যবহৃত জামাকাপড় বা অন্যান্য জিনিস পুড়াইয়া ফেলা উচিত। অন্য শিশুদের প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান দিতে হইবে। রোগীকে প্রতিষেধক (anti-toxin) ইঞ্জেকশান ও অন্যবিধ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বিদ্যালয়ের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। যে বাড়ির একজন শিশুর ডিপথেরিয়া হয় সেই বাড়ির অন্য শিশুদের ডাক্তারী পরীক্ষা করাইয়া রোগ জীবাণু সম্পর্কে সন্দেহ মুক্ত হইয়া তবে তাহাদের বিদ্যালয়ে আসিতে দেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের সব শিশুদের পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান দিতে হইবে।

জল বসন্ত (Chicken Pox) ঃ যদিও জল বসন্ত গুটি বসন্তের (small pox) মত মারাত্মক নয়, তথাপি অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও অত্যন্ত সংক্রামক। কোন বাড়িতে

একজনের হইলে প্রায় সকলের ও গ্রামের অনেকের ঐ রোগ হইয়া থাকে। ইহার কারণ অবশ্য সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক ব্যবস্থা ঠিকমত অনুসরণ না করা।

সর্দি ও জ্বর এবং গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা হয়। দুই তিন দিন পর হইতেই গায়ে গুটি বাহির হয়। ফোস্কার মত গুটির ভিতরে জল থাকে। জ্বর চলিতে থাকে। গুটিগুলি ক্রমে পাকে ও শেষে শুকাইয়া যায়।

এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। ভাল হইয়া ঘায়ের মামড়ি উঠার সময় সংক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী। রোগীকে সব সময় সকলের হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ ঘরে মশারীর মধ্যে রাখিতে হয়। তাহার ব্যবহৃত জিনিসপত্র যাহাতে বাহিরে না আসে। মামড়ি উঠার সময় মামড়িগুলি তুলিয়া পুড়াইয়া ফেলিতে হয়। রোগীর জামা-কাপড় ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিসপত্র জীবাণুনাশক ঔষধে পরিশুদ্ধ করিতে হয়।

বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের জল-বসন্ত হইলে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে পাঠাইতে হইবে। সেই পরিবারের কোন ছেলে মেয়ে যাহাতে বিদ্যালয়ে না আসে তাহা দেখিতে হইবে। অসুখ সারিয়া গেলেও, তার কিছুদিন পর রোগীকে বিদ্যালয়ে আসার অনুমতি দিতে হইবে।

প্রত্যেক শিশু যাহাতে প্রাথমিক টিকা লয়, শিক্ষকরা সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। প্রতি বৎসর বিদ্যালয়ে যাহাতে বসন্ত প্রতিষেধক টিকা দেওয়া হয়, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দিকে নজর দিবেন।

চর্মরোগ (Skin diseases): ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চর্মরোগের কবলে পড়িতে দেখা যায়। সাধারণতঃ নোংরা থাকিবার ফলে রোগ-জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। চর্মরোগের মধ্যে চুলকানি, খোসপাঁচড়া, দাদ, একজিমা প্রভৃতি।

খোস-পাঁচড়া—খোস-পাঁচড়া অত্যন্ত কুৎসিৎ রোগ। অত্যন্ত সংক্রামকও বটে। রোগ-জীবাণু হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে আশ্রয় লয় ও বংশ বৃদ্ধি ঘটায়। রোগের প্রকাশ ঘটিলে আঙ্গুলের ফাঁকে অত্যন্ত চুলকায় ও ঘা হয়। গুটি জন্মায় ও পুঁজে ভর্তি হয়। ক্রমে ইহার বিস্তার ঘটে। হাতে পায়ে ও গায়ে খোসের গুটি বাহির হয়। খোস অত্যন্ত চুলকায়, রক্ত পুঁজ বাহির হইয়া পড়ে এবং এই রক্ত ও পুঁজে অসংখ্য রোগ-জীবাণু থাকে। ইহা হইতে রোগ ছড়ায়। তাহা ছাড়া রোগীর ব্যবহৃত গামছা, পোশাক ও অন্যান্য ব্যবহৃত জিনিস-পত্রের মাধ্যমে রোগের বিস্তৃতি ঘটে।

এই রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইতে গেলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকাই শেষ কথা। নিয়মিতভাবে গরম জল ও কার্বলিক সাবান দিয়া পাঁচড়ায় আক্রান্ত স্থানটি ধুইতে হইবে। সালফার জাতীয় ঔষধ খোসের পক্ষে ভাল। রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ, গামছা নিয়মিত সোডায় ফুটাইয়া লইতে হয়।

বিদ্যালয়ে কোন ছাত্রের খোস-পাঁচড়া হইলে তাহাকে স্কুলে আসিতে দেওয়া চলিবে না। তাহার আশু নিরাময়ের জন্য তাহার পিতামাতাকে পরামর্শ দিতে হইবে। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে পরিচ্ছন্ন থাকে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সে দিকে নজর দিবেন।

দাদ (Ring-worm) : দাদ আর এক রকমের কুৎসিৎ চর্মরোগ। অত্যন্ত ছোঁয়াচে। রোগীর সংস্পর্শ বা তাহার ব্যবহৃত গামছা, তোয়ালে ও অন্যান্য বস্তুর মাধ্যমে রোগ-জীবাণু অন্য দেহে সংক্রমিত হয়। পিঠ বা দেহের যে কোন স্থান আক্রান্ত হইতে পারে। আক্রান্ত স্থান প্রথমে অত্যন্ত চুলকায় ও পরে চাকার মত দাগ স্পষ্ট হয়। সেই জায়গাটি সামান্য ফুলিয়া উঠে ও ছোট ছোট গুটির মত দেখা যায়।

দাদও অপরিচ্ছন্নতা-জনিত চর্মরোগ। স্থানটি বার বার গরম জল দিয়া পরিষ্কার করিতে হইবে ও ঔষধ লাগাইতে হইবে। রোগীর জামা কাপড় ও গামছা যেন অন্য কেউ স্পর্শ না করে। সেইগুলি সোডায় ফুটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে কোন ছেলে-মেয়ের দাদ হইলে তাহাকে স্কুলে আসিতে না দেওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

সংক্রামক রোগ নিবারণ ও প্রতিষেধক ব্যবস্থা : সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে পূর্ব হইতে সাবধান হইলে অনেক অসুখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় এবং রোগাক্রান্ত হইলেও উহার ব্যাপকতা দমন করা যাইতে পারে।

পাঁচটি উপায়ে এই রোগ নিবারণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যেমন—

(১) বিজ্ঞপ্তিকরণ (Notification)। (২) প্রতিষেধনের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করা (Immunisation)। (৩) সুস্থ ব্যক্তিকে রোগীর নিকট হইতে দূরে রাখা বা স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation and Quarantine)। (৪) গৃহের পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্ন রাখা (Sanitation)। (৫) জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বাস করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া (Health Education)।

(১) বিজ্ঞপ্তিকরণ : টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি মারাত্মক রোগ দেখা দিলে রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীকে জানাইতে হইবে। তিনি সংবাদ পাইলেই নিজ অঞ্চল সম্পর্কে সতর্ক হইবেন এবং রোগ যাহাতে ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। প্রতিবেশীদের সতর্ক করা, স্থানীয় জল পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, টিকা বা প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান দেওয়া, রোগীদের স্থানান্তরিত করা ইত্যাদি নানা উপায়ে রোগ বিস্তার নিবারণ করিতে পারেন।

(২) ব্যক্তিগত প্রতিষেধন : প্রত্যেক সুস্থ ব্যক্তির দেহেই রোগ প্রতিরোধ করিবার জন্য স্বাভাবিক শক্তি আছে। উহাকে বলা হয় ইমিউনিটি বা অনাক্রম্য শক্তি। এই শক্তি বেশী মাত্রায় থাকিলে রোগ সহজে অক্রমণ করিতে পারে না। অবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় একবার ঐ রোগ হওয়ার ফলে শরীরে ঐ প্রতিরোধ শক্তি জন্মিয়াছে। এই শক্তি চিরস্থায়ীও হয় আবার কিছুদিনের জন্যও হয়। বসন্ত, হাম, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ একবার হইলে অনেক সময় আর হয় না। পক্ষান্তরে, কোন কোন সংক্রামক রোগের জীবাণুকে ব্যক্তির শরীরে অল্পমাত্রায় প্রবেশ করাইয়া তাহার শরীরে রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি বাড়ান হয়। যেমন, বসন্ত রোগের টিকা। টিকা দিলে কিছুদিন বসন্তরোগের প্রতিরোধ শক্তি থাকে।

টিকা বৎসর বৎসর কিংবা কয়েক বৎসর অন্তর দিয়া ঐ রোগের প্রতিরোধ গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগকে নিবারণ করিবার জন্য টিকা, ইঞ্জেকশান ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩) **স্বতন্ত্রীকরণ:** সংক্রামক রোগ যাহাতে সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত না হইয়া পড়ে সেজন্য রোগ বহন করিয়া আনিয়াছে এইরূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে এবং সংক্রামিত ব্যক্তিদিগকে আলাদা করিয়া রাখিবার প্রয়োজন আছে।

কোনও একটি দেশের জাহাজ বা অন্য যানে যাত্রী লইয়া অন্য দেশে আসিলে এবং সেই দেশে কোন রোগের প্রাদুর্ভাব থাকিলে ও টিকা বা প্রতিষেধক ইন্‌জেকশনের সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে সন্দেহজনক ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাকে ঐ দেশে নামিতেই দেওয়া হয় না। ইহাকে বলা হয় নিরোধন বা quarantine।

ইহা ছাড়া স্থানীয় নিরোধনের ব্যবস্থাও থাকা বিধেয়। ইহার অর্থ এই যে, কোনও লোকের বাড়িতে যদি সংক্রামক রোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই বাড়ির সকল লোককেই কিছুকালের জন্য গৃহে আটক থাকিতে হইবে। যতদিন পর্যন্ত ঐ রোগের সংক্রমণকাল অতীত না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত তাহাদিগকে স্কুল, কলেজ, কাছারী ইত্যাদিতে যাইতে দেওয়া হইবে না। ইহাতে রোগটি ছড়াইতে পারে না।

স্বতন্ত্রীকরণের অর্থ হইতেছে, রোগীকে অন্যান্য ব্যক্তি হইতে আলাদা করিয়া রাখা। অর্থাৎ সুস্থ ব্যক্তি যাহাতে রোগীর সংস্পর্শে না আসিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থার ফলে রোগ ছড়াইতে পারে না। কয়েকটি বিশেষ ব্যাধি, যথা—হাম, বসন্ত, ডিফথেরিয়া, হুপিং কাশি, প্লেগ, টাইফয়েড, জ্বর ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ খুবই আবশ্যক। স্বতন্ত্রকরণ দুই ভাবে হইতে পারে—

(১) হাসপাতালে স্বতন্ত্রীকরণ এবং গৃহে স্বতন্ত্রীকরণ। প্রত্যেক বড় বড় শহরেই সংক্রামক ব্যাধির জন্য আলাদা হাসপাতাল আছে। কলেরা, বসন্ত, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি রোগ দেখা দিলেই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ইহার ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে আর সেই রোগ ছড়াইতে পারে না।

গৃহে অন্তরীণ করিবার অর্থ নিজের ঘরেই আলাদা করিয়া রাখা হয়। সেইখানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি মানিয়া চলিতে হয়—

(ক) রোগীর জন্য যে স্বতন্ত্র ঘর, সেই ঘরে নার্স বা শুশ্রূষাকারী ছাড়া আর কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। (খ) শুশ্রূষাকারী কাপড় ছাড়িয়া এবং বিশোধক দ্রব্যের সাহায্যে হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া অপরকে স্পর্শ করিতে পারিবে। (গ) রোগীর ঘর হইতে কোন জিনিস বাহিরে আনিয়া অন্য জিনিসের সঙ্গে মিশাইয়া রাখা অসঙ্গত। রোগীর ঘর প্রকৃতপক্ষে বন্ধই থাকিবে। (ঘ) রোগীর মলমূত্রাদি ভালভাবে নির্বীজিত করিয়া সাবধানে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিতে বা পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। রোগীর ব্যবহৃত কাপড়-জামাও নির্বীজিত করিয়া পোড়াইতে হইবে। (ঙ) রোগীর আহারের পর পরিত্যক্ত খাদ্যাদিতে যেন মাছি

না বসে, সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। রোগীর খাদ্য সর্বদা ঢাকা অবস্থায় থাকিবে। (চ) বসন্ত-ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে সর্বদাই ঢাকা মশারীর মধ্যে রাখিতে হইবে। (ছ) বসন্তরোগীর গুটির খোসা ও কাপড়-চোপড় পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে।

(৪) গৃহের পরিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নকরণ: গৃহ পরিবেশ ও তাহার পারিপার্শ্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখাই হইল স্বাস্থ্য-বিধির প্রথম কথা। আমরা জানিয়াছি রোগ-জীবাণু দ্বারা সর্বপ্রকার সংক্রামক রোগের সৃষ্টি হয় এবং রোগীর দেহ পরিচ্ছদ ইত্যাদি যে সকল জীবাণু মলমূত্র, সর্দি, থুতু ইত্যাদির দ্বারা ছড়ায় তাহা অন্য দেহে প্রবৃষ্ট হওয়ায় রোগের বিস্তার ঘটে। জীবাণুযুক্ত আবর্জনা যদি সর্বত্র অপরিষ্কার করিয়া রাখে তাহা হইলে সহজেই অনেকে রোগগ্রস্ত হইতে পারে।

কাজেই দেখিতে হইবে, গৃহপরিবেশ ও পরিমণ্ডল যেন আবর্জনা-মুক্ত হয়। রোগ-বীজাণু যেন জমিতেও বিস্তার লাভ না করিতে পারে। পানীয় জলে যেন আবর্জনা না পড়ে। পানীয় ও ব্যবহার্য জল অবশ্যই বিশুদ্ধ রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া বিভিন্ন উপায়ে জীবাণু মুক্ত করিবার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

(৫) জনসাধারণকে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বাস করিবার শিক্ষা দেওয়া: যে কোন প্রতিষেধক ব্যবস্থাই লওয়া হউক না কেন, টিকা বা ইঞ্জেকশান দেওয়া হউক, জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সত্যকারের চেতনা না হইলে সুস্থ সমাজ রচনা সম্ভব নয়। কাজেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য জনসাধারণকে স্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে হইবে।

এই দায়িত্ব কেবল সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের উপর দিলেই চলিবে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়কেও সক্রিয়ভাবে এই পর্যায়ে কাজ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে ব্যক্তিগত ও সমাজগত স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বাস্তব শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের অভ্যাস করাইতে হইবে।

ইহা ছাড়াও স্বাস্থ্য-বিভাগ জনসাধারণকে সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে নানাভাবে শিক্ষা দিবেন। হাটে, বাজারে, বিদ্যালয়ে, গ্রামে প্রচার প্রদর্শনী, পোষ্টার, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ন ইত্যাদির মাধ্যমে জনশিক্ষার দ্বারা এই বোধ জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিবেন।

নির্বীজন পদ্ধতি (Methods of Disinfection)

রোগ-জীবাণু ধ্বংস করিয়া ফেলাই হইল রোগ হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র পথ। ইহাকেই নির্বীজন বলে।

প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে নির্বীজন করা যায়। যথা—(১) প্রাকৃতিক উপায়ে, (২) উত্তাপের সাহায্যে ও (৩) রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা।

১। প্রাকৃতিক উপায়ে—প্রাকৃতিক উপায়ে স্বাভাবিকভাবে রোগ-জীবাণু নষ্ট হইতে পারে। সূর্যকিরণ সর্বরোগহর। অর্থাৎ প্রখর সূর্যালোক রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। আর্দ্রতা জীবাণুর পক্ষে অনুকূল, কিন্তু শুষ্কতায় অনেক জীবাণু মরিয়া যায়। কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণু রৌদ্রতাপে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়।

সেইজন্য রোগীর ঘরের চারপাশ যাহাতে রৌদ্রদগ্ধ হইতে পারে তাহা দেখা কর্তব্য। জামা কাপড় বিছানা ইত্যাদি মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া প্রয়োজন।

২। **উত্তাপের দ্বারা**—(ক) জীবাণু-দূষিত পোশাক-পরিচ্ছদ, বিছানা—বিশেষতঃ বসন্ত, কলেরা, প্লেগ, মেনেনজাইটিস্ প্রভৃতি রোগীর জামা কাপড় বিছানা ইত্যাদি পুড়াইয়া দেওয়া উচিত। (খ) উত্তপ্ত বায়ু অথবা উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের স্প্রে দ্বারা ঐ সব জিনিসকে জীবাণুমুক্ত করা যাইতে পারে। (গ) কার্বলিক লোশান, সোডা, ফিনাইল, লাইজল মিশ্রিত জলে দূষিত দ্রব্যাদি ফুটাইলে জীবাণুমুক্ত করা চলে।

জলে সিদ্ধ করিলেও বস্তুর সংক্রামতা সহজে বিনষ্ট হয়। বেশ কিছুক্ষণ গরমজলে ফুটাইলে কোন রোগ-জীবাণুই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। টাইফয়েড, কলেরা, যক্ষ্মা প্লেগ, ডিপথেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের জীবাণু অগ্নির উত্তাপে নষ্ট করা যায়। বাসনকোশন ইত্যাদি গরম জলে ফুটাইয়া লইয়া এইগুলিকে নির্বীজন করা যায়।

৩। **রাসায়নিক দ্রব্যের দ্বারা**—রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা নির্বীজন করা যায়। এইসব দ্রব্য রোগ-বীজাণুনাশক। এইগুলি হইল :

(১) **লাইজল**—একভাগ লাইজলের সঙ্গে ৬০ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীর বাসন-পত্র, ঘর ইত্যাদি পরিশুদ্ধ করা যায়। জল-মিশ্রিত লাইজলে ক্ষত পরিষ্কারও করা চলে।

(২) **কার্বলিক অ্যাসিড**—জলমিশ্রিত কার্বলিক অ্যাসিড রোগ-জীবাণুনাশক।

(৩) **ব্লিচিংপাউডার**—রোগজীবাণুযুক্ত স্থানে ব্লিচিং পাউডার ছড়াইয়া দিতে হয়, অথবা ব্লিচিং পাউডার জলে গুলিয়া স্থানটিকে মুছিলে রোগ-জীবাণু মরিয়া যায়।

(৪) **ডেটল**—জল-মিশ্রিত ডেটলে রোগীর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা যায়। হাত পা ধোয়া, ঘর পরিষ্কার ইত্যাদির দ্বারা রোগজীবাণু নষ্ট করা যায়।

(৫) **চুণ**—চুণ জলে ফেলিলে অত্যন্ত উত্তাপের সৃষ্টি হয় ও রোগ-জীবাণু মরিয়া যায়। ডোবার বা কূয়ার জল পরিশুদ্ধ করিতে চুণ ব্যবহার করা চলে।

(৬) **ফিনাইল**—অত্যন্ত জীবাণুনাশক। জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা চলে।

(৭) **পটাশ অব পারমাঙ্গানেট**—জলে গুলিয়া ব্যবহার করা যায়। পটাশ পারমাঙ্গানেট-মিশ্রিত জলে রোগীর কাপড়-চোপড় ধৌত করা ও কূয়ার জলে দিয়া উহাকে জীবাণুমুক্ত করা যায়।

(৮) **গন্ধক**—গন্ধকের ধোঁয়া অত্যন্ত তীব্র ও জীবাণুনাশক। ইহা ছাড়া সাবানও কিছুটা জীবাণু নাশ করে।

এই সব পদার্থ ছাড়াও আয়োডিন, ফর্মালডিহাইড (Formaldehyde), বোরিক অ্যাসিড, ক্লোরিণ ইত্যাদির দ্বারা রোগ-জীবাণু নষ্ট করা যাইতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পালন

(Hygiene and Body Activity)

যেমন নূতন গাড়ি কিনিয়া তাহার উপযুক্ত যত্ন না লইলে অচিরে তাহা বিকল হইতে পারে, সেইরূপ দেহযন্ত্রের যথোচিত পরিচর্যা ও যত্ন প্রয়োজন। নইলে দেহ সুস্থ থাকিবে না। সেইজন্য দেহকে স্বাস্থ্যবান করিতে হইবে। স্বাস্থ্যবান হইলে শরীর নীরোগ হইবে। শরীর নীরোগ হইলে মনে স্ফূর্তি আসিবে ও মনন এবং কাজকর্মে ক্লান্তি আসিবে না। স্বাস্থ্য অর্জন করিতে পারিলে আমরা জীবনের সব কিছু ভোগ করিতে পারি। সেই জন্য প্রথম হইতেই স্বাস্থ্যবিধিগুলি জানা ও পালন করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পালনের জন্য নিম্নলিখিতগুলি করা কর্তব্য :

ব্যায়াম—ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা হইল : পেশীসমূহের উপযুক্ত গঠন ও শক্তি-সঞ্চার পেশী পরিচালনার ফলেই হইয়া থাকে। শরীরের কোন অংশ যদি অনেক দিন ব্যবহার করা না যায় তাহা হইলে উহা স্বাভাবিক কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলিবে। যাবতীয় অঙ্গ-চালনার মধ্য দিয়াই দেহ ও মনের স্বাভাবিক উন্মেষ হয়। সেইজন্য শৈশবে খেলাধুলা, ব্যায়াম ও নানাবিধ নৃত্যকলা প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে।

মনের সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দৈহিক গঠন এবং আভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। শ্রম এবং ব্যায়াম আমাদের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় সাহায্য করে। শ্রম ও ব্যায়াম করিলে শরীরের ভিতর হইতে সমস্ত ক্লেদ বাহির হইয় যায়। শ্রম এবং ব্যায়াম দেহের পুষ্টি, সৌষ্ঠব বৃদ্ধি এবং গঠনে বিশেষ সহায়ক হয়। দেহ যদি সুগঠিত হয় তাহা হইলে দেহ নীরোগ হইবে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়িবে। ঘর্ম ও মলমূত্র যথাযথভাবে নিষ্কাশনের ফলে দেহ হাল্কাবোধ হইবে এবং মনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রফুল্লতার ভাব আসিবে। শ্রম ও ব্যায়ামের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি, বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলিরও বিকাশ হইবে এবং ফলে ব্যক্তির সাহস এবং আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পাইবে।

শ্রম ও ব্যায়াম—উভয়ই পরিশ্রমসূচক অঙ্গ-সঞ্চালন হইলেও শ্রম ও ব্যায়ামের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্দেশহীন সহজ ও স্বাভাবিক অঙ্গ-সঞ্চালনকে শ্রম বলে এইজন্য যাহারা অঙ্গ-চালনা করিয়া কোনও রূপ কর্ম সম্পাদন করে, তাহাদিগকে বলা হয় শ্রমিক।

পক্ষান্তরে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য লাভের আশায় যাহারা বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ অনুসারে দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের সংযত পরিচালনা করে, তাহাদের ব্যায়াম করিতেছে বলা হয়।

ব্যায়ামের ফল—নিয়মিত ব্যায়ামে আমরা নিম্নলিখিত সুফলগুলি পাইতে পারি :

(১) ব্যায়ামের দ্বারা শক্তিহীন দেহ শক্তিশালী হইতে পারে। কেবল রোগা শরীর মোটা হইবে তাহাই নয়, পেশীগুলিও পুষ্ট হইবে। ব্যায়াম করিলে দেহের অনাবশ্যক চর্বি বিনষ্ট হয় ও দেহে চর্বি পুনরায় জমিতে পারে না। (২) ইহাতে প্রকৃত স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। পুষ্টিকর খাদ্য খাইলে ও খাদ্যাখাদ্য বিচার করিলেই স্বাস্থ্যবান হওয়া যায় না যদি না দেহের মধ্যে খাদ্যের ঠিকমত প্রয়োগ হয়। সমুচিত খাদ্য খাওয়া চাই ও দেহ-চালনার দ্বারা তাহা ঠিকমত খরচ করিলে দেহের পুষ্টি ঘটে। (৩) ব্যায়ামে কর্মশক্তি বাড়ে—ব্যায়াম অভ্যাস করিলে কোন কাজে সহজে ক্লান্তি আসে না। শরীরের পেশীগুলি সাবলীল ও তাজা থাকায় সব কাজ সহজে করিতে পারা যায়। ব্যায়ামে বুকের দম বাড়ে, হৃৎপিণ্ডের শক্তি বাড়ে, কাজেই পরিশ্রমের ক্ষমতাও বাড়ে। (৪) ব্যায়ামে ব্যক্তির যোগ্যতা বাড়ে। (৫) ব্যায়ামে অনেক রোগ আরোগ্য হয়। দেহ দুর্বল থাকিলেই অনেক রোগ আসিয়া জুটে। নিয়মিত ব্যায়াম ও যোগাসন অভ্যাসের দ্বারা অনেক রোগ নিরাময় হয়। তাহা ছাড়া কাহারও যদি কোনও রূপ অঙ্গ বিকৃতি থাকে, তাহাও ইহা দ্বারা সংশোধিত হইয়া যায়। (৬) ব্যায়াম দেহ-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তিকে বাড়াইয়া দেয়। নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করিলে দেহ-প্রকৃতির মধ্যে এমন এক শক্তি জন্মায় যাহাতে সংক্রামক রোগের আক্রমণ সহজে হয় না। (৭) ইহাতে জীবনযুদ্ধেও মানুষ সহজে বিজয়ী হইতে পারে। দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে ইচ্ছাশক্তি বাড়ে। ফলে কর্মক্ষেত্রে সকল বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া জয়ী হইতে পরাঙ্মুখ হয় না। (৮) ব্যায়াম দ্বারা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধ বয়সেও মানুষ যদি নিয়মে থাকে ও নিয়মিত ব্যায়াম করে, তাহা হইলে বহুদিন পর্যন্ত সে কর্মক্ষম থাকে। ইহাতে তাহাদের আয়ু বৃদ্ধিও ঘটে।

বয়স ভেদে ব্যায়ামের প্রকৃতি—সকল বয়সে একই রকম ব্যায়াম অনুশীলন করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বয়সে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যায়াম করা কর্তব্য।

(১) সাত বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের ব্যায়ামে যথেষ্ট পরিমাণ ছোটাছুটির অবকাশ থাকিবে। এই সময়ে তাহারা যাহাতে উপযুক্ত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে পারে তাহার সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। (২) সাত হইতে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের খেলার সঙ্গে কিছু শ্রমমূলক কসরৎ দেওয়া উচিত। ইহাতে ঐ সময় হইতেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাবলীল হয় এবং দেহের গঠন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। ড্রিল অভ্যাস করান স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ভাল। ইহাতে নিয়মানুবর্তিতা শেখে ও দেহের পেশীগুলি কর্মতৎপর ও শ্রমসহিষ্ণু হয়। ডন, বৈঠক, কপাটি, হাডুডু, কিছু কুস্তি—এইগুলি এ পর্যায়ে শারীরিক শিক্ষার অঙ্গ হইতে পারে। (৩) চৌদ্দ হইতে পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে শ্রমমূলক ব্যায়ামের মাত্রার বৃদ্ধি প্রয়োজন। জিমন্যাস্টিক ও ড্রিল প্রভৃতি শিক্ষা করা ছাড়াও খেলাধূলার মধ্য দিয়া ব্যায়াম করারও নানারূপ উপায় আছে। যেমন— ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, টেনিস প্রভৃতি খেলিতে পারে।

(৪) পঁচিশ হইতে পঞ্চাশ বছর বৎসর পর্যন্ত ঐ সব খেলাধূলা ও ব্যায়ামের কিছু অভ্যাস থাকা ভাল। তবে ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি দৌড়ঝাপের খেলা ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া দিতে হয়। এই সময় যোগাসন অভ্যাস শরীরের পক্ষে উপকারী ব্যায়াম। (৫) পঞ্চাশের পরে কঠিন পরিশ্রমজনক কিছু করা উচিত নয়। এই সময়ের উপযুক্ত ব্যায়াম দ্রুত হাঁটা। এই বয়সেও পরিমিত আসন অভ্যাস করা যায়।

ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম

(১) ব্যায়াম মনোগ্রাহী হইবে। (২) যাহারা নিয়মিত পরিশ্রমের কাজ করে, তাহাদের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বজায় রাখিবার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যায়াম করা ভাল। (৩) যাহারা কোন কায়িক শ্রম করে না এবং আহার বিষয়ে বিলাসী, তাহাদের নিয়মিত দ্রুত ভ্রমণ ও ব্যায়াম করা কর্তব্য। (৪) প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যায়াম ক্ষতিকর হয়। (৫) অনেকদিন ব্যায়াম করিয়া হঠাৎ বন্ধ করা ঠিক নয়। ক্রমে ক্রমে কমাইতে হয়। (৬) ব্যক্তির বয়স, দৈহিক গঠন, স্বাস্থ্য, পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা ইত্যাদি বিচারে তাহার ব্যায়ামের নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। (৭) প্রত্যূষে বা অপরাহ্নে ব্যায়াম করিতে হয়। (৮) আলো-বাতাসযুক্ত খোলা জায়গায় ব্যায়াম কার্যকর হয়। (৯) বেশী খাওয়ার পর ব্যায়াম করিতে নাই। (১০) ব্যায়াম ও বিশ্রাম জীবনের পুষ্টির জন্য সমভাবে প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা—দৈহিক অসুস্থতা দেহ ও মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অতএব ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের মূলনীতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। মানুষকে যে কোন স্বাচ্ছন্দ্যই দেওয়া হউক না কেন তাহার যদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকে তাহা হইলে তাহার জীবনে সকল স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হইয়া যাইবে।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

দেহের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বলিতে বুঝা যায় দেহের সমগ্র অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিবে। নিয়মিত দাঁত মাজিয়া পরিষ্কার করা কর্তব্য। চোখ, মুখ, কান পরিষ্কার করা, বাহির হইতে আসিয়া হাত পা ধোয়া বিশেষ প্রয়োজন। নিয়মিত নখ পরিষ্কার রাখা ও বড় হইলে কাটিতে হইবে। যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা উচিত। থুতু ও কফ সব সময় একটি নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলা উচিত। প্রতি দিন স্নান করা কর্তব্য। ভাল করিয়া স্নান করিলে শরীরের ময়লা উঠিয়া যায়, চর্মের ছিদ্রগুলি পরিষ্কার থাকে এবং খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি হইতে পারে না। কাপড় জামা নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। গেঞ্জি প্রতিদিন অন্তত: জলকাচা করা উচিত। বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় মাঝে মাঝে সাবান দিয়া কাচিতে হয়। বিছানা মাঝে মাঝে রৌদ্রে দিতে হয়।

তাহা ছাড়া নিয়মিত খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত জামা কাপড় ব্যবহার, খোলা জায়গায় বেড়ান, খেলাধূলা, ব্যায়াম করা, ছোঁয়াচে রোগ হইতে দূরে-থাকা, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য রক্ষার মূল কথা।

দাঁতের যত্ন :—বাল্যকাল হইতে দাঁতের যত্ন লইতে হয়। প্রতিদিন ভাল করিয়া দাঁত না মাজিলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্যকণা জমিয়া উহা ক্রমশঃ পচিয়া মুখে খুব বেশী দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। ইহাতে দাঁতের চকচকে এনামেলটি নষ্ট করিয়া ফেলে ও ক্রমে দাঁত পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া খাদ্যকণা পচিয়া অনেক সময় দাঁত ও মাড়ির সংযোগস্থলে কাল পাথরের সৃষ্টি করে। ক্রমে মাড়ি আলগা হয় ও দাঁত হইতে রক্ত ও পুঁজ পড়ে। ইহাকে পাইয়োরিয়া বলে। এই পুঁজ ও রক্ত পেটে গেলে নানা রকমের রোগ হয়।

খাদ্য—(ক) প্রতি দিন নিয়মিত সময়ে খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। (খ) পরিমিত পরিমাণে ভোজন করা বিধেয়। (গ) বাসি খাবার খাওয়া ঠিক নয়। (ঘ) মাছি বা আবর্জনা পড়িলে সে খাদ্য গ্রহণ করিতে নাই। (ঙ) খাইবার পূর্বে ভাল ভাবে হাত মুখ ধুইতে হয়। (চ) সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

জল—সব সময় বিশুদ্ধ জল পান করা উচিত। (খ) জল প্রতিদিন ফুটাইয়া খাওয়া কর্তব্য।

বায়ু—(ক) বদ্ধঘরে থাকা অনুচিত। (খ) ঘরের মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় সেদিকে দেখা কর্তব্য। (গ) খোলা হাওয়া-বাতাসযুক্ত স্থানে প্রত্যহ ভ্রমণ করা উচিত। (ঘ) এক ঘরে বেশী লোকের নিদ্রা যাওয়া ঠিক নয়।

বিশ্রাম—শরীরকে কর্মক্ষম রাখিবার জন্য যেমন পরিশ্রম করিতে হইবে, তেমনই নিয়মিত বিশ্রামেরও প্রয়োজন রহিয়াছে। জাগ্রত অবস্থায় বিশ্রাম আংশিক রূপে হইয়া থাকে। নিদ্রাই পরিপূর্ণ বিশ্রাম। দীর্ঘ সময় কোন কাজ করিলে, এমন কি পড়াশুনা করিলে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়। সেই সময় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। বিশ্রাম দেহের ক্লান্তি দূর করে, তখন দেহ ও মন পুনরায় প্রফুল্ল ও কর্মক্ষম হয়।

বিশ্রামের মূলনীতি হইল শরীর ও মনকে সমস্ত চিন্তা, উদ্বেগ অশান্তি ইত্যাদি হইতে সরাইয়া আনিয়া সহজ করিয়া তোলা। তবে নিদ্রাই সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রাম; উহাতে দেহের সঙ্গে মস্তিষ্কও বিশ্রাম পায়। নিদ্রায় অনেক প্রকারের অসুস্থতা কমিয়া যায়। উহা জীবনীশক্তি ফিরাইয়া আনে। ছোট ছোট শিশুদের দৈনিক ১৮ হইতে ২০ ঘণ্টা ঘুমানো দরকার। ইহা তাহাদের শরীর বৃদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয়। অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের ১২ ঘণ্টা, যুবকদের কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা নিদ্রার প্রয়োজন। বৃদ্ধ বয়সে ৫ হইতে ৭ ঘণ্টা নিদ্রা হইলেও চলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণস্বাস্থ্য

(Community Hygiene)

স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যক্তির তথা সমাজের পক্ষে প্রাথমিক কর্তব্য। সেইজন্য অতিপ্রাচীন কাল হইতে শারীর-শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-শিক্ষার কর্মসূচি প্রত্যেকটি জাতিই গ্রহণ করিয়াছিল। অনেক দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার যে নীতি-নিয়মের প্রবর্তন করিয়াছেন, রোগ প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সামাজিক সুস্থতা অর্জনের যে রূপরেখা নির্দিষ্ট করিয়াছেন, বিদ্যালয়ে ও সমাজে সেইগুলির যথাযথ শিক্ষা ও অভ্যাসের প্রয়োজন রহিয়াছে।

ব্যক্তি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান—ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে নীতি-নিয়ম পালন করা উচিত সেইগুলিকে লইয়া যে বিজ্ঞান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে ব্যক্তি-স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলা হইয়া থাকে। কেবল মাত্র শরীরচর্চা করিলেই চলিবে না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ, অর্থাৎ রোগ নিবারণ, শরীরতত্ত্ব, খাদ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও তাহার কিছু জানা আবশ্যক। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কেমন করিয়া পানীয় জল দূষিত হওয়া নিবারণ করিতে হয়, কেমন করিয়া স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হয়, বাড়ি-ঘর পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, আবর্জনা ও মলমূত্র সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, সংক্রামোক রোগ দেখা দিলে কি কি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়—এইসব প্রত্যেকের জানা কর্তব্য। তাহা ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য করিতে হয়:

(১) ঠিক সময়ে খাওয়া, (২) ঠিক সময়ে ঘুমানো, (৩) অতিভোজন না করা, (৪) ঠিক সময়ে মলত্যাগের অভ্যাস গঠন, (৫) প্রত্যহ স্নান ও শরীর পরিষ্কার করা, (৬) প্রত্যহ সকালে ও শয়নের পূর্বে দাঁত মাজা, (৭) নখ ও চুল কাটা ও পরিষ্কার করা, (৮) গায়ের জামা কাপড় পরিষ্কার রাখা, (৯) নেশা না করা, (১০) অনিয়ম অত্যাচার না করা (১১) নিয়মিত খেলাধুলা ও ব্যায়াম করা, (১২) মানসিক সুস্থতা বজায় রাখা।

গণস্বাস্থ্য-রক্ষণের পদ্ধতি—কেবল ব্যক্তিগত শিক্ষাতে সব কাজ হয় না। কারণ সমাজের অল্প কয়েক জন মাত্র স্বাস্থ্যের পক্ষে যে মঙ্গলজনক নীতি অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে তাহাতে অনেকের সমর্থন না থাকিলে সামগ্রিকভাবে কার্যকর হইবে না। তাহা ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রাম ও শহরে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গণস্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। আজ যাহারা শিশু, কাল তাহারা সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হইবে। তাই যেমন সমাজে ব্যাপক ভাবে গণস্বাস্থ্য শিক্ষা দিতে হইবে, তেমনি বিদ্যালয়েও গণস্বাস্থ্য রক্ষণের নীতি শিক্ষা দিতে হইবে।

গণস্বাস্থ্য শিক্ষার দুইটি ধারা। সমাজগত শিক্ষা ও (খ) বিদ্যালয়ের শিক্ষা।

(ক) **সমাজগত শিক্ষা**—সাধারণতঃ সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় স্বাস্থ্য-বিভাগ কর্তৃক নানারূপ প্রতিষেধক ব্যবস্থা লওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু সাময়িক

প্রতিরোধ ছাড়া ইহা দ্বারা স্থায়ী ফল লাভ করা যায় না। সেইজন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা ও স্বাস্থ্য-বিধিগুলি পালন করিবার অভ্যাস গঠন করা। দুইটি পদ্ধতিতে তাহা করা যাইতে পারে। এক, প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা বা প্রত্যক্ষ সাফল্য দেখাইয়া। যেখানেই কোন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেইখানে উহার প্রতিরোধের ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে করিতে হইবে যাহাতে জনসাধারণ বুঝিতে পারে, কি উপায়ে তাহারা নিজেরাই চেষ্টা করিলে এই রোগ প্রতিরোধ করিতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল প্রচার। হাটে বাজারে, গৃহে, বিদ্যালয়ে শিক্ষামূলক প্রচারের দ্বারা স্বাস্থ্য বিষয়ে জনমত গঠন করা। পোষ্টার, প্রচারপত্র, ম্যাজিক-ল্যাণ্টার্ন বক্তৃতা, ছায়াচিত্র, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও গণস্বাস্থ্য পালনের নীতিগুলি পালনের প্রয়োজনীয়তা সকলকে জানান দরকার। এইভাবে স্বাস্থ্য সম্পর্কে জনসাধারণের উপযুক্ত মনোভাব গঠন করা।

(খ) **ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা**—কেবল ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যনীতি পালনই শেষ কথা নয়, শিক্ষার্থীকে গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করারও প্রয়োজন আছে। শিশুদের জানা দরকার, সে একজন সামাজিক জীব, সমাজের অঙ্গ। তাহার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি-পালনে সুফল আসিবে না যদি না পরিপার্শ্বিক স্বাস্থ্যসম্মত হয়। কাজেই ব্যক্তিগত প্রয়োজনেও তাহার পারিপার্শ্বিককে স্বাস্থ্যসম্মত করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে অন্যের উপরও তাহার কর্তব্য রহিয়াছে। নিজের স্বাস্থ্যের সঙ্গে তাহার পরিমণ্ডলের স্বাস্থ্যও যাহাতে সুন্দর হয়, তাহার সে চেষ্টা করা কর্তব্য। সে যে-সব স্বাস্থ্যবিধি পালন ও অভ্যাস করিবে তাহার প্রভাব যাহাতে পরিবেশের উপর পড়ে, তাহা দেখিতে হইবে। যেমন—

(১) পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস গঠন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কি ব্যক্তি-স্বাস্থ্য কি গণস্বাস্থ্য, উভয়ের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বাল্যকাল হইতে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস গঠন করিবে। (২) পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত করা—ব্যক্তি-স্বাস্থ্য ও গণ-স্বাস্থ্যের পক্ষে ইহাও অতিশয় প্রয়োজনীয়। পরিবেশ যেন আবর্জনামুক্ত ও সুন্দর হয় সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হইবে।

এই অভ্যাস গঠনের জন্য প্রথমেই বিদ্যালয় পরিবেশ সুন্দর করার দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত বিদ্যালয় পরিবেশ সাফাই করিবে। ক্রমে মাঝে মাঝে বাজার, হাসপাতাল প্রাঙ্গণ মেলাস্থল ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন করিবে। এইভাবে পরিবেশ-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিবে ও অভ্যাস গঠিত হইবে।

গণস্বাস্থ্য সংরক্ষণে সরকারী কর্তব্য

বিদ্যালয়ে শিশুদের তত্ত্বগত ও বাস্তব অভ্যাসের মাধ্যমে গণস্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু গণস্বাস্থ্য-রক্ষণ বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহার কর্মসূচী বহুব্যাপক। ইহা প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি প্রাথমিক এবং পবিত্র কর্তব্য। দেশকে সুন্দর, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে

স্বাস্থ্যবান্ করিয়া তুলিতে হইবে। গণস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Public Health Department) রহিয়াছে। ইহার দুইটি দিক্। প্রথম, চিকিৎসা-বিভাগ ও দ্বিতীয়, স্বাস্থ্য-বিভাগ। চিকিৎসা বিভাগ শহরে ও গ্রামে হাসপাতাল ও হেলথ্ সেণ্টারে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে এবং স্বাস্থ্য-বিভাগ নানাবিধ উপায়ে গণস্বাস্থ্য-রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। গণস্বাস্থ্য-রক্ষায় এই বিভাগের প্রধান কর্মসূচি নিম্নে বলা হইল :

(১) **স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ব্যবস্থা**—জনসাধারণ যাহাতে টাটকা ও নির্ভেজাল খাদ্যদ্রব্য কিনিতে পারে, তাহা দেখা এই বিভাগের কর্তব্য। মাঝে মাঝে বাজারে গিয়া খাদ্যদ্রব্য পরীক্ষা করা ও পচা ও ভেজাল খাদ্য বিক্রী বন্ধ করা এই বিভাগের কাজের অন্তর্গত।

(২) **বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা**—কেবল খাদ্য হইলেই চলিবে না—খাদ্যের সঙ্গে জল অপরিহার্য। কিন্তু অপরিষ্কার জল অধিকাংশ রোগ এবং সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের কারণ। সেইজন্য পানীয় জলের বিশুদ্ধতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। শহরে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। গ্রামে যাহাতে নলকূপ খননের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করা যায়, জনস্বাস্থ্য বিভাগ সে দিকে দৃষ্টি রাখিবেন। কেবল খননই নয়, সেইগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে। তাহা ছাড়া খানা ডোবা পরিষ্কার ও ময়লা জল দূরীকরণের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

(৩) **আবর্জনা দূরীকরণ**—জনবসতি অঞ্চলে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক আবর্জনা জমে। হাটে, বাজারে, দোকানের পাশে প্রত্যহ অনেক আবর্জনা জমে। এইসব আবর্জনা পচিয়া দুর্গন্ধ হয় ও অনেক রোগ-জীবাণু বাসা বাঁধে। এই সব আবর্জনা নিয়মিতভাবে পরিষ্কার করিতে হইবে। আবর্জনা ফেলিবার জন্য রাস্তায় ডাস্টবিনের পাত্র রাখিতে হইবে। যাহাতে যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলিয়া রাস্তাঘাট নোংরা না হয়।

(৪) **শৌচাগারের ব্যবস্থা**—শহরে ভাল পায়খানা থাকিলেও শহরের বস্তি অঞ্চলে পায়খানা ও প্রস্রাবখানা প্রায়ই থাকে না। ফলে মাঠে ঘাটে রাস্তার ধারে পায়খানা ও প্রস্রাব করে। রাস্তাঘাট অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। গ্রামে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে শৌচাগার নির্মিত হয়, জনস্বাস্থ্য বিভাগকে সে ব্যবস্থা লইতে হইবে। শহরের বড় রাস্তার পাশে এবং বস্তিতে যাহাতে শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার নির্মিত হয় তাহা দেখা দরকার। কেবল নির্মাণ করিলেই দায়িত্ব শেষ হইবে না। সেইগুলি নিয়মিত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৫) **বাসগৃহ নির্মাণ**—যেখানে-সেখানে যাহাতে বিদ্যালয় বা বাসগৃহ নির্মিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। উঁচু জায়গায় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যাহাতে বাসগৃহ নির্মিত হয় তাহা দেখিতে হইবে। বাসগৃহে যাহাতে পর্যাপ্ত আলো বাতাস পায়, জল ও ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে তাহা দেখা দরকার।

(৬) **জনশিক্ষা :** জনস্বাস্থ্য বিভাগের সর্বাপেক্ষা দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হইল জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা। এই শিক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে লইতে হইবে। সুস্বাস্থ্যের উপকারিতা—কিভাবে স্বাস্থ্য অর্জন ও রক্ষা করা যায়, ব্যায়াম, বিশ্রাম, খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাইতে হইবে। সংক্রামক ব্যাধি কি, কি ভাবে ইহা বিস্তার লাভ করে, কি কি উপায়ে ইহা প্রতিরোধ করা যায়, তাহা দৃষ্টান্ত সহযোগে বুঝাইতে হইবে। ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা এবং কিভাবে ঐ পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা যায় তাহা শিখাইতে হইবে। গণস্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাস্তব দৃষ্টান্ত, পোষ্টার, বক্তৃতা, ছায়াচিত্র ইত্যাদির ব্যাপক ব্যবস্থা করিতে হইবে। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করিলে গণশিক্ষা সর্বাধিক ফলপ্রসূ। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাথমিক শুশ্রূষা

প্রাথমিক শুশ্রূষা বলিতে কোন লোকের হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে বা অসুস্থ হইয়া পড়িলে চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত কিছু শুশ্রূষা করাকে প্রাথমিক সেবা বা first aid বলে। হাতের কাছে সহজে যা পাওয়া যায় এমন সব দ্রব্যাদি দ্বারাই প্রাথমিক শুশ্রূষা করার রীতি। শুশ্রূষাকারীর সকল দায়িত্ব শেষ হয় চিকিৎসক আসার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রাথমিক শুশ্রূষা করার সময় কতকগুলি নীতি মানিতে হয়। যেমন—(১) প্রাথমিক শুশ্রূষাকারী ধীরচিত্তে প্রাথমিক শুশ্রূষা করিবেন। (২) জীবনের লক্ষণ দেখা না গেলেও তৎক্ষণাৎ রোগীকে মৃত বলিয়া ঘোষণা করিবেন না। অনেক সময় দুর্ঘটনায় পতিত লোক আপাততঃ মৃত বলিয়া মনে হইলেও প্রাথমিক উপযুক্ত চিকিৎসায় প্রাণ ফিরিয়া পাইতে পারে। (৩) দেহ হইতে অধিক রক্তপাত হইলে প্রথমেই তাহা বন্ধ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। (৪) রোগীর শ্বাস প্রশ্বাসে কোন কষ্ট না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। (৫) রোগীর দেহে তাপ না কমে তাহা দেখিতে হইবে। প্রয়োজন স্থলে কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিতে হইবে। (৬) রোগীর পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৭) দেহের অস্থি ভাঙিলে, উহা সঠিক ভাবে বসাইবার পূর্বে রোগীকে অন্যত্র সরান ঠিক নয়। (৮) রোগীর কাছে যাহাতে ভিড় না জমে তাহা দেখিতে হইবে।

সাবধানে থাকিলে আকস্মিক দুর্ঘটনার হাত হইতে অনেক সময় নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। তবে এই সব দুর্ঘটনায় প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা দরকার। ডাক্তারদের মতে এই সব দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথম কুড়ি মিনিট সময় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা-ব্যবস্থা রাখা বিধেয়। প্রাথমিক

চিকিৎসা বা ফার্স্ট-এড আসলে চিকিৎসা নয়,—ডাক্তার আসিবার পূর্বে সাধারণ সাবধানতা-মাত্র। নীচে কয়েকটি দুর্ঘটনার প্রাথমিক চিকিৎসার বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) **কাটিয়া যাওয়া বা রক্ত পড়া**—কাটিয়া গেলে, রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ক্ষত স্থান দিয়া নানারূপ দূষিত জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। সামান্য আঁচড় লাগিলে, কাটিয়া গেলে বা সামান্য রক্তপাত হইলে ক্ষতস্থান ডেটল দিয়া ধুইয়া আয়োডিন লাগাইয়া দিলেই চলিবে। কিন্তু ক্ষতস্থান যদি অপরিষ্কার হয়, অর্থাৎ ঐস্থানে যদি ধুলা বালি লাগে তবে ফুটানো জলে পরিষ্কার কাপড় বা তুলা ডুবাইয়া ঐ ক্ষত ধুইয়া দিতে হইবে। তাহার পর উহাতে টিংচার আয়োডিন বা ডেটল লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতে হইবে।

ক্ষত যদি গভীর হয় তাহা হইলে ধমনী বা শিরা কাটিয়া অধিক রক্তপাত হয়। রক্ত বাহির হইতে থাকিলে রোগীকে শোয়াইয়া দিতে হয় এবং সম্ভব হইলে ক্ষত অংশটি উঁচু করিয়া রাখিতে হয়। ক্ষতের মুখে তুলার একটি শক্ত প্যাড চাপা দিয়া আঁট করিয়া ব্যাণ্ডেজটি বাঁধিয়া দিলেই রক্ত বন্ধ হইবে। যদি শিরা কাটিয়া রক্ত বাহির হয় তাহা হইলে ইহাতেই রক্ত বন্ধ হইবে। ধমনী কাটিলে ক্ষতের পার্শ্বে হৃৎপিণ্ডের দিকে চাপ দেওয়া প্রয়োজন।

অধিক রক্তপাত হইলে টুর্নিকেটের (Tourniquet) ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। টুর্নিকেট হইল এক ধরণের শক্ত ব্যাণ্ডেজ। সংযুক্ত কাঠি দিয়া আঁট করিয়া বাঁধা যায়। টুর্নিকেট না পাওয়া গেলে রুমাল বা কাপড়ের টুকরাকে মাঝখানে গিট দিয়া অনুরূপ ব্যবস্থা করা চলে। যেখানে চাপ দিতে হইবে সেইখানে গাঁটটি লাগাইয়া শরীরের সেই অংশে কাপড়ের টুকরাটি জড়াইয়া দিতে হয়। টুর্নিকেট ২০ মিনিট পর খুলিয়া প্রয়োজন হইলে আবার বাঁধিতে হইবে। অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

(খ) **মচকাইয়া যাওয়া**—হাতের কব্জি, আঙ্গুল, পায়ের গোড়ালি হঠাৎ মচকাইয়া গেলে ইহার লক্ষণগুলি দেখিতে হইবে। যেমন—

(১) অস্থির সন্ধিস্থল ফুলিয়া উঠে (২) চলিবার সময় বিশেষ অংশটি বাঁকাইতে কষ্ট হয়। (৩) রক্ত চলাচলের বাধা হওয়ায় মচকাইয়া যাওয়া অংশটি নীলচে বা কাল রংয়ের হইয়া যায়।

এই অবস্থায় মচকানো অংশটি ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা উচিত। মচকানো অংশে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের সেক দেওয়া ভাল।

(গ) **স্থানচ্যুতি বা হাড়ভাঙ্গা**—অসাবধানতার জন্য বা আঘাত লাগার ফলে হাত বা পায়ের সন্ধিস্থল মচকাইয়া যায় এবং সন্ধিস্থলের হাড় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত চিকিৎসক আসিয়া হাড় সঠিক স্থানে বসাইয়া না দিবেন ততক্ষণ পর্যন্ত আহত স্থানে ঠাণ্ডাজলের ঝাপটা দেওয়া যায় ও রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিবার ব্যবস্থা করিতে হয়।

হঠাৎ কোন আঘাতে বা চাপে হাড় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ইহাকে বলা হয় ফ্র্যাকচার (Fracture)। বাহিরের কোন ক্ষত না থাকিলেও ফ্র্যাকচার হইতে পারে। এইগুলিকে সহজ ফ্র্যাকচার বলা হয়। একটি জায়গায় হাড় ভাঙ্গিলে সহজ ফ্র্যাকচার বলে। আবার অনেক সময় আঘাত এতই হয় যে ভিতরের হাড় ভাঙ্গিয়া বাহিরে ক্ষত সৃষ্টি করে। তাহাকে কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার (Compound fracture) বলে। আর এক রকমের গুরুতর ফ্র্যাকচার হইয়া থাকে। ভিতরের হাড়গুলি ভাঙ্গিয়া শিরা ধমনী ছিঁড়িয়া বাহিরে ক্ষত সৃষ্টি করিলে, তাহাকে কমপ্লিকেটেড ফ্র্যাকচার (Complicated fracture) বলে।

ফ্র্যাকচারের প্রাথমিক চিকিৎসা

(১) বেশীক্ষণ নাড়াচাড়া না করা। (২) যাহাতে ক্ষত মুখ দিয়া জীবাণু দেহে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য ডেটল বা আয়োডিন দিয়া ক্ষত মুখ পরিষ্কার করা। (৩) ক্ষতের মুখ ব্যাণ্ডেজ করিয়া দেওয়া। (৪) চিকিৎসক হাড় ঠিক করিবেন—সে কাজ প্রাথমিক শুশ্রূষাকারীর না করা। (৫) চিকিৎসক না আসা পর্যন্ত রোগীকে কিছু খাইতে না দেওয়া। (৬) নাড়াচাড়ার ফলে জখম আরও যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্য এক টুকরা কাঠ দিয়া দেহের অপর অংশের সঙ্গে জখম অংশটিকে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

পোড়া এবং ঝলসানো (Burns and Scalds)

আগুন, ক্ষয়কারক অ্যাসিড বা বিদ্যুতের দ্বারা কোনও স্থান যখন পুড়িয়া যায়, তখন তাহাকে পোড়া বলে। গরম বাষ্পের সাহায্যে শরীরের কোন অংশ ঝলসাইয়া যাইতে পারে।

পোড়া এবং ঝলসানোতে চর্ম লাল হয়, ব্যথা হয়, ফোস্‌কা পড়ে, তন্ত্রীগুলি নষ্ট হয়। পোড়া বা ঝলসানো যদি অতিরিক্ত ধরণের হয়, তাহাকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাইতে হয় বা উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ লইতে হয়।

কাপড়ে আগুন লাগিলে আদপেই ছুটাছুটি করিতে নাই। তাহাতে আগুনের বৃদ্ধি ঘটে। তৎক্ষণাৎ রোগী মেঝেতে শুইয়া পড়িবে, গড়াইবে বা তাহাকে শোয়াইয়া তাহার গায়ে কম্বল চাপা দিবে। তাহাতে আগুন নিভিয়া যাইবে। সব সময় দেখিতে হইবে যাহাতে অগ্নিশিখা মুখ স্পর্শ না করে।

পোড়া ঝলসানোর প্রাথমিক চিকিৎসা—(১) চামড়া যদি কেবল লাল হইয়া উঠে এবং যদি ক্ষত দেখা না যায় তাহা হইলে বোরিক অয়েণ্টমেণ্ট (Boric ointment) বা বার্ণল লাগান যাইতে পারে। (২) পোড়ার ক্ষেত্রে ক্ষতকে পরিষ্কার করিবার প্রয়োজন নাই, কারণ গরমে দূষিত জীবাণু নষ্ট হইয়া গিয়াছে। (৩) অবিলম্বে জামা কাপড় কাটিয়া ফেলা দরকার। (৪) ফোস্কা পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে উহা গালাইবার প্রয়োজন নাই। চিকিৎসক সময়মত তাহা করিবেন।

ভিমরুলের হুল ফুটান—বোলতা, ভিমরুল, কাঁকড়া বিছা প্রভৃতি কামড়ায় না, উহারা হুল ফুটাইয়া দেয়। প্রথমেই হুলটি বাহির করিতে হইবে। হুল বাহির হইলে

যন্ত্রণা কিছু কমিবে। সরু চিমটা, চুল বা নখ দিয়া হুল বাহির করা যায়। মেথিলেটেড স্পিরিট, টিংচার আয়োডিন বা এ্যামোনিয়া ক্ষতস্থানে দিলে যন্ত্রণা কমিয়া যাইবে। পেঁয়াজের রস দিলেও যন্ত্রণার উপশম হয়।

সর্পাঘাত—আমাদের দেশে প্রতি বৎসর বহুলোক সর্পাঘাতে মারা যায়। সাপ দুই রকমের—নির্বিষ ও বিষযুক্ত। ঢোঁড়া সাপের বিষ নাই। কেউটে, গোখরো, চিতি, বড়া প্রভৃতি সাপের বিষ আছে। নির্বিষ সর্পে সাধারণতঃ চারিটি দাঁতের দাগ হয়, বিষযুক্ত সর্পাঘাতে দুইটি দাঁতের দাগ দেখা যায়।

সাপের বিষ শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া সারা দেহের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। কাজেই প্রথমেই দেখিতে হইবে যাহাতে রোগীর সারা শরীরে সাপের বিষ ছড়াইয়া না পড়ে।

দেহের যে অংশে সাপে কাটিয়াছে তাহার উপরের অংশে পর পর দুই স্থানে শক্ত করিয়া দড়ি বা কাপড়ের পাড় দিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে ঐ অংশে টুর্নিকেটের বাঁধনও দেওয়া যাইতে পারে। যদি পায়ে সর্পাঘাত হয় তাহা হইলে হাঁটুতে টুর্নিকেটের বাঁধন দিতে হয়, হাতে কামড়াইলে হাতের উপরের দিকে এই বঁাধন দিতে হইবে।

সাপের দংশন যেখানে ঘটিয়াছে, সেইখানে বিশোধিত ছুরি দিয়া সমান্তরাল করিয়া আরও কিছুটা কাটিয়া দিয়া গরমজল ঢালিতে হইবে। উহাতে রক্তের সহিত বিষ বাহির হইবে। ক্ষতের মধ্যে পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট দিয়া ধুইয়া দিলে সাপের বিষ নষ্ট হয়।

পাগলা জন্তুর কামড়—পাগলা কুকুর, শিয়াল প্রভৃতির কামড়ের ফল সুদূর-প্রসারী। আপাততঃ না হইলেও পরে উহা হইতে জলাতঙ্ক রোগ জন্মে ও রোগী মারা যায়। পাগলা কুকুর বা শিয়াল কামড়াইলে প্রথমে ক্ষত স্থানটি কষ্টিক পটাশ (Caustic Pottash), নাইট্রিক অ্যাসিড (Nitric Acid), কার্বলিক অ্যাসিড (Carbolic Acid) বা গরম লোহা দ্বারা পুড়াইয়া দিতে হইবে। তাহার পর ডাক্তারের নির্দেশ মত পাস্তর ইনস্টিটিউটে ইঞ্জেকশান দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ব্যাণ্ডেজ (Bandage): দেহের কোন স্থান কাটিয়া গেলে, ভাঙিয়া গেলে ক্ষতস্থানে ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিতে হয়। ব্যাণ্ডেজ করিবার সাধারণ নিয়ম হইল, ব্যাণ্ডেজের এক প্রান্ত কয়েক বার ভাঁজ করিয়া ঐ অংশটি বারে বারে গুটাইবার মত শক্ত করিতে হইবে। ইহার খোলা অংশটি বুড়ো আঙুল এবং তর্জনীর মধ্যে মেলিয়া ধরিতে হইবে এবং অন্য হাত দিয়া ব্যাণ্ডেজের গুলিটা গুটাইতে হইবে। গুটাইবার সময় ভিতরের দিকে গুটাইতে হয়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় গুলিটা ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনীর মধ্যে উহা ধরিয়া বাহিরের দিক হইতে উহাকে ধীরে ধীরে খুলিতে হইবে।

ব্যাণ্ডেজ কাটিবার সময় একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য দিতে হয়। ক্ষতের উপরকার ব্যাণ্ডেজ কখনও কাঁচি দিয়া কাটিতে নাই। যেখানে ক্ষত নাই সেইখানের ব্যাণ্ডেজ কাটিতে হয়।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার নিয়ম—যেখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে হইবে সেখানের মাপ লইয়া যতটা প্রয়োজন কাটিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া গুটাইতে হইবে। কাহারও কনুই বা তাহার উপরিভাগে কোথাও আঘাতের দরুন তাহার হাতটিকে বিশ্রাম দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের একটি প্রান্ত চোট লাগা হাতের তলা দিয়া লইয়া লোকটির কাঁধের উপর ফেলিতে হইবে এবং অপর প্রান্তটি ঝুলাইয়া দিতে হইবে। মাঝের কোণটি কনুইয়ের দিক্ করিয়া ইহার নীচে রাখা হইয়াছে। এইবার ব্যাণ্ডেজের দুইটি প্রান্ত গলার পিছন দিকে লইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। এইবার কনুইয়ের প্রান্তটি পিন দিয়া আটকাইয়া দিতে হইবে।

হাত জখম হইলে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজটি হাতের নীচ দিয়া লইয়া যাইতে হইবে। ব্যাণ্ডেজটির উপর হাতের অবস্থান এমন হইবে যাহাতে ব্যাণ্ডেজের মাঝের কোণটি হাতের আঙুলের শেষ প্রান্ত হইতেও কিছুটা অগ্রসর হইয়া থাকে।

এখন মাঝের কোণটি উল্টাইয়া হাতের কব্জি অবধি লইয়া আসিতে হইবে। এইবার দুইদিকের দুইটি প্রান্ত জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাঝের প্রান্তটি উল্টাইয়া আঙুলের দিকে করিয়া ব্যাণ্ডেজের উপর ফেলিয়া দিতে হইবে এবং জড়াইয়া দিতে হইবে।

পায়ের ব্যাণ্ডেজও অনুরূপভাবে হইবে। পা জখম হইলে ব্যাণ্ডেজের উপর ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের অবস্থান এইরূপ হইবে যে, ব্যাণ্ডেজের মাঝের কোণটি পায়ের আঙুলের শেষ প্রান্ত হইতেও কিছুটা বাড়তি থাকে। এইবার মাঝের কোণটিকে উল্টাইয়া পায়ের গোড়ালি অবধি লইয়া আসিতে হইবে। এই অবস্থায় দুই দিকের প্রান্ত জড়াইয়া বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। মাঝের যে প্রান্তটি রহিয়াছে উহা উল্টাইয়া আঙুলের দিকে আনিয়া ব্যাণ্ডেজের উপর ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ব্যাণ্ডেজের সাথে জড়াইয়া দিতে হইবে।

মাথায় ব্যাণ্ডেজের প্রয়োগ : কাহারও মাথায় আঘাত লাগিলে ত্রিকোণ ব্যাণ্ডেজের মাঝের কোণটি রোগীর পিঠের দিকে ঝুলাইয়া দিয়া মাঝের অংশটি কপালের উপর মেলিয়া দিতে হইবে। ব্যাণ্ডেজের দুই পার্শ্বের দুই অংশ মাথার চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিতে হইবে। প্রান্ত দুইটি তাহার পর সামনের দিকে আনিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। মাঝের যে প্রান্তটি ঝোলান আছে তাহা গুটাইয়া আনিয়া আড়াআড়ি যাওয়া প্রান্ত দুইটির সাথে পিন দিয়া আঁটিয়া দিতে হইবে।

অষ্টম অধ্যায়

খাদ্য

যাহা শরীর রক্ষার প্রয়োজনে অর্থাৎ শরীর রক্ষণ ও পুষ্টিতে লাগে, তাহাকে খাদ্য বলে। যাহা হইতে শরীরে শক্তি ও উত্তাপ জন্মে ও যাহার সাহায্যে শরীর গড়িয়া উঠে, তাহাই খাদ্য। দেহরক্ষার জন্য প্রত্যহ খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু আমরা যে সব বস্তু প্রত্যহ খাইয়া থাকি তাহা সবই খাদ্য নয়। পান, সুপারি, প্রভৃতি বস্তু আমরা প্রত্যহ খাইতে পারি। কিন্তু ঐ সব বস্তুকে খাদ্য বলে না। খাদ্যে নীচের তিনটি গুণ থাকা বাঞ্ছনীয়—

(ক) যেগুলি আমাদের দেহে শক্তি সঞ্চার করে। (খ) যেগুলি হইতে দেহ ক্রমশ: গঠিত হয়। (গ) যেগুলি দ্বারা দেহ সুস্থ থাকে ও সুরক্ষিত হয়।

জীবনের বিভিন্ন স্তর আছে। ঐ স্তর অনুযায়ী মানুষের দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধির একটি নিয়ম-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হয়। যৌবনে বৃদ্ধির গতি ততটা নয়, এই সময় ক্ষয়ের পরিমাণ বেশী। বিভিন্ন বয়সের খাদ্য-তালিকা রচনা করিতে গেলে দেহের ক্ষয় ও বৃদ্ধি কিভাবে হয় এবং তাহার নিয়মগুলি কি, তাহার প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে।

১৬।১৭ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেক নরনারীর খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ মাংস, মাছ, ডিম, ইত্যাদি প্রোটিন খাদ্য, উপযুক্ত পরিমাণ শ্বেতসার, টাটকা মাখন, ঘি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভিটামিনযুক্ত শাক্ সব্জী, দুধ, ছানা, ইত্যাদি থাকা উচিত। ২৫ বৎসরের উর্ধ্বে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রোটিনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে এবং তখনই শ্বেতসার কিছুটা বৃদ্ধি করা চলে ও তাহার সাথে প্রয়োজন হয় কিছু ফলমূলের। বৃদ্ধ বয়সে প্রচুর ফলমূলের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং এই সময়ে দুধ ও মাছ ছাড়া অন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয় না।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভাইটামিন, লবণ, জল প্রভৃতি সব রকম খাদ্যই আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু ঐ সব খাদ্য সুষম ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে। যে খাদ্য যতটুকু পরিমাণে খাওয়া দরকার সেই সর্বসম্পূর্ণ খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলে।

একজন পূর্ণবয়স্ক পরিশ্রমী মানুষের দৈনিক সুষম খাদ্য-তালিকা নীচে দেওয়া হইল।

	আউন্স		আউন্স
খাদ্যশস্য (cereals)	৭	দুধ (milk)	৬
গমজাতীয় খাদ্য (millets)	৭	চিনি বা গুড় (Sugar or gur)	২
ডাল (pulses)	৩	তৈল বা বনস্পতি (vegetable oil)	১
শাক্-সব্জি (leafy vegetables)	৪	মাছ, মাংস, বা ডিম (meat, fish or egg)	১
তরিতরকারী (other vegetables)	৩		
ফল (fruits)	২		

দেহপুষ্টির জন্য সুষম খাদ্য-তালিকা তৈরী করিবার সময় কোন খাদ্যের কি পরিমাণ ক্যালোরি বা ইন্ধন শক্তি আছে তাহা দেখিতে হইবে। এক কিলোগ্রাম

জলের উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে হইলে যে পরিমাণ উত্তাপ আবশ্যক তাহার পরিমাপই ক্যালোরি। নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন খাদ্যে কতটা তাপ উৎপন্ন করিতে পারে তাহার বিচার করিয়া খাদ্য নির্বাচন করিতে হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের নূনতম পুষ্টির জন্য প্রত্যহ ৩০০০ ক্যালোরির প্রয়োজন। হিসাব করিয়া এমন ভাবে খাদ্যবস্তু নির্বাচন করিতে হইবে যাহাতে ৩০০০ ক্যালোরি পূরণ হয়। ১ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য ৪'১ ক্যালোরি উৎপন্ন করে, ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটও তাহাই করে, ১ গ্রাম চর্বি ৯'৩ ক্যালোরি উৎপন্ন করে। নীচে কয়েক প্রকার খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

(ক) **শর্করা** (Carbohydrates) : চাল, গম, যব প্রভৃতি যাবতীয় শস্য, ও মূল জাতীয় খাদ্য শর্করা-বর্গের মধ্যে পড়ে। আমরা মূলতঃ শর্করা জাতীয় খাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া থাকি। শর্করা সহজে দেহে গ্লুকোজে পরিণত হয়। এই জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহে শক্তি সরবরাহের প্রধান উপায়। যে যত পরিশ্রম করিবে তাহার ততই শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সাধারণতঃ দৈনিক ছয় হইতে আট ছটাক শর্করা খাদ্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে প্রয়োজন।

(খ) **প্রোটিন** (Proteins) : নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্যকেই প্রোটিন বলা হইয়া থাকে। প্রোটিন হইল মানবের দেহকোষের মূল উপাদান। সেইজন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে আমাদের মাংস পুষ্ট হয় ও দেহবস্তুর ক্ষয় পূরণ হয়।

দেহপুষ্টি প্রোটিন খাদ্য হইতে উৎপন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের উপর নির্ভরশীল। কাজেই সব প্রোটিন খাদ্যই সমান গুণসম্পন্ন নয়। বিভিন্ন রকমের প্রোটিন খাদ্য হইতে প্রায় ১০।১২ রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড মিলে। যে খাদ্যের মধ্যে সব অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি মিলিবে সেই খাদ্যকে উচ্চ জৈবগুণসম্পন্ন প্রোটিন বলা যায়। যেমন, মাংস, মাছ, ডিম, ছানা, দুধ এই খাদ্য পর্যায়ভুক্ত। কয়েক রকমের খাদ্যে কোন কোন প্রকার অ্যামিনো অ্যাসিড আছে, কিন্তু সবগুলি নাই, সেই সেই খাদ্য-বস্তুকে নিম্ন জৈবগুণ সম্পন্ন প্রোটিন বলা হয়। উদ্ভিদ-বর্গের মধ্যে কতকগুলি খাদ্যে এই গুণ বর্তমান। যেমন, ডাল, সয়াবীন, মটর, বরবটি প্রভৃতি। যতদিন শরীরের বৃদ্ধি চলে ততদিন প্রোটিনের প্রয়োজন সর্বাধিক। বৃদ্ধি থামিয়া গেলে প্রোটিনের তেমন প্রয়োজন পড়ে না। সেইজন্য বৃদ্ধদের অপেক্ষা শিশু, কিশোর, যুবকদের অধিক পরিমাণে প্রোটিন খাদ্য খাওয়া উচিত। নিরামিশাসী যাহারা মাছ, মাংস বা ডিম খায় না, তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে দুধ, দই, ছানা প্রভৃতি খাইতে পারেন।

(গ) **স্নেহজাতীয় খাদ্য** (Fats) : ঘি, তেল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় খাদ্য। এইগুলিও শরীরে উত্তাপ সঞ্চারিত করে, তবে শর্করা জাতীয় খাদ্যের দ্বিগুণ পরিমাণে। সেই জন্য অল্প পরিমাণে তেল ঘি খাইলেই চলে। পরিশ্রমী লোকের পক্ষে শর্করা জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে পরিমিত স্নেহজাতীয় খাদ্যও দরকার। যাহারা পরিশ্রম করে না, তাহারা এই খাদ্য বেশী খাইলে শরীরে চর্বি জমিবে ও শরীর মোটা হইবে। চর্বি দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজনের মাত্রা কমাইয়া দেয়।

(ঘ) ধাতব লবণাদি (Minerals and Salts) : আমাদের দেহের মধ্যে প্রায় পনের রকমের ধাতব লবণাদি রহিয়াছে। এগুলি দ্রবীভূত অবস্থায় প্রত্যেক কোষে বর্তমান এবং ইহার দ্বারা আভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এইগুলির মধ্যে কিছু অম্লগুণ-বিশিষ্ট, কিছু বা ক্ষারগুণ-বিশিষ্ট। লবণ ছাড়া দেহরক্ষণ অসম্ভব। মূত্র ও ঘামের সহিত প্রত্যহ লবণ দেহ হইতে বহির্গত হইতেছে। খাদ্যের মধ্য দিয়া ক্ষয় পূরণ হয়। লবণ ব্যতীত ফস্‌ফোরাস (Phosphorus) দেহের পুষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ইহার অভাবে হাড় শক্ত হয় না, শরীরের বৃদ্ধি ঘটে না, শিশুদের রিকেট রোগ হয়। দুধ, ছানা, ডিম, মাংস, পালং শাক ও আলুর মাধ্যমে ইহা দেহ গ্রহণ করে। ক্যালসিয়াম (Calcium) ও লৌহ রক্ত পুষ্টির জন্য প্রয়োজন। প্রোটিন খাদ্যের মাধ্যমেই এসব উপাদান মেলে।

খাদ্যে যে মসলা দিই সেগুলিতে কোন প্রকার খাদ্যগুণ নাই। দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টিতেও কোন কাজে লাগে না। সেইজন্য যত কম সম্ভব মসলা খাওয়া উচিত।

(ঙ) ভাইটামিনবর্গ (Vitamins) : দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণের উপযোগী যে উপাদানগুলির কথা আগে বলা হইয়াছে, তাহা ছাড়াও আরও একপ্রকারের খাদ্য উপাদন আমাদের দেহের পক্ষে প্রয়োজন। যদিও এই উপকরণ সূক্ষ্ম পরিমাণে দরকার, তবুও ইহা ব্যতীত আমাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না—বেরিবেরি, রক্তস্বল্পতা, অন্ধত্ব প্রভৃতি নানাবিধ রোগ জন্মে। এই বিশেষ উপকারী উপাদানকে ভাইটামিন বলা হইয়া থাকে। অনেক জাতীয় ভাইটামিন আছে, প্রত্যেকের গুণ আলাদা।

ভাইটামিন A : এই ভাইটামিন সকলের দেহপুষ্টির জন্য প্রয়োজন হইলেও শিশুদের পুষ্টির জন্য ইহাকে অপরিহার্য বলা চলে। ইহার অভাবে দেহ শুকাইয়া যায়, গায়ের চামড়া ও চুল রুক্ষ হয়, চোখ অন্ধ হয়। সাধারণতঃ দুধ হইতে আমরা এই ভাইটামিন পাইয়া থাকি। মেটুলি, কডলিভার তেল, ঘি, রুই-কাতলা প্রভৃতি পাকামাছের তেলে, দুধে ও ডিমে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন A পাওয়া যায়। গাজর, পালংশাক, বাঁধাকপি প্রভৃতিতেও এই ভাইটামিন আছে।

ভাইটামিন B : অনেক রকম ভাইটামিন লইয়া ভাইটামিন B গঠিত। তাহার মধ্যে থিয়ামিন (Thiamine) হইল ভাইটানি B_1 যাহার অভাবে বেরিবেরি ও স্নায়ুর অসুখ হইতে পারে। চাল, গম ইত্যাদি শস্যের ভুষিতে এই ভাইটামিন থাকে। ভাইটামিন B_2 বা রিবোফ্লেভিন (Riboflavin) থাকে দুধ, ডিম, মেটুলি, টম্যাটো প্রভৃতির মধ্যে। ইহার মধ্যে আছে নিকোটিন অ্যাসিড যাহার অভাবে দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায় ও বুদ্ধি বিকৃতি ঘটে। আরও কয়েকরকম ভাইটামিন এই পর্যায়-ভুক্ত। যেমন, ফোলিক অ্যাসিড, ভাইটামিন$_{12}$, প্যাণ্টোথিনিক অ্যাসিড প্রভৃতি।

ভাইটামিন C : ইহাকে অ্যাসকবিক অ্যাসিড (Ascorbic Acid)ও বলা হয়। এই ভাইটামিনের অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। শিশুদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ইহার অভাবে শরীরে স্ফূর্তি আসে না। টাটকা ফলমূল ও শাকশব্জীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এই ভাইটামিন মিলে। টম্যাটো, পালংশাক,

শালগম, বাঁধাকপি, গাজর, আলু ও পেঁয়াজে বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়। বাসি হইলে এবং আগুনের উত্তাপে ইহার গুণ নষ্ট হয়।

ভাইটামিন D: দেহের অস্থি ও দন্তের পুষ্টির জন্য এই ভাইটামিনের প্রয়োজন আছে। ইহার অভাবে শিশুদের অস্থি শক্ত হয় না ও রিকেট নামক রোগ হয়। কডলিভার তেল, ঘি, মাখন, দুধ ও ডিমে এই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে মিলে। খাদ্য ছাড়াও অন্য এক উপায়ে দেহ এই ভাইটামিন প্রস্তুত করে। গাত্রচর্মে যে স্বাভাবিক তেল প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে স্টেরল নামক পদার্থ সূর্যরশ্মির সাহায্যে ভাইটামিন D প্রস্তুত করে ও তাহা শরীরে রক্তের মধ্যে চলিয়া যায়। সেই জন্য মাঝে মাঝে খালি গায়ে সূর্যালোক লাগান দেহের পক্ষে উপকারী।

ভাইটামিন E: মেয়েদের পক্ষে এই ভাইটামিন প্রয়োজনীয়। ইহাতে সন্তান ধারণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিজ্জ জাত তেলে এবং গাজর, টম্যাটো ও শাকশব্জীতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

নবম অধ্যায়

স্বাস্থ্য শিক্ষায় বিদ্যালয়ের কর্তব্য

বিদ্যালয়ে কেবল লেখাপড়া শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলেই চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। তাহারা যাহাতে দেহ-মনে সুস্থ হইয়া গড়িয়া উঠে ও ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যকর সমাজ রচনার উপযোগী মনোভাব-সম্পন্ন হইয়া গড়িয়া উঠিতে পারে তাহার ব্যবস্থা বিদ্যালয়কে করিতে হইবে। এইজন্য কেবল স্বাস্থ্য শিক্ষার আয়োজনই যথেষ্ট নয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে এবং বিদ্যালয় আরোগ্যশালা ও শিশু পরিচালনাগারের প্রবর্তন করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য-পরীক্ষা ও পরিদর্শন: মুদালিয়র কমিশন বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। প্রতিটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকার কথা বলিয়াছেন। রুটিন কাজের মত গতানুগতিক পরীক্ষা হইলে চলিবে না। বছরের প্রথমেই একবার ছাত্র-ছাত্রীদের ভালভাবে ডাক্তারী পরীক্ষা করাইতে হইবে। যদি কাহারও কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় তাহা নিরাময়ের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা লইতে হইবে। বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। আবার বছরের শেষে একবার ভালভাবে পরীক্ষা করাইতে হইবে।

অনেক সময় দেখা যায় বিদ্যালয়ে ডাক্তারী পরীক্ষার পর কোন শিশুর জন্য ডাক্তার ঔষধপত্র ও চিকিৎসার পরামর্শ দিলেন। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতা তাহা

উপেক্ষা করিলেন। সেক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। বিদ্যালয়কে এ সব বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ শিশুর সুচিকিৎসার ভার লইতে হইবে।

প্রত্যেক শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের তিনটি কপি করিতে হইবে। একটি থাকিবে চিকিৎসক পরীক্ষকের কাছে, একটি বিদ্যালয়ে, একটি অভিভাবকের নিকট থাকিবে। মূল কথা শিশুর নীরোগ দেহের জন্ম বিদ্যালয়কেই উদ্যোগী হইতে হইবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা-নীতি শিশুরা ঠিকমত পালন করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্ম প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর স্বাস্থ্যপত্র থাকা বাঞ্ছনীয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক দোষ, ত্রুটি, দুর্বলতা রোগ প্রভৃতি খুঁজিয়া বাহির করা বিদ্যালয়ের কর্তব্য। চিকিৎসক সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয়ে আসিবেন এবং শিক্ষকের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন।

চিকিৎসকের মন্তব্য ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যপত্রে লিখিত হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের ওজন, মাপ, ত্রুটি, ইত্যাদি লিখিত হইবে। তাহা ছাড়া রেকর্ড দেখিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বা ত্রৈমাসিক উন্নতিরও পরিমাপ করা চলে।

চিকিৎসক ছাত্র-ছাত্রীদের দেহে কোনও সংক্রামক রোগ আছে কিনা তাহা বুঝিতে পারেন এবং সেই অনুসারে নির্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী ও অপর ছাত্র-ছাত্রীদের সমাধান করিয়া দিবেন।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরিদর্শকের কর্তব্য

(১) নিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন ও তাহাদের পুষ্টির দিকে লক্ষ্য দিবেন। (২) কোন শিক্ষার্থীর সংক্রামক রোগ হইলে অন্যদের হইতে পৃথকীকরণ ও অন্যবিধ ব্যবস্থা লইবেন। সময়মত টিকা ও প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান দিবার ব্যবস্থা করিবেন। (৩) ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে নিয়মিত স্বাস্থ্যাবধি মানিয়া চলে সে দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। (৪) বিদ্যালয়ে পানীয় জল, আলোবাতাস, উপযুক্ত টিফিন ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য দিবেন। বিদ্যালয় পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, ময়লা নিষ্কাশন, শৌচাগার, প্রস্রাবাগার সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন। (৫) অসুস্থ ছাত্রদের চিকিৎসার জন্ম অভিভাবক এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দিবেন।

বিদ্যালয় আরোগ্যশালা (School Clinic): বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্ম নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু কেবল স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেই চলিবে না, তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থাও করিতে হইবে। অনেক সময় নানা কারণে পিতামাতা এ বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং স্থানীয় হাসপাতালে রোগীর ভিড়ের দরুন ছেলে-মেয়েদের ঠিকমত চিকিৎসা সম্ভব হয় না। বিদেশের অনেক স্কুলেই স্কুলের নিজস্ব আরোগ্যশালা (School Clinic) আছে। এইখানে বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা যত্নের সহিত চিকিৎসিত হয়। আমাদের দেশে দু'একটি স্কুল ছাড়া কোথাও এ ব্যবস্থা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) : শিশুদের দৈহিক বা শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য বিদ্যালয় আরোগ্যশালার কথা বলা হইয়াছে। অনেক শিশু আবার বিভিন্নরকম মানসিক রোগে ভোগে। যেমন, ভীরুতা ক্লাশপালানো, চুরি, হিংস্র, যৌন অপরাধ ইত্যাদি। ইহাদের চিকিৎসা সাধারণ আরোগ্যশালায় হইবে না। ইহার জন্য বিশেষ ধরনের চিকিৎসার প্রয়োজন। এই জন্যই শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। হয়তো কোন একটি স্কুলের পক্ষে এ ধরণের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। সেইজন্য প্রতি শহরে বা জেলা-শহরে একটি প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে। প্রতিটি বিদ্যালয়ের মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুরা এখানে চিকিৎসার সুযোগ পাইবে।

মানসিক চিকিৎসাগারে তিন ধরণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকিবেন। যেমন, মনোবিজ্ঞানী (Psychologist), মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) ও মনশ্চিকিৎসক সমাজকর্মী। ইহা ছাড়া একজন স্নায়ু বিশেষজ্ঞও (Neorologist) থাকা প্রয়োজন।

এই প্রতিষ্ঠানে মানসিক রোগগ্রস্ত শিশুদের পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। তাহা ছাড়া শিশুর রুচি, বুদ্ধি ও প্রবণতা নির্ণয় করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ নির্দেশনার দায়িত্বও এই প্রতিষ্ঠানের।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থা
(Organisation of Health Education in School)

এতাবৎ আলোচনায় বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনেক কথা বলা হইয়াছে। নিম্নে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

স্বাস্থ্যশিক্ষা ও শরীর শিক্ষা (Health Education and Physical Education) দেহ মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য যে সব কাজ করিতে হয় ও যে নীতি নিয়ম পালিয়া চলিতে হয়, সে সব সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জনই স্বাস্থ্যশিক্ষা। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, প্রক্ষোভমূলক ও সামাজিক দিকগুলির স্বাস্থ্যসম্মত বিকাশের শিক্ষা হইল স্বাস্থ্যশিক্ষা। স্বাস্থ্যশিক্ষা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত— ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও গণস্বাস্থ্য। এই বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাস্থ্য ও গণস্বাস্থ্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শারীর-শিক্ষা বলিতে প্রধানত: শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিবার জন্য যে জ্ঞান প্রয়োজন তাহাকে বুঝায়। শরীরের বিভিন্ন অংশকে সুপরিচালনার দ্বারা পুষ্টি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায়। উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ, ব্যায়াম ও বিশ্রাম প্রয়োজন। অতএব এই শরীর চর্চা, খাদ্য, বিশ্রাম সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনকেই শারীরিক শিক্ষা বলা হয়। শরীর সুস্থ রাখার জন্য কতকগুলি সুঅভ্যাস গঠনের প্রয়োজন আছে। যেমন, ভোরে উঠা, মলমূত্রত্যাগ, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, নির্দিষ্ট সময়ে খাওয়া ও ঘুমান প্রভৃতি শারীরিক শিক্ষার অন্তর্গত।

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার কর্মসূচী—যেহেতু স্বাস্থ্য জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেইজন্য ইহার পরিধি বহুব্যাপক, কেবল বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকে না। ইহার পরিধি সারাজীবনব্যাপী ও সমগ্র সমাজব্যাপী বিস্তৃত। বিদ্যালয়-পরিবেশ ও গৃহপরিবেশ যৌথ ভাবে বা পরস্পরের সহযোগিতায় এই কর্মসূচী সাফল্য আনিতে পারে। নিম্নরূপ কয়েকটি স্তরে বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা যাইতে পারে :

(১) **শারীর-শিক্ষা :** বিদ্যালয়ে শারীর-শিক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিবে। শারীর-শিক্ষার কয়েকটি স্তর আছে। যেমন, তত্ত্বগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যমূলক অভ্যাস গঠন, ব্যায়াম ও খেলাধূলা, রোগ প্রতিষেধক শিক্ষা, খাদ্য সম্পর্কে শিক্ষা ও বিশ্রাম সম্পর্কে শিক্ষা।

স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কিত তথ্য ও তত্ত্বগুলি জানিতে হইবে। শারীর-বিজ্ঞান সম্পর্কে তত্ত্বগত জ্ঞান না থাকিলে ব্যবহারিক জ্ঞান বা প্রয়োগবিদ্যা সুফলপ্রসূ হয় না।

স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনেক সু-অভ্যাস গঠন করিতে হইবে। যেমন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, সময় মত উঠা, ঘুমান, আহার করা, বিশ্রাম করা, স্বাস্থ্যসম্মত বসা, হাঁটা, ব্যায়াম করা, শরীরচর্চা ও খেলাধূলা করা ইত্যাদি। তাহা ছাড়া নিয়মিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যায়ামের দ্বারা শরীরকে কর্মক্ষম রাখার অভ্যাস করিতে হইবে।

(২) **স্বাস্থ্যমূলক মনোভাব গঠন :** স্বাস্থ্যই যে জীবন—নানা সমস্যা, কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেও যেন সেকথা মনে থাকে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে চিন্তা ও কর্মশক্তি বাড়ে, সমস্যা সমাধানের উৎসাহ থাকে। অতএব সর্বপ্রযত্নে স্বাস্থ্যবিধি পালন করা কর্তব্য—এই মনোভাব গড়িয়া উঠার মত শিক্ষা দিতে হইবে।

সামাজিক স্বাস্থ্য শিক্ষা : একক ভাবে স্বাস্থ্য শিক্ষা আংশিক ভাবে কার্যকর হয়। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে কার্যকর ও সুফলপ্রসূ করিতে হইলে শিশুর সামাজিক চেতনাবোধ জাগ্রত করিতে হইবে। সে যাহাতে কেবল নিজের স্বাস্থ্যই নয়, কিভাবে সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় সে চিন্তা করে এবং সেই শিক্ষা গ্রহণ করে।

মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা : কেবল শারীরিক শিক্ষাই সব নয় মানসিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির দিকেও নজর দিতে হইবে। এই জন্য বিবিধ সহপাঠ্যক্রমিক বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দশম অধ্যায়

বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ

বিদ্যালয় সমাজের একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান। ইহার দায়িত্ব অপরিসীম। ভবিষ্যৎ নাগরিকরা এই প্রতিষ্ঠানে আসে তাহাদের দৈহিক, বৌদ্ধিক ও আনুভূতিক বিকাশের জন্য। ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক নিবিড়। দেহ সুস্থ হইলে মন সুস্থ হইবে। সেই জন্য একদিকে যেমন সে সুস্থভাবে জীবন যাপন প্রণালী শিখিবে অন্য দিকে উপযুক্ত পরিবেশে তাহার দেহমন গড়িয়া উঠিবে। বিদ্যালয় একটি ছোট সমাজ। নানা পরিবেশ হইতে শিশুরা এখানে আসে। তাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন পৃথক্। কেউবা পরিচ্ছন্ন, অপরিচ্ছন্ন থাকা কাহারও বা স্বভাবজাত। কেউ পুষ্ট, কেউ অপুষ্টিজনিত রোগগ্রস্ত। বিভিন্ন পরিবেশ হইতে আসে বলিয়া মাঝে মাঝে কেউ কেউ সংক্রামক পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। স্বাস্থ্যগত এই সব সমস্যা বিদ্যালয়ের আছে। কিন্তু বিদ্যালয়কে সাহসের সঙ্গে এই সব সমস্যার মোকাবিলা করিতে হয়। স্বাস্থ্যবিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণও তাহার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পথে বিদ্যালয় এই দায়িত্ব পালন করিতে পারে। যেমন (ক) পরিবেশগত, (খ) শিক্ষাগত (গ) চিকিৎসাগত।

(ক) পরিবেশগত: সমগ্র বিদ্যালয় পরিবেশকে স্বাস্থ্যসম্মত করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কয়েকটি দিক্ আছে। যেমন—(১) বিদ্যালয় গৃহ, (২) আসবাবপত্র, (৩) পানীয় জল (৪) খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার (৫) শৌচাগার (৬) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, (৭) শ্রেণীকক্ষের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রভৃতি।

১। **বিদ্যালয়-গৃহ**—উপযুক্ত স্থানে বিদ্যালয়-গৃহ নির্মিত হওয়া উচিত। উঁচু খোলা জায়গায় শ্মশান বা গোরস্থান হইতে দূরে বিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচিত করা শ্রেয়। বিদ্যালয় ভবন এমনভাবে নির্মিত হইবে যেন যথেষ্ট পরিমাণ আলোবাতাস আসে। শ্রেণীকক্ষগুলি বেশ বড় হইবে এবং যথেষ্ট পরিমাণে জানালা থাকিবে।

বিদ্যালয় ভবনের চারি পাশে যেন যথেষ্ট পরিমাণ জায়গা থাকে। সেখানে পরিকল্পনা মত ফুলের বাগান করিলে পরিবেশ আরও মনোরম হইবে।

২। **আসবাব-পত্র**—বিদ্যালয়ের আসবাব-পত্র যেন রুচি ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বসার আসন ছোট ছোট চেয়ারই থাকাই ভাল। তাহারা যেন সোজা হইয়া বসিতে পারে।

৩। **পানীয় জল**—বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছেলেমেয়েরা যাহাতে পিপাসার সময় নোংরা জল না খায় তাহা দেখিতে হইবে। শহরে কলের জলের এবং পল্লীগ্রামে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা থাকিবে।

৪। **খেলার মাঠ**—ব্যায়াম ও খেলাধূলা বিদ্যালয়ে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ। স্বাস্থ্য

রক্ষণ ও অর্জনের ক্ষেত্রে শরীরচর্চা অপরিহার্য। সেইজন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে অবশ্যই একটি খেলার মাঠ থাকিবে এবং খেলাধূলায় উপযোগী নানাবিধ ক্রীড়াসরঞ্জাম থাকিবে। শিক্ষার্থীরা যাহাতে নিয়মিত খেলাধূলা করে তাহাও দেখিতে হইবে।

৫। **শৌচাগার**—বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে শৌচাগার ও প্রস্রাবাগার অপরিহার্য। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অনেকগুলি প্রস্রাবাগার ও শৌচাগার নির্মাণ করিতে হইবে এবং সেইগুলি যাহাতে পরিষ্কার থাকে তাহা দেখিতে হইবে।

৬। **পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা**—স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রথম কথা পরিচ্ছন্নতা। বিদ্যালয় পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। কোথাও যেন আবর্জনা বা দূষিত পদার্থ না থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সুইপার ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরাও যদি নিয়মিত সাফাই ক্লাশের মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভ্যাস করে তাহা হইলে ফল আরও ভাল হইবে। মাঝে মাঝে ময়লা ফেলার ঝুড়ি থাকিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যেখানে-সেখানে আবর্জনা, কাগজের টুকরা বা থুতু না ফেলিয়া নির্দিষ্ট জায়গায় যাহাতে ফেলে শিক্ষকরা সে দিকে দৃষ্টি দিবেন। ইহাতে তাহাদের সু-অভ্যাস গড়িয়া উঠিবে।

৭। শ্রেণীকক্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। একই কক্ষে বিভিন্ন পরিবেশ হইতে বিভিন্ন রুচির ছেলে-মেয়ে দিনের অনেকটা সময় এক সঙ্গে থাকে। কাজেই সেখানকার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ রুচিসম্মত, আনন্দ ও সহানুভূতিপূর্ণ ও স্বাস্থ্যকর হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(খ) শিক্ষাগত : বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য সংরক্ষণে শিক্ষাগত দিকের বিশেষ মূল্য রহিয়াছে। উপদেশ, আদর্শ, অনুকরণ ও অভ্যাসের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে স্বাস্থ্যচেতনা জাগ্রত করিতে পারিলে পরম লাভ হইবে। একটু আন্তরিকতার সহিত চেষ্টা করিলে বিদ্যালয় এই কর্তব্যের অনেকটাই করিতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে এই কর্তব্যপালন করা যায়। যথা—(১) স্বাস্থ্যসম্মত সময়-তালিকা (২) শ্রেণীকক্ষে সুঅভ্যাস গঠন (৩) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পাঠ (৪) স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ (৫) বাধ্যতামূলক শারীরিক শিক্ষা (৬) বিদ্যালয় টিফিন।

১। **স্বাস্থ্যসম্মত সময়-তালিকা**—বিদ্যালয়ের রুটিন এমনভাবে তৈয়ারী করিতে হইবে যাহাতে শিশুরা মানসিকভাবে ক্লান্ত না হয়। দীর্ঘসময়ব্যাপী তত্ত্বমূলক শ্রেণীতে তাহারা হাঁফাইয়া উঠে। সেইজন্য মাঝে মাঝে বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকা ভাল। শক্ত বিষয়ের পর সহজ বিষয় এবং দিনের শেষের দিকে শক্ত বিষয় না দেওয়া উচিত।

২। **শ্রেণীকক্ষে সু-অভ্যাস গঠন**—ইহা স্বাস্থ্যশিক্ষার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। শ্রেণী শিক্ষক একটু চেষ্টা করিলে শ্রেণীকক্ষেই অনেক কাজ করিতে পারেন। দৈনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইহার অন্যতম। ইহার জন্য প্রতি মাসে এক জন করিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী নির্বাচন করা যাইতে পারে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিদিন প্রত্যেকের দাঁত, চুল, নখ ও পোশাক দেখিবে। অপরিষ্কার থাকিলে শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে।

প্রতি দিনের পরীক্ষার ফল একটি চার্টে লেখা হইবে। চার্টটি শ্রেণীকক্ষে ঝুলিবে। কেউ অপরিষ্কার থাকিলে শিক্ষক তাহাকে সুপরামর্শ দিবেন ও পরিষ্কার হইয়া আসিতে নির্দেশ দিবেন। প্রতি দিনের এই অভ্যাসে শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের পরিচ্ছন্নতার বোধ জন্মিবে। তাহা ছাড়া শ্রেণীতে সোজা হইয়া বসা, যেখানে-সেখানে আবর্জনা বা নোংরা না ফেলা, বাজে খাবার না খাওয়া ইত্যাদি অভ্যাস করাইবেন।

৩। **স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ**—স্বাস্থ্য সংরক্ষণ কার্যসূচীকে ফলপ্রসূ করিতে হইলে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী অনুযায়ী নিয়মিত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের পাঠ দিতে হইবে। বিভিন্ন শারীর-সংস্থান, বিভিন্ন রোগ, রোগ নিবারণ, প্রতিষেধক, নির্বীজন, সংক্রামক ব্যাধি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য গণস্বাস্থ্য, পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিবে। কেবল পাঠই নয়, অভ্যাসের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে স্থায়ী ও কার্যকর করিতে হইবে।

স্বাস্থ্য শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা—বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যশিক্ষায় শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। কেবল তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকিলেই চলিবে না, আচরণ-গত দিক দিয়াও তাঁহাকে অভিজ্ঞ ও দরদী হইতে হইবে। মূলতঃ তাঁহাকে বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-শিক্ষক ও স্বাস্থ্য-সংরক্ষকের ভূমিকা লইতে হইবে। তিনি নিজে স্বাস্থ্যবান হইবেন। কেবল সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হইলেই হইবে না, নিজে স্বাস্থ্য-বিধি নিষ্ঠার সহিত পালন করিবেন। বিদ্যালয়ে রুটিন মত বিভিন্ন শ্রেণীতে তাত্ত্বিক আলেচনা করিবেন। তাহা ছাড়া বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাঁহাকে যত্নশীল হইতে হইবে। বিদ্যালয় পরিবেশ যাহাতে পরিচ্ছন্ন হয়, কোথাও আবর্জনা না থাকে, পানীয় জলের ব্যবস্থা ও দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা থাকে, তাহা দেখিবেন। শ্রেণীতে সুআচরণ গঠনে দৈনিক স্বাস্থ্য পরীক্ষায় শ্রেণী-শিক্ষকদের সাহায্য করিবেন। বিদ্যালয় রুটিন যাহাতে স্বাস্থ্যসম্মত হয় তাহা দেখিবেন। ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে নিয়মমত বসন্তের টিকা, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদির ইঞ্জেকশান নেয়, সে দিকে দৃষ্টি দিবেন।

কোন ছাত্রের সংক্রামক রোগ হইলে তাহার যথোচিত ব্যবস্থা লইবেন। বিদ্যালয়ের যে সব ছাত্র-ছাত্রী অপুষ্টিজনিত রোগে বা অন্যবিধ রোগে ভুগিতেছে চিকিৎসকের পরামর্শমত তিনি অভিভাবকদের পরামর্শ দিবেন। প্রয়োজন স্থলে তাহাদের অন্যত্র চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। বিদ্যালয়ে টিফিনে যে খাদ্য দেওয়া হইবে, তাহা তদারক করিবেন। এইসব ছাড়াও ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলার ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত শরীর চর্চা অর্থাৎ ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিবেন। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে অপসঙ্গতি থাকিলে শিশু-পরিচালনাগারে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন।

৪। **স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণ**—স্বাস্থ্য-শিক্ষক মাঝে মাঝে এক এক দল ছাত্র-ছাত্রী লইয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে ভ্রমণের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাতে তাহাদের মানসিক স্ফূর্তি ঘটে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পায় ও শারীরিক উন্নতি ঘটে।

৫। **বাধ্যতামূলক শারীরিক শিক্ষা** :—অসুখ হইলে তাহার চিকিৎসা করা এক জিনিস আর অসুখ যাহাতে না হয় সেইভাবে শরীর গঠন করা অন্য জিনিস। ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে শিক্ষার জন্য। এখানে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় সবই বাধ্যতামূলক। শারীরিক বিকাশও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। কাজেই শারীরিক বিকাশের জন্য উপযুক্ত শরীর-শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিয়মিত শরীর-চর্চা ও খেলাধুলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে রোগ প্রতিরোধ শক্তি জন্মাইবে এবং অন্য সমস্যা স্বভাবতঃই কমিয়া যাইবে।

৬। **বিদ্যালয়-টিফিন**—বিদ্যালয় টিফিনও বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যশিক্ষার অন্তর্গত। ছেলেমেয়েরা খাইয়া স্কুলে আসে। যখন ক্লাশ শেষ হয় তাহারা ক্ষুধার্ত হয় ও কাজে কাজেই শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কোন কাজ করিতে পারে না। শিক্ষা-কমিশন সেইজন্য বিদ্যালয়ে টিফিন দিবার সুপারিশ করিয়াছেন। সুপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য যেমন মুড়ি, চিঁড়ে, বাদাম, ভিজে ছোলা, নানাবিধ ফল, দুধ, ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়া যাইতে পারে। সম্ভব হইলে কিছু প্রোটিন খাদ্য দিতে পারিলে ভাল হয়।

(গ) **চিকিৎসাগত**—বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য-সংরক্ষণের আর একটি দিক হইল রোগের প্রতিকার। সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আসে। সকলের বাড়ির অবস্থা ভাল নয় বা ছেলে-মেয়েদের সমান যত্ন লইতে পারে না। অনেক ছেলে-মেয়ে অপুষ্টিজনিত ও নানাবিধ অসুখে ভুগে। এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে।

এবিষয়ে বিদ্যালয় নিম্নলিখিতরূপে এই কর্তব্যপালন করিতে পারে। যেমন, (১) ফার্ষ্ট এড্-ব্যবস্থা, (২) স্বাস্থ্য পরিদর্শন, (৩) বিদ্যালয় আরোগ্যশালা, (৪) শিশু পরিচালনাগার।

১। **ফার্ষ্ট এড্ ব্যবস্থা**—বিদ্যালয়ে অবশ্যই প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। খেলাধুলা করিতে গিয়া বা হঠাৎ পড়িয়া গিয়া কাটিয়া রক্তপাত হইলে বা হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে যেন চিকিৎসা করা চলে। অনেকক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার ফলে রোগী সুস্থ হয়। প্রয়োজন হইলে অসুস্থকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইবে।

২। **স্বাস্থ্য পরিদর্শক**—প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক থাকিবেন। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক এই পদে নিযুক্ত হইবেন। তিনি মাঝে মাঝে ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন ও রেকর্ড কার্ড রাখিবেন। অসুস্থ বালক-বালিকার চিকিৎসার সুপারিশ করিবেন। সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত বালক-বালিকাদের সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা লইবেন। তাহাদের প্রতিষেধক টিকা ও ইঞ্জেকশন দিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৩। **বিদ্যালয় আরোগ্যশালা**—বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হইয়া

পড়িলে তাহাদের চিকিৎসার জন্য বিদ্যালয়ে একটি আরোগ্যশালা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমাদের মত দরিদ্রদেশে অভিভাবকরা নিজেদের ছেলে-মেয়েদের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন না। বিদ্যালয় যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হইবে। হয়তো একটি স্কুলের পক্ষে আরোগ্যশালা স্থাপন করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে কাছাকাছি কয়েকটি স্কুল মিলিয়া এই কাজ করিতে পারে।

৪। **শিশু পরিচালনাগার**—বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য শিশু-পরিচালনাগারের প্রস্তাব করা হইয়াছে। মানসিক রোগগ্রস্ত, বদ্‌মেজাজী প্রভৃতি ছাত্র ছাত্রীদের এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হয়। কেবল শরীর-শিক্ষা ও চিকিৎসাই নয়, মানসিক দিক দিয়াও শিশুরা যাহাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুস্থ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক স্কুলের পক্ষ শিশু-পরিচালনাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। কয়েকটি স্কুল মিলিয়া বা সরকারী সাহায্যে প্রতিটি মহকুমা বা জেলায় এইরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে।

এইসব আলোচনায় দেখা গেল স্বাস্থ্য সংরক্ষণে বিদ্যালয়ের কি বিপুল দায়িত্ব ও কর্তব্য রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই যদিও নানা বাস্তব কারণে সম্পূর্ণভাবে এই দায়িত্ব পালন সম্ভব হয় না, তথাপি সরকার, বিদ্যালয় পর্ষদ, পরিদর্শক, স্বাস্থ্য বিভাগ ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকবর্গ যৌথভাবে সহযোগিতায় দ্বারা অনেক কাজ করিতে পারেন।